ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

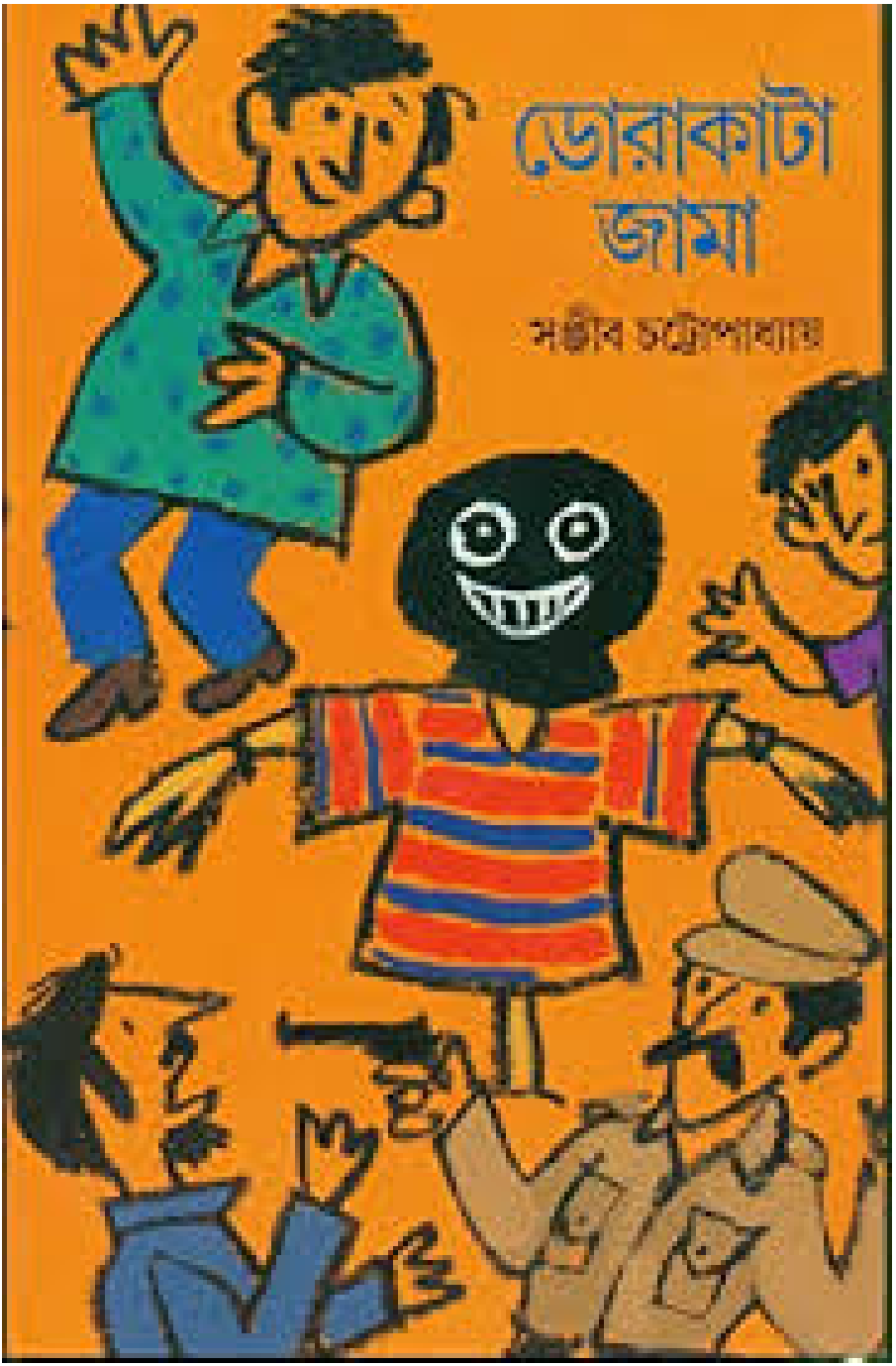

boierpathshala.blogspot.com

ডোরাকাটা জামা

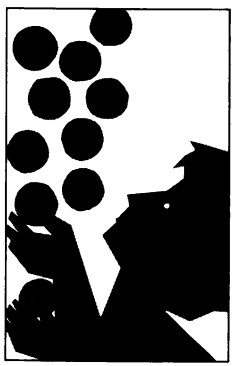

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

boierpathshala.blogspot.com

ডোরাকাটা বাঘ হয়। ডোরাকাটা ছেলে এই প্রথম দেখল রুকু। বাজারে হরেনদার স্টেশনারি দোকান। সেই দোকানে লজেন্স কিনতে গিয়ে রুকু দেখল হরেনদা নেই। তাঁর জায়গায় উদাস মুখে বসে আছে ফরসা-মতো, সুন্দর চেহারার, তার বয়সি একটা ছেলে। একমাথা ঘন কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। টিকলো নাক। টানা টানা চোখ। দেখার মতো ছেলে। সবচেয়ে দেখার মতো তার গায়ের জামা। এই মোটা নীল নীল ডোরা টানা হাফ শার্ট। যেন নীল একটা জেব্রা টুলে বসে আছে আপন মনে।

রুকু ছেলেটিকে দেখছে। ছেলেটি রুকুকে দেখছে। কারও মুখেই কোনও কথা নেই। শেষে রুকু বললে, "হরেনদা নেই!"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

"তা হলে কে আছে?"

"আমি।"

"তা হলে জিজ্ঞেস করো।"

"কী জিজ্ঞেস করব?"

"জিজ্ঞেস করো আমার কী চাই।"

ছেলেটি পাখিপড়ার মতো বললে, "আমার কী চাই।"

রুকু হেসে ফেলল। হাসি চেপে বললে, "দূর বোকা। আমার কী চাই মানে, এই আমি, এই আমার কী চাই।"

সে ভয়ে ভয়ে বললে, "আপনার কী চাই।"

রুকু এবার হো হো করে হেসে বললে, "তুমি ভীষণ বোকা। এভাবে দোকানদারি হয়!"

ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রুকুর দিকে। চোখ দুটো ভিজে ভিজে। যেন এইমাত্র কাঁদছিল।

রুকু জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কী?"

"নিতু।"

"হরেনদা তোমার কে হন?"

"মামা।"

রুকু লজেন্স কিনে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এলে কী হবে, সারাদিনই নিতুর

কথা, নিতুর চেহারা, নিতুর চোখ, আর নিতুর মোটা মোটা ডোরাকাটা নীল জামা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কী সুন্দর ছেলেটা!

দশটা লজেন্স কিনেছিল রুকু। সমান সমান ভাগ। পাঁচটা সুকুর, পাঁচটা তার নিজের। সকাল থেকে সুকুটা যে কোথায় গেছে। তার টিকির দেখা নেই। দু'জনেরই স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গেছে। তা বলে সকাল থেকে এইভাবে বেপাত্তা হয়ে যেতে হয়! সুকু তো এইরকম করে না। যাই করুক দাদাকে বলে করে। চার্চের মাঠে ক্রিকেট পড়েছে। সেইখানেই গেল নাকি! সে তো বড়দের খেলা। সুকু সেখানে গিয়েই বা করবে কী?

সুকুর ভাগের পাঁচটা লজেন্স নিয়ে রুকু ভারী বিপদে পড়েছে। নিজের পাঁচটা কখন শেষ হয়ে গেছে। কেবলই ইচ্ছে করছে একটা খায়। খেলেই বা কী! সুকু তো আর জানতে পারছে না। দশটার বদলে আটটা কিনলে সুকুর ভাগে চারটেই তো পড়ত। একটা প্রায় খেয়ে ফেলে ফেলে। মোড়কের প্যাঁচ প্রায় খুলেই ফেলেছিল। হঠাৎ মনে হল, না, খুব অন্যায় হবে। সমান সমান ভাগ। সেদিন সুকু তিনটে পেয়ারা কিনেছিল। প্রথমে একটা একটা দু'জনে খাবার পর, তৃতীয়টাকে সমান দু'ভাগ করে সুকুর হঠাৎ মনে হল, দাদার প্রথম পেয়ারাটা একটু ছোট ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আধখানাকে আবার দু'টুকরো করে এক টুকরো দাদাকে দিল। একা সুকুকে কেউ কিছু উপহার দিতে এলে নেয় না। বলে, 'হয় দুটো দাও, নয়তো দিয়ো না।'

রুকু বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে থাকলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ছে। খাই খাই ভাব হচ্ছে। সুকুর খোঁজ করা যাক। কোথায় যেতে পারে। ডাকঘরের কাছে সুবোধের সঙ্গে দেখা। রুকু কিছু বলার আগেই সুবোধ বললে, "আমি তোদের বাড়িতেই যাচ্ছি। সুকু মারামারি করেছে।"

"সে কী রে!"

"হ্যাঁ, সাংঘাতিক মারামারি। অনিলের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে।"

"কোথায় সে?"

"স্টেশানের ডান প্ল্যাটফর্মে চুপ করে বসে আছে।"

"খুব লেগেছে?"

"দেখতে গেলুম, দেখতে দিলে না।"

রুকু জোরে জোরে পা ফেলে স্টেশানের দিকে ছুটল।

ডাউন ট্রেন পাস করে গেছে সবে। ডিসট্যান্ট সিগনালে গার্ডের কেবিন তখনও দেখা যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। শীতে এদিকে অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। চারপাশে ছোট-বড় পাহাড়। মাঝে শহর। ছোট পাহাড়ি নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে খেলে

খেলে। বনজঙ্গলও আছে। একসময় বাঘ ছিল। রাতের বেলায় পাহাড়ের মাথায় ঘাসে দেহাতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, শহর ঘিরে আলোর রেখা কেঁপে কেঁপে নাচছে। ঘাসের ছাইতে খুব ক্ষার থাকে। দেহাতিরা সেই ছাই দিয়ে কাপড় কাচে।

দেখতে দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে এল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, কিন্তু সুকু কোথায়। সব বেঞ্চ খালি পড়ে আছে। একটা-দুটো করে গাছের পাতা খসে খসে পড়ছে। রুকু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় ওভারব্রিজের ওপর থেকে সুকু ডাকল, "দাদা, এই দাদা।"

"হেই। তুই ওখানে কী করছিস?"

সুকু পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওভারব্রিজে বসে থাকতে রুকুর ভীষণ ভয় করে। মনে হয় এক্ষুনি বুঝি গলে লাইনের ওপর পড়ে যাবে। আর নীচে দিয়ে ট্রেন গেলে তো কথাই নেই। তখন মনে হয়, উলটে না ফেলে দেয়।

রুকু বললে, "নেমে আয়।"

সুকু বললে, "তুই উঠে আয়।"

শেষে সুকুই নেমে এল। রুকু খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাইকে দেখছে। মারামারির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। কাটা, ছেঁড়া, থেঁতলানো, জামা ছেঁড়া। কোনও চিহ্নই নেই। ঝলমলে চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুকু। জ্বলজ্বলে চোখ। হাসি হাসি মুখ। অথচ যার সঙ্গে মারামারি করেছে, সেই অনিল একটা বেশ বড়সড় ডাকাত টাইপের ছেলে। মহা পাজি।

রুকু সুকুর কাঁধে হাত রেখে বললে, "কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস?"

"অনেকক্ষণ।"

"বাড়ি যাবি না?"

"না।"

"কেন না?"

"আমার মন খারাপ।"

"তুই মারামারি করেছিস?"

"করেছি।"

"কেন করেছিস?"

"দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ঠেকাতে।"

"কে দুর্বল, কে সবল?"

কথা বলতে বলতে দু'জনে সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে বসল। এদিকে এখন আর অনেকক্ষণ ট্রেন আসবে না। বিশাল একটা মালগাড়ি আপন মনে ধিকিধিকি করে চলেছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ

হচ্ছে। বগিতে বগিতে টান ধরে। পশ্চিম আকাশে সাতপুরা পাহাড়ের ঢেউয়ের ওপর হালকা কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। রোদ যত পড়ে আসছে, শীতও তত বাড়ছে। আজ আবার স্কুলের মাঠে ব্যায়াম-প্রদর্শনী আছে। কলকাতা থেকে কমল ভৌমিক এসেছেন দলবল নিয়ে। ব্যান্ড বাজছে তালে তালে। মা বলেছেন, 'যাব।' বাবার দুপুরে একটা বড় অপারেশান করার কথা। সেটা সেরেই তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। আজ আর অন্য কোনও রুগি নেবেন না। বাবাকে আবার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হবে। বিষয়, 'ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য'।

রুকু বললে, 'একটু পরেই স্কুলের মাঠে ব্যায়াম-প্রদর্শনী শুরু হবে। বাবা এতক্ষণে বোধহয় বাড়ি ফিরে এসেছেন। এক্ষুনি না পেলে কী হবে জানিস?"

"আমার একটা কাজ এখনও বাকি আছে," সুকু গম্ভীর মুখে বললে।

"কী কাজ?"

"অনিলের নাক ফাটিয়েছি। পলাশের মাথা ফাটাব।"

সুকুর কথা শুনে রুকুর বুক কেঁপে উঠল। পলাশ! এই শহরের সবচেয়ে ওঁচা ছেলে। স্কুলের একই ক্লাসে পড়ে আছে পরপর চার বছর। এবার পাশ করতে না পারলে, হেডমাস্টারমশাই বলেছেন নাম কেটে দেবেন। রোজ সিনেমা দেখে। বাজারে চিতুর দোকানে বসে চা খায়, আড্ডা মারে। বিকেলে এই স্টেশানে এসে আর তিনটে ছেলের সঙ্গে তাস পেটে।

ভাইয়ের হাত ধরে রুকু বললে, "তুই কিন্তু ক্রমশই খারাপ দিকে চলে যাচ্ছিস। মারামারি কারা করে জানিস?"

"কারা করে?"

"যারা বোকা।"

"তুই কিছুই জানিস না দাদা। মারামারি কারা করে জানিস! যাদের সাহস আছে।"

"পলাশ তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এই কেঁদো চেহারা।"

"চেহারা কী করবে দাদা। চেহারায় কী হয়! অনিল আমার চেয়ে অনেক বড়। এক ঘুসিতে নাক থেবড়ে দিয়েছি। আমি ফাদার পেরিয়ারের কাছে বকসিং শিখি রে দাদা।"

"বকসিং শিখিস বলে যাকে-তাকে ধরে ধরে মারবি!"

"যাকে-তাকে তো মারি না। যারা অন্যায় করে তাদেরই মারি।"

"ওরা কী অন্যায় করেছে?"

"শুনবি তা হলে।"

শোনা আর হল না। রুকু আর সুকুর বাবা, ডক্টর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্ল্যাটফর্মে এসে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন দু'জনের সামনে। সায়েবদের মতো

চেহারা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। ফরসা টকটকে রং। দেখলে মনে হবে খুব গম্ভীর মানুষ। একটা রাগী রাগী ভাব। কিন্তু মোটেই তা নয়। ভীষণ ভাল মানুষ। সারা শহরের মানুষ তাঁকে চেনে। নাম শুনলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে।

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "চোখের সামনে একটা ঘড়ি ঝুলছে, তোমরা দেখেছ? ওদিকে একবারও চোখ গেছে?"

রুকু বললে, "আমি সুকুকে ডাকতে এসেছি।"

"আর আমি এসেছি তোমাদের ডাকতে। ক'টা বেজেছে দেখেছ?"

"তুমি কেন এলে বাবা? আমরা তো যাচ্ছিলুম।"

ডক্টর মুখার্জি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "সুকু।"

ডাক শুনেই সুকু বুঝতে পারলে, বাবা তাকে বকবেন। সুকু সঙ্গে সঙ্গে বুক চিতিয়ে বললে, "আমি কোনও অন্যায় করিনি বাবা।"

"নিজের বিচার নিজে করা যায় না সুকু।"

রুকু বললে, "তুমি কী করে জানলে বাবা!"

"অনিলের বাবা অনিলকে নিয়ে হসপিটালে এসেছিলেন। অনিলের নাকের ব্রিজ ভেঙে দু'টুকরো করে দিয়েছে। এই বয়েসে এই যদি ঘুসির জোর হয়, বড় হলে এ ছেলে তো ব্রুসলি হবে। আমি এখানে তোমার বিচার করতে চাই না। সব কিছুরই একটা ডেকোরাম আছে।"

সুকু বেশ জোর গলায় বললে, "তোমার ছেলে অন্যায় করতে পারে না।"

"আর ইউ শিয়োর?"

"ডেড শিয়োর।"

"ডেড শিয়োর," ডক্টর মুখার্জি হেসে উঠলেন, "তুই হঠাৎ মারলি কেন?"

"এখানেই শুনতে চাও, না বাড়ি গিয়ে শুনবে?"

"না, এখানে নয়, এখন নয়। এক্ষুনি স্কুলে যেতে হবে। আর সময় নেই।"

স্টেশানের বাইরে ডাক্তারবাবুর চকোলেট রঙের বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে। সাদা রঙের উর্দি-পরা ড্রাইভার। উত্তর প্রদেশের মানুষ। একসময় নাকি ডাকাতি করত। রাজস্থানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ। পায়ে গুলি লেগেছিল। ডক্টর মুখার্জি সেই সময় এক মিশনারি হাসপাতালের চিফ সার্জেন। ইচ্ছে করলে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তা করেননি। নিজের দায়িত্বে নিজের বাংলোয় লুকিয়ে রেখে, মনোহরকে ভাল করে তুলেছিলেন। একটি মাত্র কারণে। মনোহর বলেছিল, 'ডাক্তারসাব, কাল রাতে আমার মেয়েটা ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে। আমার বউ পাগল হয়ে গেছে। কেবল বলছে, মেয়ে মরেছে তোমার পাপে। আমি ভাল হতে চাই। আমার বউকে ভাল করতে

চাই।' সেই মনোহর এখন নাম পালটে বিশ্বনাথ দাস। পুরো বাঙালি। শুধু বাঙালি নয়, ধার্মিক, সাধক। ডক্টর মুখার্জির বাংলোয় আউট হাউসে থাকে। গাড়ি চালায়। বাগান দেখে। ফুল ফোটায়। ফল ফলায়। রুকুদের বিশুদা। লোকটির কেউ আর বেঁচে নেই। সাতটা কুকুর আর দশ-বিশটা বেড়াল নিয়ে বেশ আছে। যা মাইনে পায় সবটাই খরচ করে অন্যের জন্যে। ভাল গান গায়। সুন্দর ছবি আঁকে। রোজ সকালে আড়াইশো ডন, আর পাঁচশো বৈঠক মারে।

গাড়ি ছুটল বাংলোর দিকে। আজ খুব শীত পড়েছে। এখনই চারপাশে শীতে যেন নিথর হয়ে আসছে। দূর আকাশে পাহাড়ের সারি যেন জমাট অন্ধকার। আকাশ আটকে ধ্যানে বসে গেছে।

॥ ২ ॥

স্কুলের মাঠে একেবারে সার্কাসের মতো তাঁবু পড়েছে। ব্যান্ড বাজছে তালে তালে। জনগণমন অধিনায়ক। ঢোকার গেটে একটা তোরণ হয়েছে। ফুল, লতাপাতা, রঙিন কাগজ। পিটার গোমেজ ফুলের স্টল দিয়েছেন। সাদা গোলাপ, লাল গোলাপ, হলদে গোলাপ। কারনেশান, অ্যাস্টার। ছোট ছোট ঝাউপাতা আর চকচকে জরি দিয়ে বাঁধা। এ বেশ ভাল। চায়ের দোকান, চাটের দোকানের চেয়ে এ বেশ ভাল। কেবল খাওয়া খাওয়া। ভালও লাগে বাবা মানুষের। গোমেজসায়েবের ফুলের দোকানে বাবাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছে মেয়ে লিলি। ফুলের মতো ছোট্ট মেয়ে। হালকা হলুদ রঙের পোশাক পরে প্রজাপতির মতো উড়ছে যেন।

ডক্টর মুখার্জি ফুল কিনলেন। আরও কিনলেন গোমেজকে সাহায্য করার জন্যে। গোমেজ খুব ভালমানুষ। একসময় ভীষণ ভাল চাকরি করতেন। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকেই অবস্থা নামতে নামতে খুব নেমে গেছে। শেষে গত কয়েক বছর হল একটা নার্সারি করেছেন। উঃ, কী ফুলই না ফুটছে সেখানে!

ওধারে একটা বইয়ের স্টল হয়েছে। ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, প্রাকৃতিক চিকিৎসার বই বিক্রি হচ্ছে। বাবা, মা, রুকু, সুকু যেন মার্চ করে প্যান্ডেলে গিয়ে ঢুকল। হেডমাস্টার নিজে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। একেবারে সামনের সারিতে বসার জায়গা হল। সামনেই ডায়াস। সাদা ধপধপে চাদর মোড়া। পেছনের কাপড়ে থার্মোকল কেটে ব্যায়ামবীরের মূর্তি করে আটকে দেওয়া হয়েছে। হাঁটু আধ-মোড়া করে বসে হাতের মাস্‌ল দেখাচ্ছে।

সুকু উসখুস করছে। একেবারে পেছনের সারিতে ধারের দিকে বসে আছে নিতু। সব ঠিক আছে। গায়ে সেই নীল ডোরাকাটা জামা। একটাই বেঠিক। মাথাটা ন্যাড়া। কোথায় গেল অমন সুন্দর চুল! রহস্যটা জানার জন্যে সুকু উসখুস করছে। সাহস করে উঠে যেতে পারছে না। বাবা বকবেন। বলবেন, 'ছটফট করছিস কেন।'

রুকু কিন্তু নিতুকে দেখতে পায়নি। সে হাঁ করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে। কত কী যে হচ্ছে সেখানে। আলো ঠিক করা হচ্ছে। একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে ফোকাস মারা হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। সুকুর চোখ চলে গেল ডান দিকের কোণের আসনে। অনিল আর পলাশ বসে আছে পাশাপাশি। অনিলের নাকে বিশাল এক ব্যান্ডেজ। পলাশ মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এদিকে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে অনিলের কানে কানে কিছু বলছে। কী মতলব আঁটছে কে জানে!

স্টেজে এক-একবার এক-এক জন আসছেন, কীসব করছেন আর রুকু আপন মনে 'ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল' বলে বলে উঠছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ডক্টর মুখার্জিকে এক-একবার এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসন থেকে উঠে এসে জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন আছেন।' কেমন আছেন শোনার আগেই সাতকাহন করে নিজেদের শরীরের কথা শুরু করছেন। বাপ রে বাপ! কত রোগ যে মানুষের! কারও সকাল-সন্ধে নাক বুজে যাচ্ছে। কারও ঘাড়ে বিকট ব্যথা। পেটেরই কতরকম গোলযোগ! ঢ্যাপ ঢ্যাপ করছে। কারও নিরেট হয়ে আছে। কারও ছলকে উঠছে। সকলকেই ডক্টর মুখার্জি নরম গলায় বলছেন, "পরিশ্রম করুন, পরিশ্রম। শ্রমের বিকল্প কিছু নেই।" আর সেই কথা শুনে সকলেই বলছেন, "দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট। পরিশ্রমই একমাত্র মেডিসিন।"

সুকু এক ফাঁকে বাবাকে প্রশ্ন করল, "তুমি বিরক্ত হচ্ছ না কেন বাবা?"

"বিরক্ত! বিরক্ত কেন হব সুকু। সামান্য দু'-চার কথা বললে মানুষকে যখন সন্তুষ্ট করা যায় তখন কৃপণ হব কেন?"

হঠাৎ দপ করে সব আলো নিভে গেল, জ্বলতে লাগল শুধু স্টেজের আলো। আলোয় আলোয় ঝলমলে। রুকু আর সুকু রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। আর ওইরকম অবস্থাতেও অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি ডক্টর মুখার্জির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, "ডাক্তারবাবু, ঘনঘন হাঁচির কোনও ওষুধ আছে?"

ডক্টর মুখার্জি ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, আছে। হাঁচির দিক থেকে মনটা সরিয়ে রাখুন। অনুষ্ঠান দেখুন।"

ছায়ামূর্তি সরে গিয়ে দূরের আসনে ঝুপ করে বসে পড়ল।

সুকু বললে, "বাবা, বাড়িতে তুমি যেমন ইন অ্যান্ড আউট লিখে রাখো, এখানেও সেইরকম একটা কিছু চালু করো না।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপাতত আমি আউট। ডক্টর ইজ নট ইন হিজ চেম্বার।"

উইংসের পাশ থেকে ডিগবাজি খেতে খেতে একটি মেয়ে স্টেজের একেবারে মাঝখানে এসে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। পরক্ষণেই উলটো ডিগবাজি খেতে খেতে উইংসের পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কী হাততালি। অন্ধকার থেকে সিক করে কে যেন সিটি বাজাল।

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "সিটি! সিটি কে বাজালে! এ যে দেখি বাজারের অনুষ্ঠান হয়ে গেল! গোটাকতক অসভ্য এসে জুটেছে!"

সুকু জানে সিটি কে দিয়েছে! পলাশ। পলাশ ছাড়া কে দেবে!

মঞ্চে হেডমাস্টারমশাই এসে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "আমার প্রিয় ছাত্র ও সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, অনুষ্ঠানের পবিত্রতা বজায় রাখুন। দিস ইজ এ স্কুল, এ ডিসটিনগুইশড স্কুল অব দি ডিসট্রিক্ট। দি স্যাংটিটি অব দিস সেক্রেড ইনস্টিটিউশান মাস্ট বি প্রিজার্ভড বাই এনি মিনস। আমার কোনও ছাত্র যদি অসভ্যতা করে থাকে, ফাইন্ড হিম, স্পট হিম আউট, থ্রো হিম আউট। সেই ইডিয়েটটাকে বের করে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতেই, সুন্দর চেহারার সাত-আটটি ছেলে সাদা পোশাক পরে মঞ্চে গোল হয়ে দাঁড়াল। সবার শেষে ঢুকলেন ব্যায়ামবীর কমল ভৌমিক। ঠিক যেন টারজানের মতো দেখতে। লম্বা-চওড়া। অসাধারণ একজন মানুষ। তিনি ঢুকেই নমস্কার করে বললেন, "আপনারা ইজিপ্টের পিরামিডের নাম শুনেছেন। অনেকে হয়তো দেখেছেনও, এখন দেখবেন হিউম্যান পিরামিড। এ স্পেকটাকুলার অ্যান্ড ফ্যান্টাসটিক হিউম্যান ফিট।"

পকেট থেকে বাঁশি বের করে বিপ করে বাজালেন। আর মার্চ করে আরও দশ-বারোটি ছেলে মঞ্চে প্রবেশ করল। বিপ করে আবার বাঁশি। সঙ্গে সঙ্গে তারা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরছে, ঘুরছে। গোল হয়ে ঘুরছে। কমল ভৌমিক তালি বাজিয়ে আচমকা বলে উঠলেন, "রেডি।"

আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ছেলেরা যে যেখান থেকে পারল সামারসল্ট খেতে খেতে, একের ওপর আর এক, তার ওপর আর এক চুড়ো হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। নিখুঁত পিরামিডের

আকৃতি। সেই অবস্থায় তারা বেশ কিছুক্ষণ রইল। তারপর কমল ভৌমিক যেই বাঁশি বাজালেন, সকলে কবিতার ছন্দের মতো খুলে খুলে পড়ে গেল। পড়ার মধ্যেও কী আর্ট!

চটাপট চটাপট প্রবল হাততালি। হাততালি থামতে-না-থামতেই সিক সিক দু'বার সিটি। রুকু আর সুকু দু'জনেই চমকে উঠল। অন্ধকার হলেও সুকু পলাশের দিকে চোখ রেখেছিল। মঞ্চের আলোয় ঘন কালো পলাশের ছায়ামূর্তি সিটি দেবার দমকে স্পষ্ট দু'বার দুলে উঠল।

উইংসের পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন হেডমাস্টারমশাই। মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জলদগম্ভীর মুখ। ভারী গলায় বললেন, "আমি দুঃখের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। দিস গোজ এগেনস্ট আওয়ার ডিসিপ্লিন।"

দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল।

হেডমাস্টারমশাই আরও কিছু যোগ করলেন, "আমাদের এই এতদিনের নিষ্কলঙ্ক প্রতিষ্ঠানে যারা কলঙ্ক লেপন করে সুখী হতে চায়, তাদের সুখ আমি আর বৃদ্ধি করতে চাই না। আমাদের মাননীয়, সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন তাঁর সুশিক্ষিত দল নিয়ে কত কী দেখাতে, সে সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। কী আর করা যাবে। আমাদের ভাগ্য। কমলবাবুর কাছে আমি আপনাদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিচ্ছি।"

হেডমাস্টারমশাই শেষ করামাত্রই আলোআঁধারে পলাশ উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বললে, "আমি জানি স্যার, কে সিটি মেরেছে।"

"কে সে। জানোই যদি, তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে।"

পলাশ কী করছে, কাকে ধরছে, স্পষ্ট দেখা না গেলেও, সুকুর মনে হল, সে নিতুর দিকে যাচ্ছে। আসার সময় সুকু দেখেছে নিতু পলাশ যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকেই বসে আছে। সুকু চাপা গলায় রুকুকে বললে, "দেখেছিস দাদা, শয়তানটা নিতুকে ধরতে যাচ্ছে।"

রুকু আর সুকু ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। ঠিক তাই। পলাশ নিতুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মঞ্চের দিকে নিয়ে চলেছে। নিতুর মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই। পলাশের টানে টাল খেতে খেতে চলেছে। রুকু, বাবা, মা কিছু বোঝার আগেই সুকু চিতাবাঘের মতো পলাশের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও একটা ঝটাপটি হচ্ছে। গোটাকতক ঘুষির শব্দ কানে এল। পরক্ষণেই পলাশের আর্তনাদ, "বাবা রে!"

ততক্ষণে রুকু আর ডাক্তার মুখার্জি ছুটে গেছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন মা রাজ্যেশ্বরী। হেডমাস্টারমশাই মাইকে চিৎকার করে বলছেন, "কী হল? হল কী, আরে হচ্ছেটা কী?"

যা হচ্ছে তা এইরকম, পলাশ পড়ে আছে ঘাসের ওপর, আর সুকু নিতুকে নিয়ে সোজা মঞ্চে। ফটফটে আলোয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুকু আর ন্যাড়ামাথা নিতু। গায়ে সেই অদ্ভুত ডোরাকাটা জামা।

ডক্টর মুখার্জি হাত ধরে পলাশকে মাটি থেকে তুলছেন, আর হেডমাস্টারমশাই সুকুকে প্রশ্ন করছেন, "আরে সুকু, তুমি! তুমিই অন্ধকার থেকে চিৎকার করছিলে! এই সেই ছেলে!"

সুকু সবে বলেছে, "না, স্যার।"

পলাশ ডাক্তার মুখার্জির হাত ছাড়িয়ে এক লাফে মঞ্চে। সুকু কিছু বোঝার আগেই তার নাকে আচমকা এক ঘুষি। সুকু টলে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল। সাহায্য করল নিতু।

হেডমাস্টারমশাই বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন। সুকুর বাবা অন্ধকারে মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না। রুকু প্রায় উঠে পড়েছে। আর সুকু?

আচমকা ঘুষি খেয়ে সুকু একেবারে হিংস্র বাঘ। জমি থেকে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠে পলাশের চোয়ালে শিক্ষিত হাতের এক প্রচণ্ড ঘুষি। পলাশ টাল খেয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের পায়ের কাছে একেবারে চিতপটাং।

কমল ভৌমিক গোলমাল শুনে মঞ্চে সবে এসে ঢুকেছেন। তিনি বলে উঠলেন, "ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, এ ডিসেন্ট আপারকাট।"

সুকুর নাক দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত নেমে এসেছে। ঠোঁটে। চিবুকে। পলাশ দুমড়ে মুচড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কমল ভৌমিক বকসিং-এর রিংমাস্টারের কায়দায় গুনে চলেছেন, "ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।" টেন গোনার সঙ্গে সঙ্গে পলাশ ধপাস করে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। কমলবাবু বললেন, "আউট। ইউ আর দি উইনার।"

সুকু বললে, "স্যার, এই সেই ছেলে, যে সিটি দিচ্ছিল।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "এই ছেলেটি কে?"

"এর নাম নিতু। কয়েক দিন হল এখানে এসেছে।"

"একে মঞ্চে তুললে কেন?"

"আমি তুলিনি স্যার। পলাশ একে ধরে আনছিল। ভাল, নিরীহ, নতুন ছেলেটাকে মার খাওয়াবে বলে। এ আমাদের হরেনদার ভাগনে। হরেনদার দোকানে বসে। আজও বসেছিল সকালে। এমন সময় এই পলাশ আর অনিল গিয়ে, ভালমানুষ দেখে, এক জার ক্রিম বিস্কুট জোর করে খেয়ে নিয়েছে। এক জার লজেন্স পকেটে পুরে পালিয়ে এসেছে।"

কমলবাবু আর ডাক্তারবাবু দু'জনে মিলে পলাশকে ধরে বসিয়েছেন। মাথাটা ঝুলে আছে বুকের কাছে। নড়নড় করছে। নিজের ছেলের দিকে একবারও না তাকিয়ে ডাক্তারবাবু পলাশকেই চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন।

এমন সময় বিদঘুটে চেহারার, দৈত্যের মতো এক ভদ্রলোক ধীরে ধীরে দর্শকের আসন থেকে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। ইনি হলেন পলাশের বাবা। ভদ্রলোকের প্রচুর পয়সা। মাইকা, লাইমস্টোন, আরও কী কী সব জিনিসের ব্যাবসা করেন। দু'-তিনখানা বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। তেএঁটে স্বভাবের মানুষ। অহংকারে মটমট করেন। কথায় কথায় যাকে তাকে চড়চাপড় চালান। সবাই জানে লোকটি তেমন সুবিধের নয়।

মঞ্চের সামনে এসে হেঁড়ে গলায় বললেন, "হেডমাস্টারমশাই, আপনার পুলিশ ডাকা উচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে একজন বললেন, "এই যে, আমরা আপনার পেছনেই আছি।" এতক্ষণ সবাই মঞ্চের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। লক্ষ করেননি কেউ। কখন সদর থানার অফিসার-ইন-চার্জ দলবল নিয়ে চলে এসেছেন।

"দেখি মহাশয়, হাত দুটো দেখি।" কটাং কটাং করে আওয়াজ হল দু'বার। অফিসার হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

কমলবাবু বললেন, "হেডমাস্টার স্যার। আমরা আর কী খেলা দেখাব, বাইরের খেলা তো আরও বেশি জমেছে। ব্যাপারটা কী? কী হচ্ছে এসব।"

॥ ৩ ॥

গোটা শহরে ভীষণ উত্তেজনা। সবাই বলছে, "টেরিফিক ব্যাপার মশাই। বড়লোক কি এমনিতে হয়। দু'নম্বরি রাস্তা ধরতে হয়। বাড়ির পর বাড়ি, গাড়ির পর গাড়ি। ছাদে সুইমিং পুল। রোজ রাতে হাজার বাতি জ্বেলে পার্টি। তলে তলে কত ব্যাপার ছিল একবার দেখেছেন মশাই।"

হাটে, বাজারে, চায়ের দোকানে, সেলুনে, সারাদিন মুখে মুখে এই এক কথা। শহরের একমাত্র দৈনিক, নর্দার্ন পোস্টের প্রথম পাতাতেই ফলাও খবর:

'ব্যবসায়ী গ্রেফতার। পরিত্যক্ত অভ্রখনি থেকে হাজার হাজার টাকার চোরাই মাল উদ্ধার। গত বছর লাডলো হাউসে মধ্য রাতে যে ভয়ংকর ডাকাতি হয়েছিল সেই লুটের মালেরও বেশকিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই অপরাধের অন্যান্য অপরাধীদের ধরবার জন্যে পুলিশ বিশাল জাল পেতেছে।'

পলাশের বাবার ছবি দিয়েছে। ছবি তোলার সময় ভদ্রলোক মুখ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন। পুরোটা ঢাকতে পারেননি। পাশ থেকে মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। খবরে সুকুর নাম আছে। বিখ্যাত ডিস্ট্রিক্ট সার্জেন ডক্টর প্রসন্ন

মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে সুকু পরোক্ষভাবে অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করেছে। এর জন্যে জেলাশাসক তাকে একটি চিড়িয়াখানা উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকেই হয়তো আশ্চর্য হবেন, একজন কিশোরকে একটি চিড়িয়াখানা কীভাবে উপহার দেওয়া যায়। শহরের প্রান্তে প্রখ্যাত ধনী ব্যারন মল্লিক একটি ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিলেন। গত বছর আথেন্স বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যাবার পর চিড়িয়াখানাটি অবহেলিত অবস্থায় ক্রমঃধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছিল। একজোড়া বাঘ ছিল, মারা গেছে তিন মাস আগে। সুকু মাসখানেক আগে জেলাশাসককে চিঠি লিখে চিড়িয়াখানাটিকে কীভাবে বাঁচানো যায়, তার প্ল্যান দিয়েছিল। জেলাশাসক সেই চিঠিতে খুশি হয়েছিলেন, এখন এই সিদ্ধান্ত। সুকুর সঙ্গে বন্যপ্রাণীদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। সাহসী এই ছেলেটি একবার একটি ময়াল সাপ জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে দীর্ঘকাল নিজের বাড়িতে রেখেছিল। ইতিমধ্যেই সে একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা করে ফেলেছে। কিশোরটির হাতে 'ব্যারন জু'-এর ভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। যোগ্যতার বিচারে বয়স কোনও বাধা হতে পারে না।

সুকুর বাবা কাগজটা সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন গুম মেরে। রুকু আর সুকু ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে বাবার মুখের দিকে। সকালের টোস্ট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আধ-কামড় মুখে নিয়ে চিবোতে আর সাহস হচ্ছে না। কড়ড় মড়ড় শব্দ হবে এক্ষুনি।

ডাক্তার প্রসন্ন বললেন, "এটা কী ধরনের সিদ্ধান্ত হল। পুরস্কার না তিরস্কার! এইটুকু একটা ছেলের ঘাড়ে অত বড় একটা চিড়িয়াখানা! সামলাবে কী করে!"

সুকুর মা বললেন, "নামেই চিড়িয়াখানা। বিশেষ কিছুই নেই। থাকার মধ্যে ডজনখানেক পাখি আর বাঁদর আছে।"

"তার মানে তুমি বলছ, এ হল বামুনকে গোরু দান। পুষতে পুষতে দুধ পাবার আগেই দেউলে। সুকুর পড়াশোনা তা হলে মাথায় উঠল।"

"তা কেন? ও ছেলে সব পারে।"

"সব পারলেও এটা পারবে না। চিড়িয়াখানা কি মুখের কথা! টাকার খেলা। বাঘ চাই, সিংহ চাই, ভাল্লুক চাই। মিউজিয়াম হলে কথা ছিল না। আমি জেলাশাসককে একটা চিঠি লিখে বিনীতভাবে জানাব, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার ফিরিয়ে নিন।"

সুকু হইহই করে উঠল, "না বাবা, না বাবা। আমি সত্যিকারের চিড়িয়াখানাই করব। চিড়িয়া মানে পাখি। আমি নানা জাতের পাখি পুষব।"

সুকুর কথা শেষ হবার আগেই দরজার ঘণ্টা নড়ে উঠল। কাজের মেয়ে সুখিয়া এসে বললে, "এক বাবু ডাকছেন।"

স্টেশনারি দোকানের মালিক হরেনবাবু এলেন। সুকুর হরেনদা। গম্ভীর মুখ। চেয়ার টেনে বসলেন। বসেই বললেন, "অসম্ভব খিদে পেয়েছে। আমি একটা টোস্ট খাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "একটা কেন? আপনি এক ডজন খান। একটা ডিমসেদ্ধ তুলে নিন প্লেটে। পটে চা আছে ঢেলে নিন।"

"আপনার বাড়ির চা অসহ্য ভাল। খেলে মন কেমন করে। দুঃখ হয়।"

"অ্যাঁ, দুঃখ হয়! সে আবার কী?"

রুকু হেসে ফেলেছে। সুকু বললে, "হরেনদা, অসহ্য ভাল না অসম্ভব ভাল!"

"অসম্ভব ভাল শব্দটা আমি জানি মাস্টার। কোনও নতুনত্ব নেই। যে ভাল সহ্য করা যায় না, তাকেই বলে অসহ্য ভাল। এইরকম নতুন নতুন কথা, তুমি আমার কাছে অনেক পাবে ভাই। লোকে কি আমায় সাধে ভালবাসে! ভালবাসে আমার অসম্ভব গুণের জন্যে।"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "গুণ আবার অসম্ভব হয় কী করে!"

"আজ্ঞে হয়। অসম্ভব গরম যদি হয়, অসম্ভব গুণ হবে না কেন?"

"বেশ হোক। তা মন-কেমন-করা চা জিনিসটা কীরকম?"

"আজ্ঞে, এই চা খেলে নিজের বাড়ির চায়ের কথা মনে পড়ে যায়, আর ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। এ কী রে বাবা! এর মানে চা! যেন গামছা নিংড়ানো জল!"

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আবার কে?"

দুধের মতো সাদা প্যান্ট-জামা পরে কমল ভৌমিক এসে ঢুকলেন। হাসি হাসি মুখ। পেছনে ওলটানো পরিপাটি চুল। হরেনদার মুখে ডিম আর টোস্ট। ভারী গলায় বলে উঠলেন, "কী সুন্দর চেহারা আপনার। যেন জলতরঙ্গ। একেবারে খলবল করছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনারই বা মন্দ কীসের!"

"না ভাই, আমার মেদ এসে গেছে। ফ্যাট জমে গেছে।"

"তা তো জমবেই, যেভাবে খাচ্ছেন।"

"কী করব বলুন! আমার একটাই রোগ। থেকে থেকে ভীষণ খিদে পায়।"

কমল ভৌমিক ডক্টর মুখার্জিকে নমস্কার করে চেয়ার টেনে বসলেন। সুকু আর রুকু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মানুষটির দিকে। যেমন লম্বা, তেমন চেহারা, তেমন সুন্দর দেখতে।

সুকুর মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবেন বলুন?"

হাসিহাসি মুখে কমল বললেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমি আবার ঘড়িধরা সময়ে খাই।"

হরেনদা বললেন, "হঠাৎ খিদে পেলে কী করেন?"

"পায় না। আমার ঘড়ি হল খিদে। ভোরের দিকে যেই খিদে পেল, অমনি বুঝলাম, সাতটা বেজেছে। ঘড়ি দেখুন। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। সাতটা, বারোটা, চারটে, আটটা। একেবারে বিলিতি ঘড়ি। স্লো-ফাস্ট হবার উপায় নেই।"

হরেনদা আর-একটা টোস্টের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, "কী করে এমন দুর্ঘটনা হল!"

"দুর্ঘটনা?" কমল ভৌমিক অবাক হলেন।

"ওই যে পেটটা ঘড়ি হয়ে গেল।"

কমল ভৌমিক হাসতে হাসতে বললেন, "হয়, হয়। সাধনার জোরে হয়। জীবন হল সাধনা। যতই সাধবেন, ততই সুর বেরোবে।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "সকাল সাতটার সময় কী খান আপনি?"

"সামান্য। আধসেরটাক ছোলা আর বাদাম ভেজানো। নুন আর আদাকুচি দিয়ে। তার আগে শ-পাঁচেক ডন আর হাজারখানেক বৈঠক মেরে নি।"

হরেনদা আঁক করে একটা শব্দ করলেন, "আহা রে, কী কষ্ট!"

কমল ভৌমিক বললেন, "এইবার একটা এ-কার যোগ করুন, কষ্ট না করলে কেষ্ট কি মেলে!"

"একটা এ-কারের জন্যে অত কষ্ট পোষায় না।"

কমল ভৌমিক মৃদু হেসে বললেন, "একেই বলে মানুষের বিকার। খাবেন অথচ হজমের চেষ্টা করবেন না!"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "তা বারোটার সময় কী খাওয়া হবে?"

"প্রথমে এক বাটি সেদ্ধ আনাজ, বিট, গাজর, বিনস, কপি, টম্যাটো, একটু নুন মরিচ আর লেবুর রস দিয়ে। এক কাপ ভাত। এক পিস মাছ। দু'খানা রুটি, এক বাটি চাপ চাপ ডাল, এক বাটি টক দই আর শসা।"

"বাঃ, ভারী সুন্দর। একেবারে সুষম আহার। তারপর?"

"আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর আমার রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকে চেপে ক্লাবে।"

"ক্লাবে? আর কোনও কাজকর্ম নেই।"

"আছে বই কী, আমার তো মেরামতি কারখানা, রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ।"

হরেনদা বললেন, "বাঃ, সুন্দর ব্যাবসা! মোটর-মেরামতি কারখানায়

আজকাল অসহ্য রোজগার। যে-কোনও একটা জায়গায় হাত লাগালেই হাজার।”

“আজ্ঞে, মোটর-মেরামতি নয়, আমার হল দেহ-মেরামতের কারখানা। বডি বিল্ডিং আর রিপেয়ারিং। যেমন ধরুন আপনি! ওই বিশাল ভুঁড়ি, খাবা খাবা মেদ, এরপর আপনি ব্রেকডাউন হবেন, নিলডাউন আর হতে পারবেন না, গাঁটে গাঁটে বাত এসে যাবে। আড়াইমনি শরীরের ভারে হার্ট বসে যাবে, রক্ত তেল আর ঘিয়ে মোটা হয়ে একদিন এমন ধাক্কা মারবে চিতপাত হয়ে যাবেন। মোটরগাড়ি হলে বডি থেকে ইঞ্জিন নামিয়ে যা হয় কিছু করা যায়, আপনার ইঞ্জিন তো আর নামানো যাবে না!”

“তা হলে?” হরেনদার হাত থেমে গেছে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

“তা হলে আর কী! খরচের খাতায় নিজেকে লিখে রাখুন। প্রবাদ আছে, বেশিদিন খেতে যদি চান, কম কম খান। হি দ্যাট ইটস লিস্ট ইটস মোস্ট। মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস। আমি আর কী বলব, সামনেই বসে আছেন আমাদের দেহযন্ত্রের মন্ত্রী। স্বয়ং ডক্টর মুখার্জি। তবে আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। পেয়েছি থাবায়, দশটা ডন আর বিশটা বৈঠক। মারতেই হবে। দুটো ডিম আর ছ’পিস টোস্ট ঢুকেছে উদরে।”

॥ ৪ ॥

কমল ভৌমিক খপ করে হরেনদার হাতের কবজি চেপে ধরলেন।

হরেনদা বললেন, “কী জ্বালা। এ কেমন রসিকতা মশাই। এই বয়েসে ডন বৈঠক।”

“ডন বৈঠকের কোনও বয়েস নেই মশাই। যে-কোনও বয়েসেই শুরু করা যায়।”

হঠাৎ ঝন ঝন করে কিছু খুচরো পয়সা পড়ার শব্দ হল। একটা পঞ্চাশ পয়সা গড়িয়ে চলে গেল রুকু আর সুকুর চেয়ারের মাঝখান দিয়ে একেবারে কোণে।

কমল ভৌমিক হরেনদাকে বললেন, “আপনার পকেটে ছ্যাঁদা আছে নাকি?”

হরেনদা প্রশ্ন করলেন, “ছিদ্র?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিদ্র? তা না হলে পয়সা পড়ল কী করে!”

“আমার পয়সা! আমার পয়সা পড়ে গেল!”

হরেনদা পয়সা কুড়োতে শুরু করলেন। একবার ওঠেন, একবার বসেন। বার দশেক হল। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসলেন। বসামাত্রই কমল ভৌমিক বললেন, "দিন, পয়সাগুলো দিন।"

"এই যে বললেন আমার পয়সা।"

"ছ্যাঁদা আছে আপনার পকেটে?"

"কই না তো!"

"তা হলে আপনার পয়সা হয় কী করে। আমি ইচ্ছে করে ফেলেছিলুম। দেখলেন তো, সহজেই আপনি ওঠ-বোস করতে পারেন। কী, শরীরটা এখন আগের চেয়ে বেশ ফিট মনে হচ্ছে না?"

হরেনদা বুক চিতিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কোমর আর হাঁটু দুটো বেশ ছেড়ে গেল মশাই।"

"আমার আরও অনেক কায়দা আছে, যেমন ধরুন, আমি আপনাকে এমন তিরবেগে ছোটাতে পারি, যা আগের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেবে। ওলিম্পিকের ছোটা।"

"আমাকে ছোটাবেন? এই শরীরে আমি ছুটব? ছোটার পর আমি বেঁচে থাকব! পাগল হয়েছেন আপনি?"

"আমি কেন ছোটাব। আমার টেকনিক আছে। আপনি নিজেই ছুটবেন। প্রাণ ভয়ে ছুটবেন। ছোটাবে একটা কেঁদো বাঘ। পরীক্ষা করতে চান? চলুন আমার সঙ্গে।"

হরেনদা উঠে দাঁড়ালেন। খুব খাওয়া হয়েছে। মুখটা একেবারে তুলতুলে নরম। ডা. মুখার্জি বললেন, "কী, উঠে পড়লেন যে!"

"হ্যাঁ, এবার যাই। বেশ ভয়ে ভয়ে আছি। ব্যাবসা-ট্যাবসা আর করা যাবে না মশাই। সাপের ন্যাজে পা পড়েছে। ঘুরে ছোবল না মারে!"

কমল ভৌমিক বললেন, "কীরকম, কীরকম?"

"ওই যে কালকের ব্যাপারটা। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। ওরা কি সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র!"

কমল ভৌমিক বললেন, "তাই নাকি! তা হলে আর কয়েক দিন থেকে যাই। বহুদিন তেমন ভালভাবে মারামারির সুযোগ পাইনি। ঈশ্বরের কৃপায় সেই সুযোগ এবার আসবে মনে হচ্ছে। এক ঘুসিতে আপনি ক'টা দাঁত ফেলতে পারেন?"

"একটাও না। একবার একজনকে একটা ঘুসি হাঁকড়ে, সাতদিন হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে ছিলুম। যাকে মেরেছিলুম, সে রোজ এসে খবর নিয়ে যেত, আর দুঃখপ্রকাশ করে যেত।"

কমল ভৌমিক বললেন, "সবকিছুর একটা কায়দা আছে। সেটা আগে শিখে নিতে হয়। আজই আপনাকে ঘুসি মারার কায়দাটা শিখিয়ে দেব।"

হরেনদা কাঁদোকাঁদো মুখে বললেন, "আমি যে আর ঘুসোঘুসি করব না, কোনওদিন করব না।"

"যাঃ, সে-কথা কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে! কে কখন কী করবে, তার কোনও ঠিক আছে মশাই। রাগ এমন জিনিস, অনেকটা ষাঁড়ের মতো। একবার বর্ষাকালে আমাদের শিমুলিয়ার বাড়ির দোতলার ঘরের জানালার পাল্লা আটকে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে কাঠ ফুলে উঠেছে। কিছুতেই খুলছে না। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। প্রথমে বাবা আউট, তারপর মা আউট, দিদি আউট। এক-একজন আসছে, আর পরাজিত হয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাচ্ছে। লাস্ট আমি। প্রথমে নিশ্বাস নিয়ে, দম বন্ধ করে শরীরটাকে ফুলিয়ে নিলুম, তারপর গেলুম রেগে।"

"রেগে গেলেন কী করে! জানালা তো আর মানুষ নয়, যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলবে!"

"তা নয়, তবে জানালাটাকে আমি মনে মনে জীবন্ত শয়তান করে তুললুম। একগুঁয়ে, অসভ্য, ইতর, ছোটলোক। মার বেটাকে। হাত মুঠো করে ঘুসি পাকালুম। কনুইয়ের কাছ থেকে ঝাঁকি মেরে, হাতের যত মাসল্‌স আছে সব শক্ত করে নিলুম, ঠিক এইভাবে।"

কমল ভৌমিক হরেনদার থেকে তিন-চার পা পিছিয়ে এলেন, তারপর দেখাতে লাগলেন। প্রথমে শ্বাস নিয়ে ফুলে উঠলেন। শ্বাস বন্ধ করে ফুলে রইলেন। ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকালেন। সে এক ভীষণ চেহারা। সেই চেহারা দেখে হরেনদা আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমি জানলা নই। ও মশাই, আমি জানলা নই। আমি হরেন।"

কমল ভৌমিক ফোঁস করে শ্বাস ফেলে শরীর আলগা করে দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, "ভাগ্যিস স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি কিন্তু আপনাকে জানলাই ভাবছিলুম, দাম করে এক ঘুসি মারলেই হয়েছিল আর কী! এখনও পর্যন্ত আমার বেস্ট রেকর্ড এক ঘুসিতে একত্রিশটা দাঁত। একটা নাক একেবারে পুরো চ্যাপ্টা। একটা মুখের একেবারে তিনটে প্রোজেকশান।'

হরেনদা ভয়ে ভয়ে বললেন, "প্রোজেকশান মানে?"

"মানে তিন দিকে ফুলে উঠল ঢ্যাপা হয়ে। একটা মুখ তিনমুখো হয়ে গেল। সবই কায়দা মশাই, ঘুসি মারার কায়দা।"

রুকু আর ধৈর্য ধরতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "সেই শিমুলতলার জানলাটার কী হল?"

সুকু বললে, "শিমুলতলা নয় শিমুলিয়া।"

কমল ভৌমিক হাসলেন, "সেম মিসটেক। কলকাতার মিসটেক। গড়িয়া আর গড়িয়াহাট। হাট বাদ গেলেই দশ কিলোমিটার ঠেলে নিয়ে যাবে। কী বলছিলে, সেই জানলাটা, গরাদের মধ্যে দিয়ে মারলুম এক ঘুসি। সোজা রাস্তায়।"

হরেনদা বললেন, "কে, আপনি?"

"আমি কেন! জানলার দু'পাটি পাল্লা। কবজা থেকে খুলে, সোজা রাস্তায়। তারপর পুলিশ কেস।"

"কে! জানলা কেস ঠুকে দিল?"

কমল ভৌমিক বললেন, "অবিলম্বে খাওয়া কমান। সপ্তাহে তিন দিন অন্তত উপবাস। শরীরের সব রক্ত পেটের দিকে চলে যাচ্ছে। মাথামোটা হয়ে যাচ্ছেন।"

হরেনদা থতমত খেয়ে বললেন, "কেন, কেন? সবাই বলে, আমার ব্যাবসা বুদ্ধি খুব ভাল।"

"জানলা কি মানুষ যে কেস করবে? কেস করে দিলেন আমার কাকা।"

"কাকা! কাকা তো আপনার লোক। কাকা কেস করে দিলেন!"

"ওই যে, টাকা! টাকার লোভে কাকা কেস করে দিলেন।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপনারা আবার বসে পড়ুন, এ কেস অনেক দূর গড়াবে। আমি আবার চা বলি।"

"আবার চা!" একটা লজ্জা লজ্জা ভাব মুখে এনে হরেনদা বসলেন।

ডক্টর মুখার্জি সুখিয়াকে ডেকে আবার চায়ের হুকুম করলেন। সকালের দিকে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তাঁর একটু সময় থাকে। তারপর আর কথা বলার অবসর থাকে না।

কমল ভৌমিক আবার বসে পড়লেন। পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে মুখে একটা টুকরো মতো কী ঢোকালেন। সঙ্গে সঙ্গে হরেনদা বললেন, "বদ অভ্যাস, অতি বদ অভ্যাস।"

"কী বদ অভ্যাস? বদ অভ্যাসের কী দেখলেন?"

"ওই যে সুপুরি। টুক করে একটা সুপুরি ফেলে দিলেন মুখে এই সাত সকালে?"

"ধুর মশাই, সুপুরি নয়, হরীতকী। ত্রিদোষনাশক।"

"সে আবার কী?"

"কিছুই জানেন না, কেবল গপ গপ করে খেতে জানেন। হরীতকী ফল নয়। হরীতকী ফল হল দেবতা। ত্রিদোষ মানে, বায়ু পিত্ত কফ। হরীতকী খেলে মানুষের পরমায়ু বাড়ে। অনায়াসে একশো বছর বাঁচা যায়।"

হরেনদা লাফিয়ে উঠলেন, "আমিও তা হলে খাব।" বলেই কেমন যেন

মিইয়ে গেলেন। পরক্ষণেই বললেন, "কী হবে খেয়ে। কী হবে বেঁচে। বেশি দিন বাঁচা মানেই তো, বেশি দুঃখ। আমি চা খাব, কাপ কাপ চা, তেলেভাজা। তাড়াতাড়ি মরতে হবে। মরে বাঁচতে হবে।"

কমল ভৌমিক অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনছেন? ভদ্রলোকের অবস্থা দেখুন। এই রকমই হয়। ব্যায়ামের অভাবে শুধু শরীর নয়, মনও ভেঙে যায়। চলুন আজই জোগাড় করে ফেলি।"

হরেনদা বললেন, "কী জোগাড়?"

"চারখানা থান ইট। এপাশে দু'থাক, ওপাশে দু'থাক। এক হাত এক বিঘৎ ব্যবধানে। আর হ্যাঁ, আর একটা জিনিস চাই।"

"কী, বালি-সিমেন্ট?"

"আরে না মশাই, চাই অ্যালার্ম ক্লক। আছে আপনার?"

"আমার একটা ওয়াল ক্লক আছে।"

"ওয়াল ক্লকে হবে না, চাই অ্যালার্ম ঘড়ি। চলুন, চলুন।"

"কী হবে রে বাবা, ইট আর ঘড়ি। এ যেন চাল আর চালকুমড়ো। হাত আর হাতি।"

"আজ রাতে ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে শুতে যাবেন। ভোরে উঠবেন, মালকোঁচা মারবেন আর ইট পেড়ে ডন। এক, দুই, তিন, চার। প্রথমে বারোবার। পাঁচ মিনিট রেস্ট। আবার বারো, পাঁচ মিনিট রেস্ট। আবার বারো।"

হরেনদা উঠে পড়লেন। ডক্টর মুখার্জি বললেন, "এ কী, চললেন কোথায়?"

"আমি যাই। আমি যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ এই ভদ্রলোক কেবল ডন-বৈঠকের কথাই বলবেন। আমার আর ভাল লাগছে না। আমি পাগল হয়ে যাব। শুয়ে আর বসে আমি সারা জীবন কাটিয়েছি, এখন ইনি বলছেন ব্যায়াম করো, ব্যায়াম করো। এই ভদ্রলোককে কী ব্যায়রামে ধরেছে বলুন তো?"

হরেনদা হাঁ করে রইলেন।

॥ ৫ ॥

ডা. মুখার্জি বললেন, "আপনি নির্ভয়ে বসুন। ব্যায়ামের কথায় কান দেবেন না আপনি। আপনার শরীর আমার হাতে। ট্যাবলেট আর ক্যাপসুলের যুগ। শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী। বসুন। বসুন।"

ভরসা পেয়ে হরেনদা বসলেন আবার। কমল ভৌমিক বসলেন হাত-

তিনেক দূরে আর একটা চেয়ারে। পেছনে একটা বড় ফুলগাছের টবে একটা পামগাছ লকলক করছে। পামগাছের পাতার একটা কোণ কমলের ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তিনি ঘাড়টা এপাশ-ওপাশ করছেন।

ডা. মুখার্জি বললেন, "চেয়ারটা একটু সামনে টেনে নিন না, পাতাটা অসুবিধে করছে।"

আধবোজা-চোখে কমল বললেন, "বেশ ফাসক্লাস লাগছে। কেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। গাছ ছাড়া মানুষকে কে আর এত ভালবাসবে বলুন।"

"আপনার ভাল লাগছে? তা হলে বসুন ওখানে।"

হরেনদা বললেন, "ডন-বৈঠকের ঠেলায় কাকাবাবুর গল্পটা কিন্তু হারিয়ে গেল।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমার কাকাবাবু হারবেন? মামলায় তাঁকে কেউ কোনওদিন হারাতে পারেনি, পারবেও না। আমরা তাঁর নাম রেখেছি মামলাকাকু। তা হলে শুনুন। আমাদের শিমুলিয়ার বাড়িতে যে কাজ করে তার নাম শুভঙ্করী। এখন তার অনেক বয়েস। আমাদের ছেলেবেলায় তার কিন্তু অত বয়েস ছিল না।"

হরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"কী আশ্চর্য কাণ্ড বলুন তো। আমাদের ছেলেবেলায় কাকাবাবুরও অত বয়েস ছিল না। এই সুন্দর চেহারা। খাড়া গোঁফ। সকালে হাজার ডন না মেরে ছোলা খেতেন না।"

হরেনদা বললেন, "এই রে, আবার ডন আসছে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভয় পাবেন না, এ হল কাকাবাবুর ডন। হাজারটা ডন মারা মুখের কথা নয়। একবার মেরে দেখুন না। কাকাবাবু ছিলেন ডন-সিদ্ধ পুরুষ।"

হরেনদা বললেন, "এই এক জ্বালা, আপনি যেখান থেকেই কথা শুরু করুন না, ঘুরে ঘুরে ঠিক চলে আসবে ডনে।"

আহা যার যেমন বাড়ি। আমাদের বাড়িটাই যে ডন-বৈঠকের। সেইজন্যে আমাদের বাড়ির নাম বৈঠকখানা। গেলেই দেখতে পাবেন, সামনে মার্বেল ফলক। কালো অক্ষরে লেখা: 'বৈঠকখানা'। শুনুন মশাই, আজ একটা সার কথা বলে যাই, শক্তি, শক্তিই হল সব। স্ট্রেংথ। আগ্নেয়গিরি দেখেননি, তবে শুনেছেন, সেই আগ্নেয়গিরি হতে হবে। কেঁচো হয়ে অনেক দিন হয়তো বাঁচা যায়, তবে বাঘের আনন্দ পাওয়া যায় না, সিংহের সম্মান পাওয়া যায় না। ওই যে ছেলেটি, ওই যে আমার সুকু, ওকে আমি কাল রাত থেকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। ওরই টানে আজ আমি খুঁজে খুঁজে চলে এসেছি। ওকে

আমি মানুষের মতো মানুষ করব। শক্তিতে, শিক্ষায়, চরিত্রে। আমি জানি মানুষকে কীভাবে মানুষ করতে হয়। সব সময় মনে মনে বলতে হবে অ্যারাইজ অ্যাওয়েক। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ওঠো, জাগো।"

ডা. মুখার্জি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কমল ভৌমিকের মুখের দিকে। একটা যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। জল এসে গেছে তাঁর চোখে। তাঁর ছেলের প্রতি অপরিচিত একজন মানুষের এত ভালবাসা। এতক্ষণ তাঁর মনে হয়েছিল, ব্যায়াম ট্যায়াম করে, গুলিটুলি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বড় বড় করে বোকা বোকা কথা বলে, ভেতরে বিশেষ কিছু নেই। সে ধারণা পালটাতে হল। অসাধারণ একজন মানুষ।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন কমল ভৌমিকের দিকে। নিজের দু'হাতে তাঁর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার ভাই ছিল না, আজ থেকে আপনি আমার ভাই হলেন। আপনার এত ভালবাসা!"

দরজার সামনে রাজ্যেশ্বরী এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের সামনে অদ্ভুত সেই দৃশ্য। ডাক্তারের চোখে জল। কমল ভৌমিকের চোখে জল। ছেলে দুটো হাঁ হয়ে গেছে। হরেনদা বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। রাজ্যেশ্বরী ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর একে একে চায়ের কাপ সাজাতে লাগলেন।

হরেনদা বললেন, "বউদি, দৃশ্যটা দেখছেন। স্বর্গীয়। পৃথিবীতে আপন-পর বলে কিছু নেই। ভালবাসা, ভালবাসা। ভালবাসাই সব। শুনুন মশাই, কাল থেকে আমি করব।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "কী করবেন?"

"আপনাকে বলতে লজ্জা করছে। বয়েস হয়েছে তো!"

কমল ভৌমিক বললেন, "কাল থেকে উনি ব্যায়াম করবেন। শরীরটা দেখছেন না, বেঢপ হয়ে গেছে। কোনও ছন্দ নেই। মানুষের শরীর হল কবিতার মতো, সংগীতের মতো।"

সুকু কমল ভৌমিকের কাকাবাবুর গল্প শোনার জন্যে ছটফট করছিল। মনে করিয়ে দিলে, "তারপর সেই কাকাবাবু। কাকাবাবুর গল্পটা বলুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সেই মামলাকাকু। শুভঙ্করী একতলা থেকে তিনতলায় জল তোলার সময় দোতলার সিঁড়িতে একটু জল ফেলে রেখেছিল।"

হরেনবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "অ্যাঁ, বলেন কী, কলকাতার মতো শহরে আপনাদের তিনতলা বাড়ি। আপনি তো মশাই বড়লোক। ডন-বৈঠক মেরেও তা হলে পয়সা হয়।"

"বাড়িটা আসলে তিনতলা নয়, পাক্কা চারতলা। তবে চারতলাটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ওখানে একটা ভূত থাকে।"

"ভূত মানে?"

"ভূত মানে ভূত। রিয়েল ভূত। সে আবার আর-এক গল্প।"

"তা হলে ডন-বৈঠকে চারতলা হয়?"

"হবে না! ইংরেজিতেই তো আছে, হেলথ ইজ ওয়েলথ।"

সুকু বললে, "ধুর, আসল গল্পটা আর শেষই হচ্ছে না।"

কমল বললেন, "এইবার আমি গড়গড় করে শেষ করে দিচ্ছি। আর অন্য কথা নয়।"

হরেনদা বললেন, "তা হলে ভূতটা কখন হবে?"

"রাত্তিরে। ভূত রাত ছাড়া আসে না। তা সেই শুভঙ্করী, তার আর কী দোষ বলুন! কেউ কি আর ইচ্ছে করে জল ফেলে!"

হরেনদা সমঝদারের মতো ঘাড় নাড়লেন, "ঠিকই তো, ঠিকই তো, জলই বলুন আর চা-ই বলুন, আর দুধই বলুন, তরলের ধর্মই হল উপচে কি টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া। আর পারা যায় না মশাই। অসম্ভব ব্যাপার।"

"অ্যায়, ধরেছেন ঠিক, ধর্ম। মানুষের ধর্ম কী, বলুন তো!"

"এই আপনার দোষ। ছাত্র ভেবে বড় পালটা প্রশ্ন করেন।"

"মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা। ভগবান রামকৃষ্ণ বলতেন, মান আর হুঁশ দুয়ে মিলে মানুষ। হুঁশটি হারালে মানুষ আর মানুষ থাকে না। শুধু ডাম্বেল বারবেল নয়, কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও করেছি।"

"ইস, এটা না বললেই পারতেন; কিঞ্চিৎ গর্বের প্রকাশ হল। আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়। লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।"

কমল ভৌমিক হেসে বললেন, "টাকার অহংকার ছাড়া অন্য সব অহংকার করা যায়। ভগবান রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, সতের অহংকার ভাল। তা আমি আপনার কথা শুনব, না তাঁর কথা শুনব!"

সুকু বললে, "আবার গল্প হারিয়ে যাচ্ছে।"

কমল বললেন, "শোনো বাবু সুকুমাস্টার, গল্পের ধর্মই হল নদীর মতো হারিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে পাতাল-প্রবেশ। নদীর মতো গল্পেরও শাখা-প্রশাখা বেরোয়। এক দিকে যেতে যেতে আর-এক দিকে চলে যায়। তুমি বলো, কোন গল্পটা সোজা গড়গড় করে চলে। গল্প তো আর নালা-নর্দমা নয়!"

ডাক্তার মুখার্জি এতক্ষণে কথা বললেন, "ঠিক, ঠিক। আমাদের ছেলেবেলায় মা-ঠাকুমা যে-সব গল্প বলতেন, সে যেন গঙ্গা, আমাজন, ভল্‌গা, মিসিসিপি। তিন রাত, চার রাত, সাত রাত। সে আর শেষই হয় না। আজ তা হলে এইখানেই ক্রমশ লাগান।"

সুকু হইহই করে উঠল, "না বাবা, না। আর-একটু হোক।"

"বেশ, আর দু'কদম এগোক। আমাকে এবার উঠতে হবে। ঘড়ি তাড়া লাগাচ্ছে।"

কমল ভৌমিক শুরু করলেন, "আমার সেই মামলাকাকু এইবার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পরনে গরদ।"

হরেনদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "গরদ কেন?"

"পুজো সেরে নীচে নামছেন।"

"মামলাও করেন, পুজোও করেন!"

"তা কেন করবেন না! পুজোটা তাঁর ভেতরের দিক, মামলাটা তাঁর বাইরের দিক। মানুষ অনেকটা দেয়ালের মতো। ভেতরের দিক, বাইরের দিক। ভেতরে ঠাকুরের ছবি ঝুলছে, বাইরে পোস্টার পড়ছে। গোবর-মাসি ঘুঁটে সাঁটছে।"

সুকু বললে, "তারপর!"

কমল হাসলেন, "হ্যাঁ, এইভাবে মাঝে মাঝে ঠেলেঠুলে দাও মাস্টার। গল্প অনেকটা ব্যাটারি-ডাউন গাড়ির মতো। মাঝে মাঝে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন একটু করে ঠেলে দিতে হয়। পরনে গরদ। দু'হাতে দুটো প্রসাদের থালা। বগলে আসন। মামলাকাকু গুনগুন করতে করতে নামছেন, ভব সাগর তারণ। নীচে থেকে আমরা সবাই শুনছি। কাকু আসছেন। আমরা হাঁ করে আছি প্রসাদের লোভে। বছরের প্রথম আম, ঠাকুরকে দেওয়া হয়েছে। সত্যর সাতপাকে বাঁধা গুঁজিয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে হরেনদার প্রশ্ন, "সাতপাকে বাঁধা গুঁজিয়া! হোয়াট ইজ দ্যাট। গুঁজিয়ার ক'টা পাক হয় মশাই? দেশ থেকে অঙ্কটঙ্ক সব উঠে গেল নাকি! গুঁজিয়া তো সাধারণত ইউ-এর মতো দেখতে হয়। তার মানে তিনপাক। বাড়তি চারটে পাক এল কোথা থেকে!"

"পৃথিবীর সবকিছু কি অঙ্ক মেনে চলে। এই তো আমাদের পাড়ায় যে হরেনদা আছেন, তিনি ছ'ফুট লম্বা, রোগা, ফরসা, গান শেখান, আর সময় পেলেই কেষ্টর দোকানে ব্রেস্ট কাটলেট খান মাস্টার্ড দিয়ে। আপনিও হরেনদা, তিনিও হরেনদা, দু'জনে এক হলেন? সত্যর গুঁজিয়ার সাতপাক। আমরা বলি সত্যর সাতপাক। হরেনদা আবার কালোয়াতি গান বেঁধে ফেললেন:

সত্যর সাতপাক সাত সুরে সাধা
সস সস সস সস সস সস সা ॥

রাগ ভৈরবী। তাল, ত্রিতাল। শেষ সা-এর ওপর সম।"

॥ ৬ ॥

সুকু আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলে ফেললে, "ধুস, মামলাকাকুর গল্প আর শেষ হবে না।"

কমল ভৌমিক হাসিহাসি মুখে বললেন, "মাস্টার, তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা হচ্ছে জানো কি তা। আমি একবার বিলেত গিয়েছিলুম, বুঝলে সুকু। গিয়েছিলুম ফিজিওথেরাপি শিখতে।"

হরেনদা সসম্ভ্রমে বললেন, "আপনি বিলেত ফেরত। আপনাকে দেখে তো বোঝার উপায় নেই। প্যাটর প্যাটর ইংরেজি নেই মুখে। আপনি নমস্য।"

কমল ভৌমিক উত্তরে মুচকি হাসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন বিলেতের গল্প।

"আমাদের কিচেন-ম্যানেজার ছিলেন উডসাহেব। একদিন রাতে, সেদিন ভীষণ শীত। শরীরটা তেমন ভাল নেই, তাড়াতাড়ি শোব, এইরকম একটা ইচ্ছে। খাবার ঘরের কাউন্টারে গিয়ে খুব তাড়া, 'খাবার দিন, খাবার দিন।' উডসাহেব টুলে বসে তোয়ালে দিয়ে ছুরি কাঁটা মুছছেন। আমার দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন, কোনও কথা নেই। টুল ছেড়ে ওঠারও নাম নেই। আমার পরে যারা এল, তারা একে একে খাবার নিয়ে যে-যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। আমি সমানে ছটফট করছি আর চিল্লে যাচ্ছি, 'খাবার দাও, খাবার দাও।' শেষে বিরক্ত হয়ে চলে আসছি, উডসাহেব ডাকলেন, 'ভৌমিক'। জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী।' সাহেব বললেন, 'এটা তোমার অধৈর্যের শাস্তি। ভারতীয়দের সব আছে, নেই কেবল ধৈর্য।' বুঝলে মাস্টার, সেই আমার শিক্ষা হয়েছিল। তা তোমারও ধৈর্য আছে। চুপ করেই বসে আছ অনেকক্ষণ।"

হরেনদা সমর্থন করলেন, ''তা ঠিক। নাঃ, গল্পটা এবার শেষ করুন।"

"আমার মামলাকাকু নামছেন। পরনে পট্টবস্ত্র। দু'হাতে প্রসাদী থালা। বগলে আসন। পায়ে খড়ম। গুনগুন গান, ভবসাগর তারণ। তারপর একটা শব্দ। একটা নয়, অনেক শব্দ। যেন রাম-ভজন হচ্ছে। কাঠ খত্তাল, কাঁসর, ঢাক। প্রথমে নেমে এল এক জোড়া খড়ম। পেছন পেছন এল বাতাসা, আমের ফালি, সত্যর সাতপাক, এল পুজোর আসন, সব শেষে বিশাল এক তরমুজের ফালির মতো কাকাবাবু। আমরা সবাই ধরে তুলতে গেলুম। ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলেন। চোখ দুটো জবার মতো লাল। ঢোক গিলতে লাগলেন। জামা-কাপড় পরে একপাশে কাত মেরে, ক্যাতরাতে ক্যাতরাতে বেরিয়ে গেলেন, বগলে ছাতা। তিন দিনের দিন, শুভঙ্করীর নামে শমন এসে হাজির— অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। নাও, বোঝো ঠ্যালা।"

হরেনদা বললেন, "শুভঙ্করীর কী হল! ফাঁসি?"

"কিছুই হল না। সাত দিনের দিন কেস তুলে নিলেন নিজেই। কাকাবাবুর মামলা হল, রেকর্ডে পিন চাপানো। একটা পিঠ বেজে গেলে নিজেই আবার তুলে নেন। মা একবার তরকারিতে ঝাল বেশি দিয়েছিলেন বলে কেস ঠুকে দিয়েছিলেন, অ্যাটেম্পট অন লাইফ।"

"তিনি এখন কোথায়?"

"তিনি এখন পরলোকে মামলা করছেন।"

"এত আগে চলে গেলেন?"

"পৃথিবীটা সহ্য হল না। রেগে রেগেই মারা গেলেন।"

"শোকসভা হল?"

"হ্যাঁ, আমরা সবাই খুব কান্নাকাটি করলুম। সবচেয়ে বেশি শোক করলেন কাকার উকিল, অত বড় মক্কেল ছিলেন কাকা।"

হরেনদা ঘড়ি দেখলেন। ভুঁড়ির ওপর হাত বোলালেন দু'বার। চারপাশে তাকালেন দুঃখু দুঃখু মুখে, তারপর বললেন, "যাই এবার। গিয়ে দোকানে বসি। পারা যায় না আর। কিছু না করলে হাঁড়ি চড়বে না। আবার কিছু করতে গেলেই গা ম্যাজম্যাজ করে। আমার যদি একটা জমিদারি থাকত। একরের পর একর জমি। সবুজ ধান হয়ে আছে। বাতাসে হিলহিল করে দুলছে। একটা জঙ্গলমহল। শাল, সেগুন, মেহগিনি, ইউক্যালিপটাস, একেবারে ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে আছে। একটা ছোটখাটো পাহাড়। একটা পাহাড়ি নদী।"

কমল ভৌমিক বললেন, "একটা ঝরনা থাকলে কেমন হয়!"

"উঃ, সোনায় সোহাগা। চাঁদের আলোয় বাঘ আসে চকচক করে জল খেতে। দুপুরে বনের ছায়ায় ছায়ায় হরিণ থমকে থমকে দাঁড়ায়।"

"একটা সোনার হরিণ থাকলে কেমন হয়!"

"উঃ, সে তো একেবারে সোনায় সোহাগা।"

"সোনার হরিণ কিন্তু আসলে রাক্ষসী।"

"ও বাবা, তা হলে থাক, দরকার নেই। একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি। সেই বাড়িতে আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকব আর থেকে থেকে আমার নায়েব এসে শুনিয়ে যাবে, 'হরেনবাবু, বিশ লাখ হল। হরেনবাবু, তিরিশ লাখ।' নাঃ, উঠি, আর না। আজ আবার শহরে যেতে হবে, সওদা আছে। দোকান একেবারে ফাঁকা।"

হরেনদা চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা আড়মোড়া ভাঙলেন। মাথার ওপর দু'হাত তুলে আঁ-আঁ করছেন, কমলদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ,

বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, কোমরটা আর একটু পেছন দিকে বাঁকান, বাঁকান। একে বলে অর্ধচন্দ্রাসন।”

হরেনদা তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে বললেন, “পালাই বাবা। বুড়ো বয়সে কোমর ভেঙে পড়ে থাকলে কে দেখবে!”

হরেনবাবু রাস্তায় নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। বছরের এই সময়টা ভারী সুন্দর। গাছে গাছে নতুন পাতা আসার আগে, গাছের ডাল যেন সড়সড় করছে, সুড়সুড় করছে। চুলকোচ্ছে সারা গা। তলা দিয়ে যাবার সময় ফিসফিস শব্দ শোনা যায়, কচি কণ্ঠ, ‘আমরা বেরোব, আমরা বেরোব।’ পথের পাশে সার সার বাংলো। মরসুমি ফুলে ভরে আছে।

হরেনবাবু হাঁটার গতি বাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লেন। দু’পাশে ফাঁকা জংলা জমি। বড় রাস্তা বুক চিরে বহুদূরে চলে গেছে। ওপাশে আকাশের গায়ে একটা পাহাড় আটকে আছে। পাহাড়টার নাম, ভোলানাথ। খুব লক্ষ্মী ছেলে। বর্ষার সময় ওই দিক থেকেই মেঘ আসে। বৃষ্টি ছুটে আসে। পাহাড় তখন মাস তিনেকের জন্যে একটা নদী পাঠিয়ে দেয় নীচে। নদীর নাম শিলডুংরি। দুষ্টু মেয়ের মতো সে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। নীচে যারা আছে সবাই তাকে কোলে তুলে নেয়। বড় আদরের মেয়ে সে। জলে অভ্রের কণা চিকচিক করে। কত রকমের, কত রঙের নুড়ি ভেসে আসে, গড়িয়ে আসে, জলের ধারায় পাহাড়ের মাথা থেকে। ভোলানাথের মাথায় ওঠার সাহস কারও নেই। ভোলানাথ মানে মহাদেব। কে উঠবে মহাদেবের মাথায়! সবাই বলে ওখানে এক লক্ষ সাপ কিলবিল করছে। আরও সব ভয়ংকর জিনিস আছে। ভূত-প্রেত। একবার এক সায়েব কারও বাধা না মেনে, সাহস করে পাহাড়ে গিয়েছিলেন। শেষ যাওয়া। আর ফিরে এলেন না। পরের বর্ষায় শিলডুংরির ধারায় তাঁর টুপিটা ভেসে এল। কত কত লোক দেখতে ছুটল। টুপির ভেতরে স্পষ্ট লেখা, ব্রিসবেন হ্যাট কোম্পানি, ইংল্যান্ড। ছ’জন সায়েবের একটা দল এল বিদেশ থেকে অনুসন্ধানে। সে এক ভীষণ ব্যাপার। পাহাড়ে তারা যাবেই। শেষে কী হল কে জানে। তিনদিন খুব ঘোরাঘুরি করে তারা চলে গেল।

পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে হরেনবাবু রাস্তার পাশে সরে গেলেন। একেবারে ধারে। আর সরা যায় না। এরপর ঢালু। খাড়া নেমে গেছে, পাথর আর ঝোপঝাড়ে ভরা জমির দিকে।

গাড়িটা খুব বেগে আসছে। উৎকট শব্দ। হরেনবাবু চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে, ‘আরেঃ, সর্বনাশ’ বলতে বলতেই জোঙ্গা জিপ প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। লাফ মেরে ঢালু বেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে হরেনবাবু হইহই রাক্ষুসে হাসি

শুনলেন। পথের পাশের জমা ধুলো সোনালি রোদে ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে উঠছে।

অনেকটা নীচে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে গড়াতে গড়াতে হরেনবাবু একটা পাথরে এসে আটকে গেলেন। খুব বাঁচা বেঁচেছেন। লেগেছে খুব। কেটেকুটে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত। ভাগ্যিস শীতকাল। তা না হলে গাড়িচাপা থেকে বেঁচে মরতে হত সাপের কামড়ে।

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। শরীরের চাপে অনেক গাছপাতা থেঁতলে গেছে। অদ্ভুত একটা বুনো বুনো গন্ধ বেরোচ্ছে। অনেক উঁচুতে রাস্তা। চারপাশ অসম্ভব নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের ফিসফিস শব্দ। কোথাও একটা পাখি ডাকছে, 'টুইট, টুইট।'

ক্ষত-বিক্ষত শরীর জ্বলছে। চশমাটা কোথায় ছিটকে চলে গেছে। সে আর পাওয়া যাবে না। বুকপকেটে হিসেব টিসেব লেখা ছোট একটা ডায়েরি ছিল। সেটা নেই। গড়িয়ে পড়ার সময় বেরিয়ে চলে গেছে। ঝোপের মধ্যে কোথায় গেছে কে জানে!

ভীষণ অসহায় লাগছে। উঠবেন কী করে ওপরে! অনেক উঁচু। একেবারে খাড়া। ধরার টরার কিছু নেই। ভারী শরীর। পায়ে তেমন জোর নেই। চিৎকার করলে কে শুনবে? সাহসও নেই। জিপটা তাঁকে মারতেই চেয়েছিল। বলা যায় না, আবার যদি ঘুরে আসে। ভয় ভয় করছে। কে তাঁকে মারতে চায়!

নাঃ, পড়ে থাকলে চলবে না। ঠেলে উঠতে হবে। হঠাৎ শুনলেন, রাস্তা দিয়ে কে গান গাইতে গাইতে চলেছে। 'জয় রাম, রাম জয়, জয় রাম, রাম জয়।'

হরেনদা চিৎকার করলেন, "রামজি, রামজি, ও ভাই রামজি।"

শুনবে কী! গানেই মত্ত।

আবার ডাকলেন, "ও ভাই রামজি।" এবার খুব জোরে।

রামনামে কাজ না হয়ে যায়। ওপর থেকে দেহাতি গলা ভেসে এল, "কৌন হো?"

অনেক উঁচুতে বেশ সুন্দর একটা মুখ দেখা গেল। জটাজুটে ঘেরা। হরেনবাবু চিনতে পারলেন। ইনি সেই রামমন্দিরের সন্ন্যাসী, ভগবানদাস। ভক্তমানুষ। প্রেমিক।

"আরে হরেনবাবু। পড়ে গেলেন বুঝি?"

"না বাবা। আমাকে ফেলে দিয়েছে। সে অনেক কথা। আমাকে আগে তুলুন।"

"জয় রামজি," ভগবানদাস গায়ের গেরুয়া চাদর কোমরে বেঁধে হুড়হুড় করে নীচে নামতে লাগলেন। টলছেন না, টাল খাচ্ছেন না। টকটকে ফরসা

রং। পাথর-কোঁদা শরীর। পা লেগে ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ছে। একটা বহুরূপী ন্যাজ তুলে ছুটল।

॥ ৭ ॥

ভগবানদাস ধীরে ধীরে ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে, কাঁটার খোঁচা সরিয়ে, ধাপে ধাপে, কখনও সামনে থেকে হাত ধরে কখনও পেছন থেকে ঠেলে হরেনবাবুকে ওপরে নিয়ে এলেন। অত মোটা কাপড়ের খাকি ফুলপ্যান্ট, তাও জায়গায় জায়গায় পাথরের ঘসা লেগে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। জামার পেছন দিকটা একেবারে ফালা। শরীরের কোথাও থেঁতলে রক্ত জমে গেছে, কোথাও গভীর ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে।

রাস্তার পাশে বৃদ্ধ বটের তলায় হরেনবাবু বসে পড়লেন। আর দাঁড়াতে পারছেন না। হাঁটার ক্ষমতা নেই। সারা দেহে কাঁপুনি ধরে গেছে। মৃত্যুর মুখ থেকে কোনওক্রমে ফিরে এলেন। এই প্রথম বুঝলেন, মানুষ মরতে একেবারেই ভালবাসে না। বিশ্রী লাগে। ভয় করে। মরে গেলে আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু না মরলে বেঁচে থাকার আনন্দ যে কী, তা বেশ বোঝা যায়।

হরেনদা সন্ন্যাসীকে ছেলেমানুষের মতো বললেন, "আমি জল খাব। আমার ভীষণ জল-তেষ্টা পেয়েছে।"

সন্ন্যাসীর কোমরের কাছে গোঁজা ছিল গেরুয়া রঙের একটা ঝোলা। সেই ঝোলা থেকে একটা গাছের মূল বের করে হরেনদার হাতে দিয়ে বললেন, "খেয়ে ফেলুন।"

"আমি জল খাব, জল।"

"আরে ব্যাটা, খা লিজিয়ে, ইসমে পানি হ্যায়।"

"হ্যাঁ, এক টুকরো শেকড়ে পানি হ্যায়!"

"হ্যায়, বাবা, হ্যায়।"

হরেনদা শেকড়টা মুখে ফেলতেই জিভ থেকে গলা পর্যন্ত পুরো অংশটা একেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। এক ঘড়া জল খেয়ে ফেললেও এমন হত না। হরেনদা দু'হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, "জয় রামজি কি জয়।"

দূরে দেখা গেল সাদা একটা গাড়ি আসছে।

হরেনদা ভয়ে ভয়ে বললেন, "ওই রে, একটা গাড়ি আসছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "গাড়ি আসছে তা কী হয়েছে! রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে না?"

গাড়ি দেখলেই হরেনদার ভয় করতে শুরু করেছে। আবার যদি তেড়ে এসে চাপা দেয়!

হরেনদা আর সন্ন্যাসীর সামনে এসে গাড়ি থেমে পড়ল। গাড়িটাকে রাস্তার ধারে সরে আসতে দেখে হরেনদা আবার ঢালু বেয়ে নীচের জংলা ঝোপে গড়িয়ে পড়ার তালে ছিলেন। সন্ন্যাসী খপ করে একটা হাত চেপে ধরেছেন।

গাড়ির ভেতরে বসে আছেন ডাক্তার মুখার্জি, কমল ভৌমিক, গাড়ি চালাচ্ছে মনোহর, রুকু-সুকু যাকে 'বিশুদা' বলে ডাকে।

কমল ভৌমিক জানলা দিয়ে মুখ বের করে হরেনদাকে বললেন, "বেরিয়েছেন তো অনেকক্ষণ, কই, খুব বেশি দূর তো এগোতে পারেননি। অবশ্য ইশপস্ ফেবলসে পড়েছি, স্লো বাট স্টেডি উইনস দি রেস।"

হরেনদা ওইভাবেই বসে বসে বললেন, "মশাই, এতক্ষণে বহু দূর, বহু বহু দূরেই চলে যাবার কথা, কেবল ভাগ্যের দোষে পড়ে আছি পথের পাশে।"

ডাক্তার মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন,"কী হল আপনার! অসুস্থ?"

"অসুস্থ! আমার তো এতক্ষণে মরে যাবার কথা!"

ডাক্তারবাবু আর কমল ভৌমিক নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ঘটনার সবটাই শুনলেন বেশ মন দিয়ে। শুনতে শুনতে কমল ভৌমিক হাত মুঠো করছেন আর খুলছেন। বেশ বোঝাই যায়, ভীষণ রেগে গেছেন। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "জিপের নম্বরটা দেখেছিলেন?"

"নম্বর কী করে দেখব! আমি তো গড়াতে গড়াতে নীচে একেবারে ওই ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলুম।"

কমলবাবু রেগে উঠলেন, "পড়ে গেলুম! কাওয়ার্ড। গাড়ির নম্বরটা পড়তে পড়তেও দেখা যায়! অত ভয়ের কী আছে মশাই। আপনি তো আর জলে পড়ছেন না। পড়ছেন ডাঙায়।"

"আমার চশমাটা যে ছিটকে পড়ে গেল।"

"এই এক হয়েছে সব। চল্লিশ না পেরোতেই চোখে চালসে। ঘোড়ার ডিম। ভিটামিন খেতে কী হয়! গোরুর চোখে চশমা দরকার হয়! গাধা চশমা পরে!"

সন্ন্যাসী একটু ফোড়ন দিলেন, "রোজ এক সের করে দুধ খেলে তবিয়ত জীবনভর ঠিক থাকে। না আঁখ, না দাঁত...।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "এ-শহরে গোটা ছয়েক জিপ আছে। থানায় ডায়েরি করলে ওরা ঠিক বের করে ফেলবে। আর এই তো ধুলোয় টায়ারের দাগ। এই ধুলো টায়ারে লেগেছে।"

কমলবাবু বললেন, "ধুলো দিয়ে কি আর ধরা যাবে! ধুলো দিয়েই তো পালায়।"

হরেনদা বললেন, "আহা, এ ধুলো সে ধুলো নয়।"

"চুপ করুন। কাওয়ার্ড। পড়ে না গিয়ে গোটা কতক পাথরও তো মারতে পারতেন ছুড়ে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আর-একটা মোক্ষম জিনিস টায়ারে লেগেছে। এই দেখুন, একটা শামুক থেঁতলে আছে। এ জিনিস টায়ারের খাঁজে খাঁজে লেগে থাকবেই থাকবে। চলুন, চলুন, আর দেরি না করে আমরা থানায় যাই।"

কমল ভৌমিক বললেন, "থানায় গেলে সবই তো চলে গেল আইনের হাতে। অ্যাকশান নিতে অনর্থক দেরি হয়ে যাবে। আসুন, আমাদের ব্যাপার আমরাই ফয়সালা করে ফেলি। ছ'টা জিপ মানে ছ'জন ওনার। সেই ছ'জনের যার চাকার তলায় শামুকের খোলা, তাকে ধরে ক্রস কাট।"

"ক্রস কাট মানে?"

"আন্ডার কাট হল নীচে থেকে ওপরে ঘুসি। দাড়ি উলটে নাক ভোঁতা। আর ক্রস কাট হল আড়াআড়ি। একবার এপাশ থেকে ওপাশে, আর-একবার ওপাশ থেকে এপাশে। অনেকটা কাটাকাটি খেলার মতো। মুখের জিয়োগ্রাফি বদলে যাবে।"

"মিস্টার ভৌমিক, আইন নিজেদের হাতে না নেওয়াই ভাল। যাদের জিপ আছে তারা সবাই বেশ পয়সাওলা। ওপর মহলে খুব খাতির। ঝামেলায় পড়ে যেতে হবে। তা ছাড়া আমার একটা মানসম্মান আছে।"

"আপনি এর মধ্যে আসছেন কোথা থেকে। আমিই তো সব করব। মিনিট-পাঁচেকের ব্যাপার। যাব। নাম ধরে ডাকব, 'আরে এ ভাই রামবাবু।' বেরিয়ে আসবে। হাত তুলে বলব, 'রাম রাম জি।' তারপর দু'বার ঢিসুম, ঢিসুম। ফ্ল্যাট। আবার রাম নাম। এবার বলব, 'এ রাম রাম,' ব্যস, বেরিয়ে চলে আসব ধীরে ধীরে। সামান্য ব্যাপার মশাই। এর জন্যে থানা-পুলিশ, ডায়েরি। মশা মারতে কামান দাগার কোনও মানে হয়!"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমার মনে হচ্ছে জিপটা রামবাবুরই।"

"অ্যাঁ, বলেন কী সাধুবাবা! আমার এত ক্ষমতা, তা তো জানতুম না।"

ডাক্তার বললেন, "রামবাবু? কোন রাম?"

"জি রাম সিং তিওয়ারি।"

"কী করে বুঝলেন!"

"একটা জিপই এ-রাস্তায় গেছে, আমি দেখেছি। আমাকে পেরিয়ে চলে এল। তারপর আমি এসে বাবুকে ওই জঙ্গল থেকে টেনে তুললাম।"

কমলবাবু বললেন, "ব্যস, তব তো হো গিয়া জি।" কমল ভৌমিক থিয়েটারের বীরের মতো বললেন, "রাম সিং, তোমাকে এইবার আমি রাবণ সিং করে ছেড়ে দেব। শয়তান, হরেনদাকে চাপা দিয়ে মারার তাল!"

হঠাৎ থেমে গেলেন। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রামবাবু, হরেনবাবুকে চাপা দেবেন কেন? কী স্বার্থ!"

"তা তো জানি না ভাই।"

"তা হলে হরেনবাবুকে জেরা করতে হয়। কে রামবাবু, কেন হরেনবাবু! হরেনবাবু বলতে না চাইলে পেটে কোঁতকা মেরে কথা আদায় করতে হবে। রামবাবু যদি ভাল লোক হন হরেনবাবু ভাল। রামবাবু যদি খারাপ হন, হরেনবাবুও খারাপ। তখন আমি অন্য লোক। আমার অন্য দাওয়াই। হরেনবাবুকে দু'হাতে তুলে ছুড়ে ফেলে দেব ওই খাদে।"

হরেনদা এতক্ষণ থেবড়ে বসে ছিলেন, এইবার উবু হয়ে বসে বললেন, "বাঃ, এ যে দেখি কাজির বিচার। রাম সিং এক ভয়ংকর লোক, এই শহরের সবাই জানে। তা বলে আমাকে কোঁতকা মারা হবে, আমাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে খাদে! বাঃ ভাই, বাঃ। বেড়ে মজা তো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বড় ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। আমার আর ভাল লাগছে না। অনেকটা সময় আপনাদের দিয়েছি, এবার আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আপনারা এখানে বসে ফয়সালা করুন, আমি চললুম।"

কমল ভৌমিক যেন জলে পড়ে গেলেন, "আমি তা হলে কী করব?"

"এই যে বললেন, কার যেন ঘাড় মটকাবেন?"

"আপনি তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।"

"হচ্ছিই তো, ওসব কি আমাদের কাজ?"

"তা হলে থানাতেই চলুন।"

"সব গাড়িতে উঠুন।"

হরেনদা বেঁকে বসলেন, "না মশাই, থানা-পুলিশের মধ্যে আমি যেতে চাই না। জানে বেঁচে গেছি এই যথেষ্ট। রাম সিং ডেঞ্জারাস লোক। কোমরে রিভলভার বেঁধে ঘোরে।"

"রিভলভার বেঁধে ঘোরে," কমল ভৌমিক হরেনদার গলা নকল করে ভেংচি কাটলেন, "আমিও কোমরে রিভলভার বেঁধে ঘুরি। দেখবেন? এই দেখুন।"

কমল ভৌমিক জামা তুলে রিভলভার দেখালেন।

হরেনদা বললেন, "আপনি তা হলে খারাপ লোক।"

"বাঃ, অদ্ভুত যুক্তি!"

"কেন! রাম সিং খারাপ লোক, রিভলভার বেঁধে ঘোরে। আপনি রিভলভার বেঁধে ঘোরেন, আপনি খারাপ লোক। সোজা অঙ্ক।"

"আমি মশাই খারাপ লোকের যম। যমরাজ ফর খারাপ লোক, বদমাশ লোক।"

ডাক্তার মুখার্জি ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসতে বসতে বললেন, "আচ্ছা, আমি তা হলে চলি। আপনারা অঙ্ক কষুন, ভাল লোক খারাপ লোকের হিসেব-নিকেশ করুন।"

সাধু ভগবানদাস বললেন, "আমিও চলি। আমাকে পাহাড়ে যেতে হবে।"

হরেনদা করুণ গলায় বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমার চিকিৎসার কী হবে! আমার যে খুব লেগেছে। আমি যে আর হাঁটতে পারছি না, ডাক্তারবাবু।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে," ডাক্তার আবার নেমে এলেন, "কথায় কথায় সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। ওইজন্যে বেশি কথা বলতে নেই। চলুন, আমার গাড়িতে হাসপাতাল চলুন।"

কমল ভৌমিক বললেন, "চ্যাংদোলা করে গাড়ির পেছনের সিটে ধপাস করে ফেলে দেব?"

ডাক্তার হাসিহাসি মুখে বললেন, "আপনার সব কিছুই কী দানবীয়! ছুড়ে ফেলছেন, ঘাড় মটকে দিচ্ছেন, ক্রস-কাট মারছেন।"

কমল ভৌমিক হেসে বললেন, "অনেক দিন যে কিছু করতে পারছি না। হাত একেবারে নিশপিশ করছে।"

হরেনদাকে গাড়িতে তোলা হল। জামা ছিঁড়েছে। কেটেকুটে গেছে। মুখের একটা পাশ একটু থেঁতলে গেছে। শরীর থেকে জংলা গাছের গন্ধ বেরোচ্ছে।

সাঁসাঁ করে গাড়ি ছুটল হাসপাতালের দিকে। পাতলা গরম জলের মতো রোদ বেড়ে উঠছে কুলকুল করে চারপাশে। ভগবানদাস আবার হাঁটতে শুরু করেছেন টুকটুক করে। গান ধরেছেন আপন মনে, রাম নাম সুখদায়ী। সে-যুগের রামজি, আর এ-যুগের রাম সিং। হায় রাম, ক্যায়সা বনা দিয়া এ দুনিয়া! হায় রাম।

গাঁক গাঁক করে একটা কী আসছে পেছন থেকে। ভগবানদাস রাস্তার ধারে সরে গেলেন। হু হু করে একটা জিপ ছুটে গেল সামনে। "আরেব্বাপ, আজ দেখি রামজির কৃপায় খুব জিপ ছুটছে।" ভগবানদাস থেমে পড়লেন, "কেয়া তাজ্জব। এই তো সেই রাম সিং-এর জিপ। এটা আবার কোথা থেকে ঘুরে এল। হায় রাম।" জিপের পেছন পেছন ধুলো দৌড়োচ্ছে।

দূরে ওই যে পাহাড়, ওই পাহাড়ের তলায় মহাবীরের মন্দির। সেই মন্দিরে আজ খুব ধুমধামের পুজো। আজ সেই দিন, যেদিন মহাবীরের ল্যাজে রাবণরাজা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আর মহাবীর সেই জ্বলন্ত ল্যাজ নিয়ে একবার এ-বাড়ির ছাদ, একবার ও-বাড়ির ছাদ, যাকে বলে লঙ্কাকাণ্ড, সব জ্বলে পুড়ে খাক।

ভগবানদাস মহানন্দে চলেছেন ভজন গাইতে গাইতে। "আরে বাবা এটা কী? পথের মাঝখানে পড়ে আছে। হায় রাম। ডোরাকাটা। এ কোন চিজ?"

একটা জামা। ডোরাকাটা একটা জামা। একেবারে নতুন। কোথা থেকে এল কে জানে। ভগবানদাস জামাটা তুলে নিলেন। মাপ দেখে মনে হচ্ছে ছোট ছেলের। জামাটা দেখে ভগবানদাসের হাসি পাচ্ছে। কোথাকার ছিট রে বাবা। এই মোটা মোটা ডোরাকাটা। একবার ভাবলেন, 'ফেলে দি। সন্ন্যাসী মানুষ, কোনও কিছু নিতে নেই। কুড়োতে নেই।' তারপর ভাবলেন, 'রেখে দি ঝোলায়। খুঁজে বের করা যেতে পারে, কার জামা। কিংবা কোনও অভাবী ছেলেকে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।' হাঁটা শুরু করলেন ভগবানদাস। দেরি হয়ে গেছে। ওই যে পাহাড়। মনে হচ্ছে কাছে, এখনও বহু দূর।

॥ ৮ ॥

জিপটা ঢালু রাস্তা ধরে হুড়হুড় করে গড়িয়ে নামছে। সামনেই একটা মজা পাহাড়ি নদী। জল আসবে বর্ষায়। এখন শুধু বড়-ছোট নানা মাপের নুড়ি পাথরের বিছানা। জিপ হড়াস করে নেমে এল। চাকায় আর পাথরে ঘষাঘষির ঘ্যাঁসঘ্যাঁস শব্দ। জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। অন্ধকার, ছায়া ছায়া। ঝিনঝিন ঝিঁঝি ডাকছে। প্রথমে নিতুর ভয় করছিল। ভীষণ ভয়। দুটো মুশকো লোক দু'পাশে বসে আছে। চ্যাকোর চ্যাকোর করে চিউয়িংগাম চিবোচ্ছে। গরমকাল নয়, তবু ঘামছে। নিতুকে ফেলে রেখেছে পায়ের কাছে চিত করে। নড়াচড়া করলেই গোদা গোদা পায়ের খোঁচা মারছে। এখন আর ভয় করছে না। ভীষণ মজা লাগছে। ছোটদের উপন্যাসে এইসব পড়েছে। কিন্তু এইভাবে পড়ে পড়ে গোদা পায়ের লাথি খেলে তো চলবে না। যেভাবেই হোক পালাতে হবে। কতবার সে পালিয়েছে, এবার পারবে না পালাতে! নিশ্চয় পারবে। পারতে হবে। এখন না পারুক, পরে পারবে।

রামায়ণের গল্পে পড়েছে, সীতাকে রাবণ যখন পুষ্পকরথে তুলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সীতাদেবী একে একে গা থেকে সব খুলে খুলে ফেলে দিচ্ছেন। নিশানা। নিতুরও সেই ইচ্ছে। সীতাদেবীর গায়ে অনেক গয়না, ফুলের মালাটালা সব ছিল। তার গায়ে ডোরাকাটা একটা জামা ছাড়া আর কী আছে? একটা হাফপ্যান্ট। দু'পাটি চটি থাকা উচিত ছিল। চটি দু'পাটি তো বাড়িতে পড়ে আছে। পরার সময় পেল কই!

লোকগুলো কী পাজি! কেমন 'হরেনদা, হরেনদা' বলে ডাকল, আর

যেই নিতু 'কে' বলে বেরিয়ে এল, অমনি খপ করে তার মুখ চেপে ধরে, চ্যাংদোলা করে তুলে জিপের পেছনে। ব্যস, জিপ ছুটল পাঁইপাঁই করে। ঠেসে একটা লাথি হাঁকিয়েছিল। লেগেছিল একজনের মুখে। পারা যায় নাকি মুশকো মুশকো এতগুলো লোকের সঙ্গে। চড়চাপড় খুব মারল। শেষে বলল, "চুপ করে পড়ে থাক। টুঁ শব্দ করলেই খ্যাঁচ।" এদের কোমরে সব ভোজালি আছে। এরা কারা বটে!

নিতু বললে, "আমায় ধরলে কেন?"

গ্যাঁট্টামতো লোকটা বললে, "কাবাব করে খাব বলে।"

নিতু বললে, "তোমরা বুঝি মানুষও খাও?"

লোকটা ক্যাঁত করে একটা লাথি মেরে বললে, "অ্যায় চুপ। একদম চুপ।"

নিতু বললে, "আমার জামায় পা দেবে না। টেংরি খুলে নোব।"

"তাই নাকি রে মিচকে। এই তো তোর বাহারের জামা! জামার নিকুচি করেছে।" একটানে জামাটা ছিঁড়ে নিয়ে, ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

নিতু তো এইটাই চেয়েছিল। তার এই ডোরাকাটা জামাটা সবাই চেনে। সাংঘাতিক জামা। বাবা বলেছিলেন, 'নিতু, জামাটা তোকে দিয়ে গেলুম। আর কিছু না, শুধু একটা জামা। আমি বলব না, কী হবে, তুই নিজেই বুঝতে পারবি।' যাক আর ভয় নেই, জামাটাই তাকে বাঁচাবে। কেউ-না-কেউ কুড়িয়ে পাবেই।

নিতু খুব নবাবি চালে বললে, "অ্যায় বেঁটে, বালিশ আছে? ন্যাড়া মাথায় আমার শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না!"

লোকটা তার সঙ্গীকে বললে, "চ্যাংড়াটার খুব সাহস তো! প্রথমে ভেবেছিলুম, হাবাগোবা, মোটেই তা নয়। অ্যায় চুপ, মারব এক থাবড়া।"

জিপ এবার খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠছে। ইঞ্জিন ষাঁড়ের মতো গাঁগাঁ করছে। নিতুর কেবলই মনে হচ্ছে শেষ অবধি তারা যেতে পারবে না। তার আগেই একটা কিছু হয়ে যাবে। নিতুর মন যা বলে তাই হয়। কতবার হয়েছে। আজও হবে।

লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বেঁটে দৈত্যটা লম্বাকে বলছে, "এই ছোঁড়াটাকে আমাদের কী হবে?"

লম্বা বললে, "ওস্তাদ, প্রশ্ন কোরো না। 'গীতা' বলে একটা বই আছে, সেই বইয়ে লেখা আছে, কাজ করো, প্রশ্ন কোরো না। গাছ পোঁতো, ফল আশা কোরো না।"

"ফেলে দাও অমন বই। গাছ হবে ফল হবে না; মামার বাড়ি! মানুষ জঙ্গলের চাষ করবে? কে লিখেছে ওস্তাদ! আমাদের বস নাকি?"

"না দোস্ত, লিখেছে, ওস্তাদ কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ।"

"ভাগ, সে আবার বই লিখবে কী! সে তো সারা জীবন আড়বাঁশি ফুঁকে গেল।"

"যা জানিস না, তা নিয়ে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করিসনি মাথামোটা।"

নিতু বললে, "বোকা গাধা।"

লম্বু বললে, "ঠিক বলেছ ছোকরা। গাধারও বুদ্ধি আছে। এ একেবারে বোকা পাঁঠা।"

নিতু বললে, "লেখাপড়া করেনি, ছেলেবেলায় কেবল ড্যাংগুলি খেলেছে।"

বেঁটে ক্যাঁত করে নিতুকে একটা লাথি মারতেই লম্বু বললে, "অ্যায়, ওটা তোর ফুটবল নয়।"

বেঁটে বললে, "তুমি ডেরায় চলো, তোমার নামে আমি কমপ্লেন করব।"

"যা যা, সব করবি মাথামোটা।"

"তোমার চাকরি আজই নট হয়ে যাবে।"

"আররে যাঃ, নেপিয়ার এখন জেলে। ঘানি ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসতে এখনও দশটি বছর, বুঝলে চাঁদু। এখন আমার জমানা।"

"তোমার জমানা! জমানা আমার। আমার হাতের গুলি দেখেছ! চেস্ট দেখেছ আমার! ছাপ্পান্ন। একটা ঘুসি মারলে মুখটুখ সব ছেতরে যাবে।"

"আমার হাইট দেখেছিস গাধা! তোর ডবল। আমি দাঁড়ালে কত দূর দেখতে পাব জানিস! কোনও ধারণা আছে! তুই দাঁড়ালে দশ গজ দূরে দেখবি, আমি দেখব সতেরো শো ষাট গজ।"

নিতু বললে, "তার মানে এক মাইল!"

লম্বু বললে, "বা রে, ছেলেটা ম্যাথামেটিক্স জানে। এ ছেলে বড় হলে অনেক বড় গুন্ডা হবে। শুধু গুলিতে কী হয়! গন্ডারের কী বিরাট গুলি, কিন্তু বুদ্ধি নেই। তোর মতো বোকা পাঁঠা।"

বেঁটে বললে, "বহুত ভ্যাচোর ভ্যাচোর করছিস, এইবার দু'হাতে তুলব আর ছুড়ে ফেলে দেব। একেবারে ঘিনচিকিড়ি হয়ে যাবি। নিজেকে আর চিনতে পারবি না। খোল একদিকে, নলচে আর-একদিকে।"

"আরে যাঃ! তুই তো ব্যাটা বসের পা টিপতিস। আমি টিপতুম মাথা। তোর চেয়ে আমার ইজ্জত অনেক বেশি।"

নিতু বললে, "ঘিনচিকিড়ি কী জিনিস?"

বেঁটে বললে, "অ্যায় চোপ। একদম চুপ।" নিতুকে আবার এক লাথি।

নিতু বললে, "কাকু, আবার আমাকে লাথি মারছে।"

বেঁটে বললে, "বেশ করেছি। আবার মারব। ক্যাঁত ক্যাঁত করে মারব।"

লম্বা বললে, "তোকে আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি বেঁটে। ছেলেটা আমাকে কাকু বলেছে।"

"ওসব কাকু, মামা, বাড়িতে। নেপিয়ারের ডেরায় ওসব ফাজলামো চলবে না।"

"কার হুকুম?"

"মেরা।"

"তোম কোন হো?"

"আমি এখন বস।"

"বস?"

"জরুর বস।"

"ফস করে বলতে পারলি!"

"পারলুম।"

"তুই গাড়ি চালাতে পারিস?"

"না।"

"আমি পারি। তুই গুলি চালাতে পারিস?"

"না।"

আমি পারি। তুই এই চলন্ত গাড়ির ছাদে উঠতে পারিস?"

"তুই পারিস?"

"আলবাত পারি।"

"দেখা।"

লম্বু উঠে পড়ল সিট ছেড়ে। তারপর অদ্ভুত কায়দায় উঠে পড়ল জিপের তেরপল-ঘেরা চালে। চালটা ঝুলে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে লম্বু নেমে এল। পেছনের ফাঁক দিয়ে চলে এল নিজের সিটে। বসেই বললে, "দশ বছর বম্বে মেলের কামরায় কামরায় চা বিক্রি করেছি রে বেঁটে। তোর মতো মাটি কোপাইনি রে!"

"এটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

"করে দেখা।"

"আমি ওই চালে উঠলে ছিঁড়ে পড়ে যাব, পাক্কা আড়াই মন ওজন। তোর মতো রোগাপটকা!"

লম্বু হাহা করে হেসে উঠল। "জানতুম বেঁটে, তুই পারবি না। সার্কাসে তেরপলের ওপর হাতি নাচে রে, হাতি। ছিঁড়ে পড়ে যায় না। তুই কি হাতির চেয়ে মোটা?"

জিপ আবার হুহু করে নীচের দিকে নামছে। পথ ক্রমশ ঢালু হচ্ছে। নিতু শুয়ে

থাকার ফলে কেবল আকাশ দেখতে পাচ্ছে। আর দেখছে গাছের ডালপালা। কত রকমের পাতা! ঝুস করে শব্দ হচ্ছে, আর এক-একটা বড় বড় গাছ ছিটকে পেছনে সরে যাচ্ছে।

নিতু বললে, "আমি উঠে বসব। আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

বেঁটে সঙ্গে সঙ্গে বললে, "না মানিক। তুমি যেমন শুয়ে আছ তেমনি শুয়ে থাকো। বেশি ট্যাঁফোঁ করলে মাথায় গুড়গাঁট্টা মেরে অজ্ঞান করে দেব।"

লম্বু বললে, "করে দিয়ে দেখ। ছোঁড়াটা আমায় কাকাবাবু বলেছে।"

"খুড়ো-ভাইপো দু'জনেরই একদশা হবে। মারব ভাট্টা, চিত্তির হয়ে পড়ে থাকবি চার দিন। ফিঙে কোথাকার!"

জিপ তখন খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠছে। দৈত্যের গর্জনে বনস্থলীর ঘুম চটকে যাচ্ছে। জিপের পিছন দিকটা হেলে আছে। নিতুর মনে হচ্ছে, পিছলে পিছন দিকে সরে যাবে। ন্যাড়া-মাথা প্রায় জিপের ধারের লোহার পাতে ঠেকো ঠেকো। হঠাৎ লম্বু কাঁধ দিয়ে পাশে বসে থাকা বেঁটেকে মারল এক কায়দার ধাক্কা। এত আচমকা যে, বেঁটে কিছু বোঝার আগেই ভারী বস্তার মতো জিপ থেকে উলটে পড়ে গেল পাথুরে পথে।

নিতু তাড়াতাড়ি উঠে বসল। পথ ঢালু। বেঁটে ওলটপালট খেতে খেতে, গড়াতে গড়াতে সরে যাচ্ছে পিছন দিকে। প্রথমে পড়ার সময় খুব জোর চিৎকার করেছিল। খামচে ধরার চেষ্টা করেছিল জিপের পাশে ঝুলে থাকা পতপতে তেরপল। মনে হয় ধরেও ছিল। তবে যা মোটা আর যা ওজন! ধরে রাখতে পারল না। বেঁটে ওলটপালট খেতে খেতে সেই কোথায় চলে গেছে। পেছনে পড়ে আছে সাদা পাথুরে পথ। নিতুরা ক্রমশ ওপরে উঠছে বলে পিছনের পথের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

লম্বু হাসছে হা হা করে। হাসছে আর বলছে, 'এই অপেক্ষাতেই ছিলুম। গুজরাটি হাতি! অনেকক্ষণ ধরে কপচাচ্ছিল। নেপিয়ারের তোতাপাখি।'

জিপের ড্রাইভার সামনে থেকে চিৎকার করে বললে, "কী, গাড়ি থামাতে হবে?"

লম্বু বললে, "না ওস্তাদ। পুরো দমে ভৈরবঘাট পর্যন্ত চালিয়ে যাও, তারপর দেখা যাবে।"

নিতু ভয়ে ভয়ে বললে, "ও তো এক্ষুনি উঠে চলে আসবে। এসে আমাদের ছাতপেটাই করে দেবে।"

"আরে দোস্ত, সে ভয় নেই। ওর মুখেই যত বোলচাল। কোমরে বাত আছে। ওই যে পড়ল না এখন মাসখানেক ছুটি। ধরে তুলে না দিলে পড়েই থাকবে।"

"কে তুলবে?"

"কেউ তুলবে না। এ-রাস্তায় ক'টা লোক আসে! নাও নাও, উঠে বোসো দোস্ত।"

নিতু বললে, "আমি তো তোমার ভাইপো গো। তুমি আমার কাকা।"

"আরে বাবা, ভাইপো কি দোস্ত হতে পারে না! সবাই কি আমার মতো ভাইপো হবে নাকি? আমি কী করেছি জানো না, আমার খুড়োকে বিক্রি করে দিয়েছি।"

"ওমা সে কী গো। খুড়ো বিক্রি করা যায়! খুড়ো কি টেবিল, না চেয়ার!"

লম্বু হাসছিল, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, "না বাবা তোমাকে বলব না, তুমি আবার কোনওদিন আমাকেই বেচে দেবে!"

নিতু বললে, "ধ্যাস, তা কখনও হয়! আমি কি তুমি নাকি! আমি তো আমি।"

লম্বু বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে বললে, "তার মানে! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আবার ম্যাথেমেটিক্সে ভীষণ কাঁচা। জীবনে সাতবার পরীক্ষা দিয়েছি, সাতবারই গোল্লা পেয়েছি।"

"তুমি কদ্দূর পড়েছ?"

"ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। আমি ইংরেজি কাগজ বেশ বানান করে করে একটু একটু পড়তে পারি। তবে কী বাংলা, কী ইংরেজি, আমাকে এডিটোরিয়াল পড়তে বোলো না। প্লিজ। অসম্ভব ব্যাপার। তার চেয়ে তুমি আমাকে ধরে দশ ঘা বেত মারো। তুমি কদ্দূর পড়েছ দোস্ত?"

"ক্লাস নাইন।"

"কীরকম ছাত্র ছিলে?"

"ফার্স্ট-সেকেন্ডই হতুম।"

"তা হলে, সব ছেড়েছুড়ে এই গুন্ডার দলে এলে কেন?"

"আমি কেন আসব, আমাকে তো ধরে নিয়ে এলে তোমরা!"

"কেন বলো তো! কেন তোমাকে ধরল।" লম্বু ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। জিপ আবার ঢালু বেয়ে নামছে।

॥ ৯ ॥

লম্বু হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

নিতু বললে, "তুমি হাসছ কেন কাকু?"

"হাঃ হাঃ, আজ তোমার বেঁটে বক্কেশ্বরের কী হয় দেখো না! জোর খ্যাঁট

হবে।” নিতুর খুব খিদে পেয়েছে। খ্যাঁটের কথা শুনে জিভে জল এসে গেল। জিজ্ঞেস করলে, “কে খাওয়াবে কাকু?”

“আরে খাওয়াবে কী দোস্ত! খাবে, চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।”

“কী খাবে কাকু?”

“মাংস। বেঁটের চর্বিঅলা থলথলে মাংস।”

“বেঁটের মাংস বেঁটে খাবে?”

“দোর গাধা! বেঁটের মাংস বাঘে খাবে। পুরো তিনটে দিন লাগবে খেয়ে শেষ করতে। কম মাংস! পাক্কা দু’মন।”

“বাঘ আছে?”

“ওমা বাঘ নেই! ক’টা বাঘ চাই তোমার! বুঝলে দোস্ত, ও ব্যাটা আমার পয়লা নম্বর শত্রু। ও না থাকলে আজ আমি কোথায় উঠে যেতুম! আমার একটা রাজত্ব হয়ে যেত, বুঝলে! বিশাল বাড়ি। বুঝলে, থামঅলা বাড়ি। ইয়া বড় গেট। দুটো মোটরগাড়ি। এইবার হবে। সব হবে। নেপিয়ার জেলে। বেঁটে বাঘের পেটে। আমি এখন রাজা। যাত্রার দলের রাজা নই। আসল রাজা। সব আমার দখলে।”

নিতু বললে, “আমরা এখন কোথায় যাব?”

“তুমি যেখানে যেতে চাইবে।”

“সত্যি!”

“না না, দাঁড়াও, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তুমি কে?”

“আমার নাম নিতু।”

“নিতু। বেশ, তোমার নাম না-হয় নিতুই হল। তুমি এই গাড়িতে উঠলে কেন?”

“আমি কেন উঠব! বেঁটেদা আমাকে ধরে, টেনেহিঁচড়ে তুলে নিল, আর বললে, চেঁচালেই খতম।”

“খতম? মামার বাড়ি আর কী! চেঁচালেই খতম! শোনো, তুমি ‘বেঁটেদা’ বলবে না। শুধু বেঁটে বলবে। লোকটা একেবারে থার্ডক্লাস। তুমি অত ভিতু কেন! কথায় কথায় লোককে দাদা বলে বসো। আরে বেঁটেটা একটা গুন্ডা। দাদা বলবে আমাকে। কাকু কাকু কোরো না। শুনতে বিচ্ছিরি লাগে। কাকু, দাদু, এ আবার কী! দাদা বলবে। পরে অবশ্য তোমাকে রাজা বলতে হবে।”

“আমরা এখন কোথায় যাব দাদা!”

“বেঁটে কোথায় যাবে বলেছিল?”

“আমাকে তো কিছুই বলেনি। ও আবার কথা বলতে শিখেছে নাকি! ডাকলে। যেই কাছে এলুম, হিড়হিড় করে টানতে টানতে জিপের...”

"ওই এক কথা তুমি কতবার বলবে?"

"বা রে, ওই কথাটাই যে আমার বারেবারে মনে পড়ছে। আমার অপমান হয়নি। ভীষণ অপমান।"

"হ্যাঃ, এইটুকু ছেলের আবার অপমান!"

"দাদা, তুমি তা হলে আমাকে আবার বাড়িতেই রেখে এসো।"

"যাঃ, সেটা একটা কথা হল! তোমাকে ধরা হয়েছে, নিশ্চয় একটা কারণ আছে। আমাকে খাতাপত্তর দেখতে হবে। কী থেকে কী করতে চেয়েছিল জানতে হবে। কাঁচা কাজ করলে চলে? বলা যায় না, তোমার দাম হয়তো এক লাখ টাকা।"

নিতু খিলখিল করে হাসল।

"হাসছ কেন? জানো, হাসা মানে আমাকে অপমান করা। তোমার বাবাকে চিঠি লিখে বলা হবে, নগদ এক লাখ টাকা নিয়ে চিড়িয়াখানার এক নম্বর গেটে, রাত বারোটায়..."

"আমার বাবাও নেই, মা-ও নেই।"

"যাঃ, তা কখনও হয়। গুল মারছ। তুমি খুব বিচ্ছু ছেলে। এইটুকু ছেলের বাবা-মা নেই কেউ বিশ্বাস করবে?"

"সত্যি বলছি।"

"তা হলে তোমার কে আছে?"

"মামা। হাড় কেপ্পন। এক লাখ কেন, এক পয়সাও দেবে না। আমাকে মেরে ফেলো, কেটে ফেলো, মামার কাঁচকলা।"

"সে কী রে বাবা! এমন মামাও হয়! কী নাম তোমার মামার!"

"হরেন্দ্রকুমার ঘোষ।"

"আমাদের হরেনদা! আরে ভাই, সে তো টাকার কুমির। কাম অন বেট, আমি এক লাখ টাকা আদায় করব। ফিফটি ফিফটি। তোমার হাফ, আমার হাফ।"

"আমার মাথা দেখেছ?"

"যাঃ, তোমার মাথায় কী হবে? মাথা আমার।"

"দূর বাবা, ও মাথার কথা কে বলছে! আমার ন্যাড়া মাথাটা দেখেছ?"

"ও হ্যাঁ, তাই তো! ন্যাড়া কেন?"

"ওই যে, পলাশের দলবল, মামার দোকানের জারটার ভেঙে লজেন্স খেয়েছিল, সেই সময় আমি দোকানে ছিলুম। শাস্তি হল আমার। ন্যাড়া। তুমি জানো আমার কী সুন্দর চুল ছিল!"

"যাক গে। যাক গে, দুঃখু কোরো না। মাথা যখন আছে, চুল আবার হবে।

ভাবো তো, মাথাটা কেটে নামিয়ে দিলে, কী সর্বনাশটাই না হত। তুমি মরে যেতে। তা হলে তোমার মামার ওপর রাগ আছে, তাই তো!"

"ভীষণ রাগ।"

"ব্যস, হয়ে গেল! ফিফটি আমার ফিফটি তোমার। এক লাখ নয়, পঞ্চাশ হাজার চাইব, না, পঞ্চাশ একটু বেশি হয়ে গেল, তাই না?"

"অনেক বেশি।"

"তা হলে কত?"

"দশ।"

"যাঃ, দশ খুব কম। লজ্জা করে না তোমার, নিজের দাম কমাচ্ছ! বিশ। বিশের এক পয়সা কম নয়।"

জিপ কিন্তু হড়বড় হড়বড় করে চলছে তো চলেইছে। যে চালাচ্ছে, তার যেন গাড়ি চালানো ছাড়া আর অন্য কোনও ব্যাপারই নেই। কথাও বলছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না।

নিতু বললে, "লম্বুদা...।"

"আরে ছিছি, তুমিও আমাকে লম্বুদা বলছ? শুধু দাদা বলো। ছেলেবেলায় পড়োনি, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই।"

"আমি তো এখনও ছেলেমানুষ। ছেলেবেলা তো আমার এখনও কাটেনি।"

"শোনো, পরে ভুলে যেতে পারি, তোমাকে এখনই বলে রাখি, বড় হয়ে গোঁফ রাখবে। গোঁফ ছাড়া কী কী হয় না, বলো দেখি!"

"বেড়াল হয় না।"

"আ, ঠিক বলেছ। বেড়াল, বাঘ, এমনকী ছুঁচোরও গোঁফ আছে। এই দেখো, আমারও গোঁফ আছে। গোঁফে বিদ্যুৎ আছে জানো! সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষে দেখো, কীরকম খাড়া খাড়া হয়ে যাবে। আর কী জানো, যদি কোনওদিন বাজ পড়ে তোমার কিচ্ছু হবে না। গোঁফ দিয়ে পাস করে যাবে! আর কী বলো তো!"

"আপনি বলুন, আমার তো আগে কখনও গোঁফ হয়নি।"

"তুমি ধরো, এখন সরঅলা দুধ খেলে এক গেলাস। ভাবলে, যাঃ শেষ হয়ে গেল। ওমা, কিছুক্ষণ পরে দেখলে একটু সর নেমে এল ঠোঁটে। গোঁফ ধরে রাখে, সঞ্চয় করে রাখে। অত কথায় দরকার কী, তোমাকে গোঁফ রাখতে বলেছি, গোঁফ রাখবে। এইবার আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চড়চাপড় মেরে দোব। আমি তোমার বেঁটে নই! অবাধ্যতা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।"

নিতু আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

লম্বু খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল, "আবার হাসা হচ্ছে। কেউ রেগে গেলে হাসতে আছে! সে-ও তো তা হলে হেসে ফেলবে! তা হলে তার রাগটা থাকে কী করে! তুমি গোরু না গাধা!"

"আমি যখন লেখাপড়া করতুম, তখন আমার মাস্টারমশাইরা বলতেন, তুই একটা গাধা।"

"মাস্টারমশাইরা গাধা বললেই তুমি গাধা হয়ে গেলে। কী যে পাগলের মতো বলো তুমি! আমি মাস্টারমশাইদের লাশ ফেলে দোব।"

"তুমি তাদের পাবে কোথায়। সেই স্কুল তো দেরাদুনে।"

"শোনো, যা বলবে একরকম বলো। একবার তুমি, একবার আপনি। তুমি ভেবেছটা কী! দেশে আইনকানুন নেই! মগের মুল্লুক!"

"যখন কাকা বলছিলুম, তখন তুমি বলছিলুম। যেই দাদা বলতে শুরু করলুম, অমনি আপনি এসে গেল।"

"গাধা কোথাকার! কথার ছিরি দেখো।"

"এই তো বললে, তুমি গাধা নও।"

"গাধা না হলেও গোরু। গোরু না হলে, বেঁটে ডাকল, তুমি অমনি নেচে নেচে চলে এলে, আর তোমাকে খপ করে ধরে জিপে পুরে দিলে। আমাকে পারত!"

"তুমি তো বড়।"

"আহা, এখন আমি বড়, একসময় তো আমি ছোটই ছিলুম।"

"তখন বেঁটেও ছোট ছিল।"

"বেঁটে ছোট ছিল!"

লম্বু ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ মুখে আলো ফুটল। বললে, "এই বেঁটে ছোট থাকলেও বড় বেঁটেও তো ছিল। ধরো, এই বাঘটা ছোট, তার মানে জঙ্গলে বড় বাঘ আর নেই। দেখো, আমার সঙ্গে তর্কে তুমি পারবে না। ও চেষ্টা কোরো না। আমি যখন ছোট ছিলুম, তখন আমার বাবা রোজ আমাকে জুতো-পেটা করতেন। কেন বলো তো! এই তর্কের জন্যে, মুখে মুখে তর্ক। তর্কে হেরে গেলেই গুরুজনেরা রেগে যান। রেগে গেলেই জুতো-পেটা। এই দেখো না, এটা কীসের দাগ?"

লম্বু হাতের ওপরে একটা দাগ দেখাল।

"কী, তুমি ভাবছ টিকে। আজ্ঞে না। মা খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিল। হ্যা হ্যা বাব্বা, আমি কি তোমার মতো ফিনফিনে, মিনমিনে ছেলে ছিলুম! আমি ডাকাত।"

"ডাকাত হয়ে কী লাভ হল তোমার? কিছুই তো করতে পারলে না! ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করেছ?"

"আরে দূর, সে ডাকাত নয়। তুমি ছাই বাংলা বোঝো না।"

লম্বু হঠাৎ কানখাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল। নিতু কিছু বলতে গেল। লম্বু ঠোঁটে আঙুল রেখে 'ফিস' করল। কী যেন শুনল, তারপর ফিসফিস করে বললে, "শুনতে পাচ্ছ না, একটা গাড়ি আসছে!"

নিতু অবাক হয়ে বললে, "গাড়ি আসছে তো কী হয়েছে। এটা তো রাস্তা, গাড়ি তো আসতেই পারে।"

লম্বু রেগে গেল, "তোমার মাথায় কিছু নেই। গাড়িটা তো ওই দিক থেকে আসছে! তার মানে ওই গাড়িতে বেঁটে আছে।"

"বেঁটে কী করে থাকবে! এই তো বললে, বেঁটে আর উঠতে পারবে না, বাঘে চিবিয়ে খাবে।"

"আরে বাবা, বাঘ তো বেরোবে সেই রাতে। তারপর বাঘের আবার মজা আছে, গাধারা খিদে না পেলে যত মোটা চর্বিঅলা মানুষই হোক না কেন, শুঁকেও দেখবে না।"

এতক্ষণ গাড়িটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এইবার দেখা গেল ঢালু বেয়ে উঠছে। আর একটা জিপ।

লম্বু বললে, "এই হয়েছে। পুলিশ নাকি রে বাবা!"

নিতু বললে, "পুলিশ হলে কী হবে?"

"কত কী হতে পারে। আমাকে ধরতে পারে।"

"তোমাকে ধরবে কেন?"

"তোমাকে ধরেছি বলে।"

"তুমি তো ধরোনি।"

"সে তুমি বলছ। ওরা বিশ্বাস করবে কেন। চোরাই মাল যার কাছে থাকে পুলিশ তাকেই ধরে।"

"তা হলে তুমি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ো। তোমাকে ওরা দেখতে পাবে না। তুমি পুলিশকে এত ভয় করো!"

"ধুর, ওরা ভীষণ পেটায়। কোনও কথা শুনতে চায় না। ধরেই পেটাতে থাকে। বিচ্ছিরি লাগে। ভয় করে, রেগে গিয়ে পাছে পিটিয়ে দি! তখন তো ভীষণ বেআইনি ব্যাপার হয়ে যাবে! পুলিশ ঠ্যাঙালে ক'বছর জেল হয় জানো?"

"আমি কী করে জানব?"

"এ সব জেনারেল নলেজ। তুমি ছাত্র, তোমার জানা উচিত।"

"আমি তো আর ছাত্র নই। কে আর আমাকে পয়সা খরচ করে পড়াবে গো দাদা!"

"কেন, তোমার বাবা!"

"এতক্ষণ তবে শুনলে কী, আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন তো!"

"ওই সব মনখারাপ-করা কথা আমাকে বোলো না তো। বিচ্ছিরি লাগে।"

॥ ১০ ॥

নিতু দেখছে পেছনের জিপটা বেশ জোরে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ভেতরে কারা বসে আছেন। লম্বুদা চোখে হাত আড়াল করে বেশ কিছুক্ষণ দেখেটেখে বললে, "মনে হচ্ছে ডি. এম-এর জিপ।"

নিতু বললে, "তার মানে? ডি. এম, মানে দেবাশিস মিত্র?"

"তোমার মুন্ডু। ডি.এম. মানে জানো না, মানুষ হয়েছ? ডি. এম. মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। হেহে বাব্বা, জানো না, মানুষের মতোই দেখতে; কিন্তু কী ক্ষমতা। তোমাকে এমন ইংরিজি বলবে, ঠোঁটে পাইপ চেপে, তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। পুলিশরাও জুতোয় জুতো ঠুকে দেখা হলেই স্যালুট করে। থানার বড়বাবুর মুখ তো এমনি ডালকুকুরের মতো; কিন্তু ডি. এম.-কে দেখলেই একেবারে আলুভাতে। চেয়ার উলটে দোয়াত-কালি উলটে, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার রে ভাই!"

নিতু বললে, "তা হলে আপনি এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন দাদা। যে ডি. এম.-কে পুলিশ ভয়ে ভয়ে স্যালুট করে সেই ডি. এম.-এর মার কী সাংঘাতিক হবে একবার ভেবে দেখুন।"

"আমি ভাববার আগে, তুমি একবার ভাবো, আমাকে 'তুমি' বলবে না 'আপনি' বলবে। আমাকে কি তুমি বহুরূপী ভেবেছ? একবার তুমি হচ্ছি, একবার আপনি হচ্ছি! আমার একটা ক্যারেক্টার আছে ভাই।"

"এখন তুমি আমার পায়ের কাছে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ো দাদা, জিপ খুব জোরে তেড়ে আসছে। পরে ক্যারেক্টার দেখাবে।"

লম্বু শুয়ে পড়ল। একটু আগে যেখানে শুয়ে ছিল নিতু, সেইখানে লম্বু ফ্ল্যাট। জিপটা ওভারটেক করে বেরিয়ে যাবার সময় নিতু দেখলে পিছনে আরও অনেকের সঙ্গে বসে আছে সুকু। নিতু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, "সুকু, সুকু, সুকু।"

পায়ের কাছে শুয়ে থাকা লম্বু নিতুর প্রতিটি ডাকের সঙ্গে বলছে, "ধুত, ধুত, ধুত, ডাকছ কেন? আরে বাবা ডাকছ কেন!"

জিপটা কিছু দূরে নিতুদের জিপের পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুকু লাফিয়ে পড়ে ছুটে এল, "নিতু! আরে নিতু। নিতু যে!"

ডি. এম.-এর জিপ থেকে নেমে এলেন একে একে কমল ভৌমিক, সাধু ভগবানদাস, আরও দু'জন, নিতু ওঁদের চেনে না। ওঁদের আসতে দেখে নিতু আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললে, "ও দাদা, তুমি এবার উঠে পড়ো, আমার বন্ধু সুকু আসছে।"

"ধ্যার, এটা তুমি কী করলে! এটা তুমি কী করলে? আমি এখন কী করি রে বাবা!" লম্বুদা উঠে বসল।

কমল ভৌমিক জিপের পাশে এসে, আঙুল নেড়ে বললেন, "নেমে এসো, নেমে এসো।" ডোরাকাটা জামাটা নিতুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, "জামা পরো, জামা পরো। জামা ছাড়া তোমাকে নিতু বলে ডাকতে আমার লজ্জা করে। একটা সভ্যতা আছে ভাই। তুমি জামাটা খুলে রাস্তায় ফেলে দিলে? খুব বড়লোক হয়েছ, তাই না! পরো জামা।" কমল ভৌমিক এক দাবড়ানি দিলেন নিতুকে।

নিতু জামাটা পরে নিল।

কমল ভৌমিক বললেন, "এইবার বলো কাকে ঠেঙাতে হবে?"

লম্বু সঙ্গে সঙ্গে বললে, "আমাকে না, আমাকে না। আমি বেঁটের হাত থেকে একে উদ্ধার করেছি।"

"বেঁটে কোথায়?"

ডি. এম. জিপ থেকে নেমে এগিয়ে এসেছেন। ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন, "এই সেই বালক। যার জামা ছিল, বালক ছিল না?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"আর এই সেই অপরাধী?"

নিতু বললে, "এ অপরাধী নয়। সে আর-একজন, তার নাম বেঁটে।"

"কোথায় সে?"

"বাঘের পেটে।"

"হোয়্যার ইজ দ্যাট বাঘ?"

লম্বু ইংরিজিতে বললে, "বাঘ ইজ ইন দ্যাট হিল।"

বেঁটেটার মতো গাধা আর দুটো নেই। সে একটা মোটরসাইকেলের পিছনে চেপে সেই মুহূর্তে এসে হাজির। মানুষ রেগে গেলে গাধা হয়ে যায়, বেঁটেই তার প্রমাণ। বাইকের পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে, "তবে রে," বলে লম্বুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লম্বু চিৎকার করে বললে, "দিস ইজ ইয়োর বেঁটে স্যার।"

কমল ভৌমিক সঙ্গে সঙ্গে হাত আর পায়ের এমন একটা কায়দা করলেন, অত বড় তিনমনি বেঁটে পালকের বলের মতো শূন্যে উঠে পাঁচ-ছ'হাত দূরে ছিটকে পড়ল। বেঁটের দাঁত বেশ বড় বড় গজালের মতো। সেই দাঁত ছিরকুটে পথের পাশে একটা কাঁটা-ঝোপের ওপর চেপ্তা খেয়ে পড়ে রইল। সুকুর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চটাপট, পটাপট হাততালি।

নিতু তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল জিপ থেকে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড রে বাবা! হাঁটুর ওপর দু'হাতের ভর রেখে, সামনে ঝুঁকে বেঁটেকে দেখতে লাগল নিতু। সামনের একটা দাঁত আবার সোনা-বাঁধানো। যেন দাঁতের ওপর সোনার টিপ। নিতু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেঁটের মুখ দেখছে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুকু।

নিতু বললে, "মুখটা দেখো। এত ভাল করে আর কোনওদিন দেখতে পাবে না।"

সুকু বললে, "গোঁফটা ঠিক যেন ঝাঁটার মতো।"

"মুখটা ঠিক বাঘ-বেড়ালের মতো।"

"বাঘ-বেড়াল কী জিনিস?"

"সে তোমার বাঘও নয়, বেড়ালও নয়। যেমন ধরো ওলকপি। ওলও নয়, কপিও নয়।" কমল ভৌমিক পাশে এসে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগলেন, এক, দুই, তিন, চার। দশ গোনা শেষ করেই বললেন, "আউট। নক আউট। নাও চলো। এরপর কে আছে! চলে এসো।"

ডি. এম. এগিয়ে এসে বললেন, "কী, শেষ করে দিলেন?"

"না, শেষ করিনি। আউট করে দিয়েছি।"

"আমি দেখছিলুম, কায়দাটা কী করলেন বলুন তো?"

"একটা আড়াই তোলা হাঁকালুম। সামান্য হাত আর পায়ের সাইমালটেনিয়াস কাজ।"

"আহা, বড় ভাল কাজ। দেখার মতো কাজ।"

"পাঁচ তোলা মারলে ক্যান্ডিডেট সোজা হাসপাতালে।"

"আর দশ তোলায়?"

"দশ তোলা নেই স্যার। আট আছে। আটে সোজা খাটে।"

"ব্যাপারটা কী?"

"ও স্যার মুখে বলা যাবে না। করে দেখাতে হবে। দেখবেন টেস্ট করে? ছোট্ট একটা বড় দেড় তোলা ঝাড়ব!"

"আমাকে? আপনার তো মশাই সাহস কম নয়! ডি. এম.-এর গায়ে হাত তুললে সোজা হাজতবাস।" ডি. এম.-এর হঠাৎ নজর গেল নিতুর দিকে, ডাকলেন, "এদিকে শোনো।"

নিতু সামনে এসে দাঁড়াল।

"তোমার চুল কি ওরা কামিয়ে দিয়েছে?"

"না স্যার, আমার মামা।"

"অ্যারেস্ট হিম। গ্রেফতার করো। গ্রেফতার।"

ডি. এম.-এর পাহারাদার দু'জন ছুটে এল, "কাকে গ্রেফতার করব স্যার?"

"ওই যে, এই ছেলেটার মামাকে।" ডি. এম. চিতপাত হয়ে পড়ে থাকা বেঁটেকে দেখালেন।

কমল ভৌমিক ফিসফিস করে নিতুকে বললেন, "ভদ্রলোক কানে একটু কম শোনেন। তুমি চিৎকার করে বলো, ও আমার মামা নয়।"

নিতু চিৎকার করে বলল, "ও আমার মামা নয়।"

ডি. এম. হাসতে হাসতে বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি। চুল তোমার বেরোবে ঠিকই, তা হলেও এক ধরনের অত্যাচার তো বটেই। অপমানও বলতে পারো। মামলা যদি ঠিক ঠিক সাজাতে পারি, মিনিমাম দশটা বছর ঘানি ঘোরাতে তো হবেই। অ্যায়, উঠাও উসকো।"

বেঁটে গোঁগোঁ করছে। তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে পাথরের রাস্তার ওপর শোয়ানো হল। পাহারাদার দু'জন জিজ্ঞেস করলে, "ইসকো ক্যেয়সে লে জায়গা সাব!"

ডি. এম. শুনতে পেলেন না, বললেন, "থোড়াসা পেটাও।"

পাহারাদার দু'জন দুমদাম পিটিয়ে দিলে। বেঁটে যাও-বা গোঁগোঁ করছিল, গোঙানি থেমে গেল। কমল ভৌমিক হঠাৎ লম্বুদার জামার কলার চেপে ধরে বললেন, "ছোকরা, তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দেবে। তুমি এই বেঁটের দলে এলে কী করে সোনা? খারাপ লোকের সঙ্গে খারাপ লোকেরই ভাব হয়।"

লম্বু হাসতে হাসতে বললে, "এই যে ভুলটা করলেন, এর জন্য আমি একশোর মধ্যে একশো পেয়ে গেলুম।"

কমল ভৌমিক অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে? এটা কি মাধ্যমিক পরীক্ষা নাকি?"

"জামার কলারটা ছেড়ে দিন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

কমল ভৌমিক কলার ছেড়ে দিলেন। লম্বুদা বুকপকেট থেকে একটা কার্ড বের করে কমল ভৌমিকের চোখের সামনে ধরলেন।

কমল ভৌমিক দেখে বললেন, "সর্বনাশ, আপনি ডিটেকটিভ?"

"আজ্ঞে, আমি তো নিজেকে সেইভাবেই জানি, তবে লোককে জানতে দিই না। আমি সেন্ট্রাল ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসার। ক্যারাটে, কুংফুতে আমি ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছি। শুটিং-এ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান।"

সুকু বললে, "আরেব্বাস?"

নিতু বললে, "তবে আপনি আমাকে ওসব কথা বলছিলেন কেন? ডি. এম.-এর জিপ দেখে জিপের মেঝেতে শুয়ে পড়লেন?"

"বোকা ছেলে, ওইটাই তো আমাদের কায়দা। নিজেদের সব সময় আমরা লুকিয়ে রাখি। তুমি একটা বাচ্চা ছেলে, তাও তোমার সামনে আমার লুকোচুরি। এ আমাদের করতেই হয় ভাই! এক-একটা চরিত্রে অভিনয় করতে করতে এমন হয় যে, নিজে কী তা একদম ভুলে যাই। একবার মধ্যপ্রদেশে ডাকাতদের দলে থাকতে থাকতে এমন হল, এক বছর পরে নিজে কী, বেমালুম ভুলে গেলুম। একদিন পুলিশের ওপরেই লখন সিং-এর সঙ্গে ধড়াধ্‌ধাম্‌ গুলি চালিয়ে দিলুম। পুলিশ ধরলে। বেধড়ক ধোলাই। তখনও মনে পড়ছে না, আমি কে। শেষে পুলিশই পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে লজ্জায় মরে। 'স্যার, ক্ষমা করে দিন।' ইয়া বড় বড় মেঠাই এনে বেধড়ক খাওয়ালে। ওদেরও লজ্জা, আমারও লজ্জা। আমার জীবন নিয়ে তুমি একটা স্টোরি লিখতে পারো। ফেরোসাস স্টোরি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ইংরেজিটা আপনি ভালই জানেন দেখছি। এতকাল শুনে এলুম ফেরোসাস টাইগার, আজ শুনছি ফেরোসাস স্টোরি।"

"কত কী শুনবেন মশাই! আপনার তো এখন কচি বয়েস। আরও কত বছর বাঁচতে হবে, দেখতে হবে, শুনতে হবে, শিখতে হবে। ওই তো ভাবুন না, ওই ইংরেজিটা। কী সুন্দর বলেছে, ম্যান লিভস টু লার্ন অ্যান্ড ডাইজ টু বি বর্ন।"

নিতু আর সুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে পারো এই শ্লোকটার বাংলা করতে?"

সুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, "মানুষ বাঁচে শেখার জন্যে আর মরে জন্মাবার জন্যে।"

"হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। একশোতে একশো।"

নিতু বললে, "হঠাৎ আপনি কী সুন্দর পালটে গেলেন। একটু আগের লম্বুদা তো আর আপনি নন?"

"অ্যাঁ, তাই নাকি! তোমার সেইরকম মনে হচ্ছে নাকি? তা হলে তো একশোর মধ্যে একশো পেয়ে গেলুম? তা হলে দেখবে? আর-একটা মজা দেখবে?"

ভদ্রলোক হাঁ করে, ওপর আর নীচের দাঁত দু'পাটি খুলে ফেললেন। গালটাল সব ঝুলে গেল। হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, "কতটা বাড়ল?"

সুকু বললে, "কী কতটা বাড়ল?"

"বয়েস, বয়েস!"

নিতু বললে, "কী মজা! লম্বুদা থেকে লম্বুদাদু হয়ে গেলেন!"

"তা হলে আবার দেখো।"

লম্বুদা একটানে, ঠোঁটের ওপর থেকে গোঁফজোড়া খুলে ফেললেন। হাসিহাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, "এইবার?"

সুকু বললে, "এইবার একেবারে শার্লক হোমস।"

"তাই নাকি? তা হলে তো অসম্ভব ভাল। আর এইবার?"

মাথার চুল খুলে ফেললেন।

সুকু বললে, "এইবার তো মনে হচ্ছে ভীষণ চেনা। কোথায় যেন দেখেছি। কোথায় যেন দেখেছি।"

নিতু বললে, "আমি জানি। আপনি হলেন সুদর্শন। আপনার লেখা ডিটেকটিভ উপন্যাস আমি পড়েছি।"

"হেহে, দেখলে তো, ধরা দিলুম বলেই ধরতে পারলে। আসলে জানো, আমি বোধহয় ডিটেকটিভ নই, আমি একজন লেখক। ভারতীয় শার্লক হোমস।"

ডি. এম. এগিয়ে এসে বললেন, "তা হলে আমরা এখন কী করব? এইসব কেসে সাধারণত কী করে?" এতক্ষণ লম্বুদার দিকে চোখ পড়েনি। চোখ পড়তেই বললেন, "হু আর ইউ?"

॥ ১১ ॥

যার মোটরবাইকে চেপে বেঁটেকুমার লম্বুকে পাকড়াতে এসে ধরা পড়ে গেল সে একটা গোবদাগাবদা গুন্ডা টাইপের ছেলে। বোকা বোকা চেহারা। তবে বেশ সলিড চেহারা। এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে কাণ্ডকারখানা সব দেখছিল। হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে, "আমার তো কিছু রিওঅর্ড পাওয়া উচিত। আমি কিতাবে পড়েছি দাগি আসামি ধরে দিলে সরকার মোটা টাকা রিওঅর্ড দেয়।"

কমল ভৌমিক সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তুমি তো ধরোনি, আসামি নিজে ধরা দিয়েছে। তুমি রিওঅর্ড পাবে না, বড়জোর গাড়িভাড়াটা পেতে পারো। তোমার বাইক চেপে আসামি এসেছে। আর সে ভাড়া দেবে আসামি। তার জ্ঞান ফিরলে দু'-দশ পয়সা চেয়ে নিয়ো।"

ডি. এম. পাইপ নামিয়ে বললেন, "আমরা কি রিওঅর্ড ঘোষণা করেছিলুম?"

গোয়েন্দা ও লেখক সুদর্শন বললেন, "এ আপনার রিওঅর্ড ঘোষণা করার মতো অপরাধী নয়। পাতি গুন্ডা। কান মলে কিল মেরে ছেড়ে দিলেই হবে। বেশি সম্মান দেখালে পেয়ে বসবে। ছুঁচোকে হাতি মনে করার কোনও কারণ নেই।"

কমল ভৌমিক ইতিমধ্যে লোকটার হাতের গুলি টিপেটুপে দেখতে শুরু করেছেন।

"ব্যায়াম করো? ওয়েট লিফটিং?"

"হ্যাঁ, সরকার।"

"ঠিক হচ্ছে না। একদম ঠিক হচ্ছে না। স্টিফ হয়ে যাচ্ছে। ম্যাসাজ নাও? রোজ করো?"

"হ্যাঁ, সরকার।"

"রোজ করবে না। সপ্তাহে তিন দিন। মাস্‌লকে রেস্ট দাও। তা না হলে অষ্টাবক্র মুনির মতো চেহারা হয়ে যাবে।"

"জি সরকার। লেকিন থোড়া কুজ রিওঅর্ড।"

"ও বাব্বা, কলা দাও মুলো দাও ভবী নহি ভুলতা হ্যায়।"

সুদর্শন বললেন, "রিওঅর্ড তুমি পেতে পারো, যদি তুমি সেই সায়েবকে খুঁজে দিতে পারো।"

"কোন সায়েব সরকার।"

"যে সায়েব ওই ভোলানাথ পাহাড়ে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। শিলডুংরির বর্ষার জলে যার টুপি ভেসে এসেছিল।"

"কত টাকা রিওঅর্ড সরকার?"

"পঞ্চান্ন হাজার, ফিফটি থাউজ্যান্ড।"

শুনে লোকটি হাঁ হয়ে গেল। কমল ভৌমিক বললেন, "তোমার এত টাকা টাকা কেন ভাই?"

লোকটি বড় বড় চোখ করে বললে, "সরকার, আমি ভঁইস কিনব।"

"তা হলে যাও, সায়েবকে খুঁজে বের করো।"

"খুঁজে পেলে কোথায় আনব সরকার?"

"কোতোয়ালিতে।"

বোকা অমনি মোটরবাইক চালিয়ে ভটভট করে ছুটল পাহাড়ের দিকে, যেন সায়েব ওর অপেক্ষাতেই বসে আছে ওখানে। কাঁটা-চামচে দিয়ে ব্রেইজড কাটলেট খাচ্ছে। প্রায় চার বছর হয়ে গেল সায়েবের কোনও সন্ধান নেই। টুপিটা খালি ভেসে এসেছিল শিলডুংরির জলে।

সুকু বললে, "অত বড় লোক; কিন্তু কী বোকা!"

লেখক কাম গোয়েন্দা সুদর্শন বললেন, "খোকা, কিছুই কি বলা যায়। ওই ভোলানাথ পাহাড় এক অদ্ভুত জায়গা। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় শ'পাঁচেক গুহা আছে। সেইসব গুহায় ঢোকার সাহস কারও নেই।"

ভগবানদাসজি এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। বললেন, "জয় রামজি। সো বাত তো ঠিকই আছে।"

সুদর্শন বললেন, "আরে, আমি আজ দু'বছর হল ওই করছি। আমার আসল কাজই তো সায়েবের সন্ধান। সেই করতে গিয়েই তো নেপিয়ারের খপ্পরে পড়ে গেলুম। আমি তো লিখি। লেখকদের অনেক সময় চোর-ডাকাত-সাধু-স্মাগলার সব সাজতে হয়। সে-সাজ এমন, কেউ ধরতে পারে না। যেমন ধরো, আমি আসল সুদর্শন না নকল সুদর্শন বুঝবে কী করে। আমি যে সেন্ট্রাল গোয়েন্দা তারই বা কী প্রমাণ!"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনার কাগজপত্র, আইডেন্টিটি, চেহারা।"

"ধরুন আসল সুদর্শন গায়েব হয়ে গেছে। সে আর নেই।"

"কেন মিছিমিছি প্লটটাকে জটিল করছেন। যারা ভাল লেখক তারা অমন করে না। সহজ সরল গল্প না থাকলে ছোটরা পড়বেই না। ওই দোষে জানেন তো, আমার লেখক হওয়াই হল না। একবার এক পত্রিকার সম্পাদকের কাঁধের বাত ভাল করে দিয়েছিলুম। তিনি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছিলেন, ফুটবল নিয়ে, সাঁতার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু বাত নিয়ে কিছু লেখাই হল না। অথচ বাত একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। ঘরে ঘরে বাত, দেহে দেহে বাত। আপনি আপনার অনবদ্য বাংলায় লিখুন। আমি ধারাবাহিক ছাপব। বাংলায় বাতের তেল আছে, বেতো-ঘোড়া আছে, বেতো-উপন্যাস নেই। আপনি হবেন পথিকৃৎ।"

সুদর্শন বললেন, "অনবদ্য বাংলা। আপনি কী লেখেন যে তিনি বললেন অনবদ্য বাংলা! বাতের তেল দেবার ফল।"

"আজ্ঞে না, আমার বাংলা বলা দেখে বুঝতে পারছেন না! না জেলাসি! পথিকৃৎ শব্দ সহসা কেউ ব্যবহার করে না, জানেন! এই যে সহসা বললুম, উচ্চ স্তরের বাংলা। আপনি হলে বলতেন, হঠাৎ করে। আরে মশাই আমি এতক্ষণ যা বললুম সেটা লিখলেই তো সাহিত্যিক।"

"তা লিখলেই হয়। লিখে প্রমাণ করলেই হয়— আপনি একজন যুগান্তকারী বেতো-সাহিত্যিক।"

"দুটো কারণে লেখা হল না। লিখতে লিখতে থেমে গেল।"

"কী কারণ?"

"প্রথম এবং প্রধান কারণ, বাত এমন একটা বিষয় যার কোনও শেষ নেই।

একশো তেষট্টি রকমের বাত আছে। ধরলে সারে না। যার শেষ নেই তা নিয়ে কী লিখব? মহাভারতেরও শেষ আছে, বাতের শেষ নেই। আর দ্বিতীয় কারণ, কলম।"

"কলম! কলম একটা কারণ হল! পয়সা ফেললে হাজারটা কলম পাওয়া যায়।"

"ও সব সরু সরু মেয়েলি কলম আমার হাত ফসকে পড়ে যায়। এ মশাই আমার ডাম্বেল, বারবেল ভাঁজা হাত। মোটা ভারী বাঁশের মতো কলম চাই। কোথায় পাবেন?"

"যাক বাবা, বাংলা সাহিত্য বেঁচে গেছে। কী জিনিস নামত কে জানে?"

"আরে না মশাই, বাংলা সাহিত্য বেঁচেছে আমার ব্যায়ামে। সাতখানা উপন্যাস লেখার পর সাহিত্যিকদের ডান হাত অচল হয়ে যায় স্পন্ডিলাইটিসে। তখন শুরু হয় আমার খেল। ফিজিওথেরাপি, ম্যাসাজ। সাত দিনেই হাত আবার চালু হয়ে খেলতে শুরু করে। আমি না থাকলে সাহিত্যের কী হত। ভেবে দেখেছেন একবার।"

ডি. এম.-এর পাহারাদার বললে, "সায়েব বলছেন, এবার আমরা যাব। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলো।"

নিতু সুকুকে বললে, "আমরা কোথায় যাব ভাই।"

সুকু বললে, "সেই চিড়িয়াখানায়।"

দুটো জিপই স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল পাহাড়ি পথে। আগে চলেছে সেই জিপটা, যেটায় ছিল নিতু। সেই জিপে দু'জন চৌকিদার আর বেঁটে। পেছনের জিপে ডি. এম.; নিতু, সুকু, কমল ভৌমিক আর সাধু ভগবানদাস। জিপ চলেছে চিড়িয়াখানার পথে। ডি. এম.-এর পাশে বসেছেন সুদর্শন।

নিতু বললে, "চিড়িয়াখানাটা তো অনেক দূরে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ওই জন্যেই তো চলল না, উঠে গেল।"

সুদর্শন বললেন, "ধ্যার মশাই, চিড়িয়াখানা কি দোকান নাকি, যে উঠে যাবে! বলুন, দেখাশোনার অভাবে মরে গেল।"

সুকু বললে, "ওইটাকে এইবার আমরা সুন্দর করব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "জিনিসটা সরকার যখন তোমার হাতেই দিলেন, তখন আর চিড়িয়াখানা নয়, আমরা একটা প্রাকৃতিক চিকিৎসাকেন্দ্র করব। বিদেশে আছে।"

সুদর্শন বললেন, "সেটা আবার কী?"

"যেমন ধরুন, বেলজিয়ামে আছে— হট স্পা। বিশাল বিশাল সব ডোবা, সেই ডোবায় জলের বদলে গরম কাদা। সেই কাদায় ঘণ্টাখানেক ডুবে বসে

থাকলে বাত, জ্বর, স্নায়বিক দুর্বলতা, বদহজম সব সেরে যাবে। তারপর ধরুন সবুজ ঘাসের ওপর চার পায়ে ঘোরা।”

“চার পা? আমাদের তো মশাই দুটো পা। আর দুটো পা পাব কোথায়?”

“দুটো হাত। দুটো হাতই তখন দুটো পায়ের কাজ করবে।”

“তাতে কী হবে?”

“জীবনশক্তি বেড়ে যাবে। প্রচণ্ড খিদে হবে। হজমশক্তি বেড়ে যাবে। হিংসা কমে যাবে। তারপর হনুমান চিকিৎসা?”

“সেটা আবার কী?”

“সে বেশ মজা! নিজেকে হনুমান ভেবে, গাছের এ-ডালে ও-ডালে হুপহাপ করে বেড়ানো। ডাল ধরে ঝোলা। ঝুলতে ঝুলতে কাঁচা ফল-পাকুড় খাওয়া।”

“তাতে কী হবে?”

“পরমায়ু বাড়বে। ধর্মভাব জাগবে। মানুষের চেহারা পালটাবে।”

সুদর্শন বললেন, “কী, হনুমানের মতো হয়ে যাবে।”

“তা কি আর হবে! সে শ্রীরামচন্দ্রের দয়া ছাড়া হয় না।”

সঙ্গে সঙ্গে ভগবানদাসজি গান ধরলেন, “রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। সব কো সম্মতি দে ভগওয়ান।”

হঠাৎ বন শেষ হয়ে গেল। দূরে সাদা সাদা বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। কমল ভৌমিক বললেন, “হোয়াটস দ্যাট।”

ভগবানদাসজি বললেন, “সিমেন্ট কা কারখানা।”

ডি. এম. বললেন, “মিস্টার ভৌমিক, ওখানে আমরা লাঞ্চ করব? মি. ছাবরিওয়াল আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। খিদেও পেয়েছে খুব। আমি আবার খিদে একদম সহ্য করতে পারি না। পেট জ্বালা করে।”

কমল ভৌমিক বললেন, “তা হলে এবার থেকে একটা কাজ করবেন, সঙ্গে লজেন্স রাখবেন। ভেতরে চিনির কোটিং দিয়ে রাখলে ওই জ্বালা ভাবটা কমবে।”

“অ্যাঁ, লজেন্স! এই বুড়ো বয়েসে লজেন্স! ভেরি গুড। আজই আমি এক টিন কিনব। হাউ নাইস, হাউ নাইস।”

॥ ১২ ॥

জিপ চলেছে ফরফর করে। বাতাসে চুল উড়ছে। ডি. এম. কমল ভৌমিককে বললেন, “আচ্ছা মশাই, আপনার এত জোর হল কী করে?”

“ব্যায়াম করে।”

"আরাম করে?"

ডি. এম. কানে কম শোনেন। কমল ভৌমিক কান-ফাটানো গলায় বললেন, "আরাম করে নয়, ব্যায়াম করে। ব্যায়াম করে জোর বেড়েছে।"

"ও ব্যায়াম। খিদে কীভাবে বাড়ে?"

"খুব জল খেলে।"

"খুব ঘোল খেলে আবার ঠান্ডা লেগে যাবে।"

"ঘোল নয়, ঘোল নয়। জল, জল খেতে হবে।"

"ও জল।"

পাশেই জলের ফ্লাস্ক ছিল। ডি. এম. ঢকঢক করে আধ ফ্লাস্ক জল খেয়ে বললেন, "ছাবড়িওয়াল আবার এত খাওয়ান যে, খেয়ে শেষ করা যায় না। দুটো পেট হলে ভাল হয়। আর একেবারে ফাসক্লাস রান্না গন্ধেই জল এসে যায় জিভে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "সংযম চাই, সংযম। অসুখ করে অসংযমীর।"

ডি. এম. চমকে উঠে বললেন, "বোম। বোম মারবে? কে বোম মারবে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "আর তো পারা যায় না। এমন জানলে একটা লাউডস্পিকার আনতুম। গলা চিরে যাবার জোগাড়।"

ডি. এম. বললেন, "ফিরে যাবার অত তাড়া কীসের। আপনি বেড়াতে এসেছেন। যখন হোক ফিরলেই হবে। তা ছাড়া আপনি হলেন ডি. এম.-এর গেস্ট। ছাবড়িওয়াল কে? হু ইজ ছাবড়িওয়াল। আপনাকে আমি খাওয়াব। ভাববেন না আপনি জলে পড়ে আছেন। অ্যায়, রোককে।" গাড়ি ঘ্যাঁস করে থেমে গেল।

ডি. এম. তড়াক করে নেমে পড়লেন। কমল ভৌমিক, নিতু, সুকু সবাই অবাক, কী হল রে বাবা! ডি. এম. এদিক-ওদিক তাকালেন। অন্যেরাও তাকাল। কী খুঁজছেন ভদ্রলোক। কাকে খুঁজছেন। কিছুই বোঝা গেল না। বন পাতলা হয়ে এলেও চারপাশে বন। কোথাও কোনও জনবসতি নেই। বহুদূরে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি কোয়ার্টার, ঘরবাড়ি। চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

রাস্তার ধারে খাদ। অনেকটা নীচে একটা গোরু চরে বেড়াচ্ছে। ডালপালা খাচ্ছে। কোথা থেকে চলে এসেছে বেড়াতে বেড়াতে। ডি. এম. গোরুটাকে দেখেই তাঁর পাহারাদারদের বললেন, "পাকড়ো পাকড়ো।" যেন ওই গোরুটাকেই খুঁজছিলেন।

দুটো চৌকিদার হুড়হুড় করে ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে শিং ধরে টানতে টানতে গোরুটাকে ওপরে নিয়ে এল। মাঝারি মাপের কালো একটা গোরু।

নিতু সুকুকে প্রশ্ন করলে, "গোরু কী হবে রে ভাই।"

সুকু বললে, "ডি. এম. তো, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গোরু অপরাধ করেছে, তাই সাজা হবে।"

"কী অপরাধ? গোরুর আবার অপরাধ! গোরু বলে রাস্তার ওপর নোংরা করলেও কিছু হয় না। গোরু তো মা।"

"আরে, সে অপরাধ তো শিশুও করে। গোরুতে শিশুতে তফাত নেই। আসলে এর অপরাধ খুব গুরুতর। জঙ্গল-কাটা কি জঙ্গল-খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। একটা গোরু সকাল থেকে সন্ধে কতটা জঙ্গল খেয়ে ফেলে জানো। সে অঙ্ক জেলা অফিসে আছে। গোরুটার বিচার হবে।"

"তারপর জেল হবে!"

"দেখাই যাক।"

ডি. এম. পাহারাদার দু'জনকে বললেন, "দেখো, দুধ আছে কি না। দেখতা নেহি কমলবাবুকো ভুখ লাগি হুই।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমার ভুখ লাগলেও, দুধ এখন খাব না।"

আস্তে বলেছিলেন, ডি. এম. শুনলেন ওষুধ ভাল লাগে না। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ওষুধ আমারও ভাল লাগে না। যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।"

কমল ভৌমিক গলা ফাটিয়ে বললেন, "দুধ আমি এখন খাব না।"

ডি. এম. এইবার শুনতে পেলেন, বললেন, "তা হলে কী খাওয়াব আপনাকে। এই জঙ্গলে আর আমি কী পাব। আপনি তো আর গোরু নন যে পাতা খাওয়াব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই তো বললেন ছাবড়িওয়াল আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবে।"

ডি. এম. শুনতে পেয়েছেন। কমল ভৌমিক বেশ জোরেই বলেছেন। ডি. এম. বললেন, "এই তো বললেন, ছাবড়িওয়ালের ওখানে আপনি খাবেন না। খাওয়া উচিত হবে না।"

কমল ভৌমিক সুকুকে বললেন, "বুঝলে কমরেড, এর চেয়ে মানুষের মৃত্যু ভাল। চিৎকার করে করে গলা ফেটে গেল। দুপুর পেরিয়ে গেল। খিদে পেয়ে পেয়ে পিত্ত পড়ে গেল।"

কমল ভৌমিক হঠাৎ ডি. এম.-এর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভীষণ জোরে বললেন, "আমি খাব, আমি খাব, আমি খাব।"

"আম খাবেন। মশাই এটা আমের সময়।"

কমল ভৌমিক হতাশ হয়ে পথের ধারে একটা পাথরে বসে পড়লেন। ডি. এম. বললেন, "দুধ তা হলে খাবেন না।"

কমল ভৌমিক মাথা নেড়ে জানালেন, না। আর পাহারাদার দু'জন হেঁকে বললে, "সাহাব, ইসমে দুধ নেহি হ্যায়। বিলকুল টিনকা মাফিক খালি।"

ডি. এম. অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন, "কেয়া গোরু হুয়া লেকিন ইস্টক মে দুধ নেহি রাখা, এ ক্যায়সা গোরু।"

একজন পাহারাদার সাহস করে বললে, "মালুম কোই খা লিয়া।"

"কৌন খায়া। উসকো যাঁহা হায় ওঁহিসে পাকাড়কে লে আও। মেহমান আদমিকা সামনেমে মেরা বেইজ্জততি হো চুকা।"

কমল ভৌমিক জীবনে এমন সমস্যায় পড়েননি। তিনি পাথরের আসন ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, নিতু, সুকু আর সুদর্শনকে জিপে উঠতে বলে নিজে ড্রাইভারের আসনে বসেই জিপ চালু করে দিলেন। ইঞ্জিনের শব্দে ডি. এম. চমকে উঠে বললেন, "এ কী, চললেন কোথায় আমাকে ফেলে?"

কমল ভৌমিক চিৎকার করে বললেন, "সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে লাঞ্চ খেতে।"

ডি. এম. শুনেছেন। শক্ত শক্ত কথা, যুক্তাক্ষরঅলা কথা, কথার শেষে ই বা ঈ থাকলে সহজেই শুনতে পান। চিৎকার করে বললেন, "বাঃ, যার নেমন্তন্ন সে-ই পড়ে রইল। আপনারা তো আমার গেস্ট।"

"তা হলে গোরু-ঘোড়া না করে উঠে আসুন।"

সুকু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "আরে, আরে, সেই জিপটা কোথায় গেল!"

"অ্যাঁ, কোন জিপ?" সকলে চমকে উঠলেন। সত্যিই তো, দ্বিতীয় জিপটা নেই। ওই জিপে বেঁটে আর দু'জন পাহারাদার ছিল। জিপ চালাচ্ছিল নেপিয়ারের লোক। ডি. এম.-এর হুকুমে পাহারাদার দু'জন নেমে এসে গোরু ধরতে ছুটেছিল। যখন ডি. এম. গোরু গোরু আর দুধ দুধ করছিলেন, সেই সময় জিপটা সরে পড়েছে।

কমল ভৌমিক স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এলেন। শুরু হল পরামর্শ, কী করা হবে এবার। ওদিকে ছাবড়িওয়ালের লোভনীয় লাঞ্চ, এদিকে বেঁটে ভেগেছে।

ডি. এম. বললেন, "জিপের নম্বর কেউ দেখেছে।"

কারও মুখে উত্তর নেই। অতবড় গোয়েন্দা সুদর্শন তিনি কেবল বলছেন, "যদ্দূর মনে হয়, যদ্দূর মনে হয়..."

সুকু একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই হল জিপের নম্বর।"

ডি. এম. খুশি হয়ে বললেন, "ভেরি গুড, ভেরি গুড, এই ছেলেটা আমার অ্যাসেট।"

সুদর্শন বললেন, "আপনারা লাঞ্চ খেতে যান। আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি জিপটার পেছনে ধাওয়া করি। যাবে কোথায়, এই তো রাস্তা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। পেছন থেকে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "অতই সোজা। বেঁটে একটা ঘুসি হাঁকড়ালে সবকটা দাঁত ঝরে যাবে।"

"ঝরলেই হল! আমি দাঁত দু'পাটি খুলে পকেটে রেখে দোব।"

"ও, ফল্‌স টিথ! তা হলে অবশ্য ভয় নেই। ঘুসোঘুসির সময় শরীরের দুটো জিনিস বড় ট্রাবল দেয়, এক দাঁত, আর দুই নাক।"

"কমলবাবু, আমারও অসম্ভব জোর। মানুষকে দেখে বোঝা যায় না। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার কাছে বিলেত থেকে চিঠি এসেছিল টারজানের বইয়ে অভিনয় করার জন্যে।"

॥ ১৩ ॥

কমল ভৌমিক মুচকি হাসলেন। সুকু আর নিতুর দিকে তাকালেন। বলতে চাইলেন, কী বুঝছ! খুব বড় বড় বাত ছাড়ছে সুদর্শন। রাস্তার ধার থেকে গাছের একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বললেন, "তা করলেন না কেন?"

"একটা কারণে। টারজানের কোনও ডায়ালগ থাকবে না। সারা বই নানা জন্তুর গলায় কথা বলতে হবে।"

"কথা বলতে হবে? জন্তুরা কথা বলে নাকি?"

"অফকোর্স বলে। না বললে, তাদের ছেলেমেয়েরা তো না খেয়ে মরে যাবে। ধরুন, বাঘের মা ঘুমোচ্ছে, তার ছেলেমেয়েরা খেলার মাঠ থেকে খেলে এসে মা খেতে দাও, খেতে দাও, শিগগির খেতে দাও বললেই, না মা উঠে মানুষ মারতে ছুটবে।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি! তা জন্তুর ভাষা মানুষ শিখবে কোথা থেকে!"

"আছে, আছে, সব ব্যবস্থাই আছে। বিলেতে স্কুল আছে। বই আছে। ব্যাকরণ আছে। আমি টানা তিন মাস সেই স্কুলের ছাত্র ছিলাম।"

"কিছু শিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ, বাঁদরের ভাষা কিছুটা রপ্ত করেছিলাম। যেমন ধরুন, বাঁদরের বাচ্চার খিদে পেলে কী বলবে বলুন তো, চিঁ চেঁ সুঁসুঁ।"

"তার মানে?"

"চিঁ হু কর্তা, মানে আমার চেঁ মানে, পেট, সুঁসুঁ হল ক্রিয়া। সুঁইসুঁই করছে। সুঁইসুঁই করছে আমার পেট। এইভাবেও বলতে পারে, যেমন সুঁসুঁ চেঁচিঁ। মজা আছে মশাই ওদের ল্যাঙ্গোয়েজে। হনুমান হলে বলবে, হুপ-হাপ-হাপ। হনুমান আবার সোজাসুজি বলে না। বাঁদরের চেয়ে ভদ্র তো, রামভক্ত। হুপ মানে

ইংরেজির হু, মানে কে, হাপ হাপ মানে, খেতে দেবে। কে আমাকে খেতে দেবে। একটাই সুবিধে, ওদের জগতে মানুষের জগতের মতো অত বকম বকম নেই। ওই খিদে পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে, মাথা ধরেছে।"

"আর বাঘের ছেলের খিদে পেলে কী বলবে?"

"হ্যাঁ, ওরা একেবারে অন্যরকমভাবে বলবে। এদের ভাষায় 'আমি', 'তুমি', 'সে' নেই। ওরা বলবে হালুম হুলুম হালুম।"

"মানে?"

"মানে হল, খিদের জ্বালায় গেলুম গেলুম।"

ডি. এম. বললেন, "একটা অ্যাকশান নিতে এত সময় পরামর্শে নষ্ট হলে অপরাধী তো বিহার ছেড়ে ইউ. পি-তে চলে যাবে আমার এলাকার বাইরে, তখন আমি তো আর কিছুই করতে পারব না।"

সুদর্শন বললেন, "ও হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো। লাঞ্চ বিহার ছেড়ে ইউ. পি. চলে গেলে সে তো ডিনার হয়ে যাবে। ইউ. পি. কম দূর! যত জোরেই জিপ চালাই পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত!"

কমল ভৌমিক বললেন, "ধ্যার মশাই, লাঞ্চ কোথায় যাবে। উনি বেঁটের কথা বলছেন। বেঁটে তো এতক্ষণে বহু দূর চলে গেল।"

সুদর্শন মুচকি হেসে বললেন, "যাবে কোথায়, কত দূর যাবে, পৃথিবীর বাইরে তো আর যেতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে আমার জাল ছড়ানো। এক-একটা কোণ ধরে টানব, মাছের মতো উঠে আসবে।"

"তা হলে এখন আমরা কী করব?"

"আমরা খাব। দেয়ার ইজ নাথিং লাইক ডিনার, উইদাউট দ্যাট উই আর গেটিং থিনার।"

সকলে জিপে উঠে পড়ল। জিপ চলতে লাগল সিমেন্ট কারখানার দিকে। হঠাৎ নিতুর খেয়াল হল, সন্ন্যাসী ভগবানদাস তো নেই! সুকুকে বললে, "ভগবানদাস কোথায়?"

ব্যস, জিপ আবার থেমে পড়ল। ভগবানদাসজি গেলেন কোথায়! ডি. এম. বললেন, "হোয়্যার ইজ ভগবান? ইজ ইট এ কোশ্চেন টু বি আস্কড? হি ইজ ইন দি হেভেন।"

কমল ভৌমিক বললেন, "এ-ভগবান সে-ভগবান নয়। আমাদের সন্ন্যাসী ভগবানদাস।"

আবার বেশ কিছুক্ষণ গুলতানি। খোঁজাখুঁজি। ছোটাছুটি। কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। সুদর্শন বললেন, "মনে হয়, তিনি কোথায় নামাজে বসেছেন। দুপুর তো! নামাজের সময় তো।"

"আরে মশাই, ভগবানদাস হিন্দু সন্ন্যাসী। আপনিও দেখছি ডি. এম.-এর মতো কান শুনতে ধান শুনছেন।"

নিতু সুকুর কানে কানে বললে, "তোমার চিড়িয়াখানায় এঁদের রেখে দাও না! আর কী চাই?"

ডি. এম. শাঁ করে চারপাশ ঘুরে এলেন একপাক। হাত দুটোকে ডানার মতো দেহের দু'পাশে ছড়িয়ে ব্যায়ামের মতো করলেন। দূর থেকেই বললেন, "মাঝে মাঝে একটু হাত-পা খেলানো উচিত। বুঝলেন! খেলুম দেলুম আর ঢ্যাপ হয়ে এক জায়গায় বসে রইলুম, খুব খারাপ অভ্যাস।" ক্রিকেটের বল করার মতো হাত ঘুরিয়ে.অদৃশ্য বল ছুড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আঁআঁ করে যন্ত্রণায় লাফাতে শুরু করলেন। সবাই দৌড়োল। হাত এক রাউন্ড ঘুরেই কাঁধের কাছে কীভাবে যেন আটকে গেছে।

পাহারাদার দু'জন ছুটছে আর চিৎকার করছে, "সাহেবকা হাত ফাটকমে আটক গিয়া।"

কমল ভৌমিক ডি. এম.-এর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক হাত দিয়ে ডি. এম.-এর আকাশে তোলা হাতটা ধরলেন, আর-এক হাতে চেপে ধরলেন কাঁধের কাছটা। তারপর টুক করে কী একটা কায়দা করলেন। দূর থেকেও শোনা গেল খুট শব্দ। ডি. এম. প্রথমে আঁক করে একটা শব্দ করলেন, তারপর সে কী হাসি! একমুখ ঝলমলে হাসি, "আঃ! কী আরাম! থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনি ডি. এম. তাই কিছু করতে পারব না, তা না হলে আপনার গালে একটা থাপ্পড় মারতুম। এই বয়সে হঠাৎ ওইভাবে কেউ বাঁই করে হাত ঘোরায়! এক্ষুনি স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেলে কী করতেন! অ্যা হয়ে পড়ে থাকতে হত সাতদিন। এই বয়সের ব্যায়াম আলাদা।"

ডি. এম. তো কানে কম শোনেন। কমল ভৌমিক যা বললেন, হাসিহাসি মুখে সব শুনলেন, তারপর কমল ভৌমিকের কাঁধে হাত রেখে আদুরে গলায় বললেন, "হবে, হবে, সব হবে। এমন খাওয়া খাওয়াব, দু'দিন আর হাঁ করতে হচ্ছে না। কী খাবেন, মুরগি না খাসি?"

কমল ভৌমিক রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "বাবা রে, কী পাল্লায় পড়েছি রে ভাই, মেরে ফেললে। আবার এতটা আমায় নতুন করে বলতে হবে। প্রথমবার যা বললুম, তা কি আর মনে আছে।"

ডি. এম. হেসে হেসে বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, অনেক বেলা হয়েছে। খিদে পেয়ে গেছে। অ্যায় গাড়ি।" হাত-তিনেক দূরে পথের পাশে জিপটা

খাড়া। 'অ্যায় গাড়ি' বলতেই, ড্রাইভার স্টার্ট দিল। ব্যাটারি ডাউন। স্টার্ট নিচ্ছে না। একবার, দু'বার, তিনবার।

ডি. এম. চিৎকার করছেন, "মারো, মারো। জোরসে মারো।"

উত্তরে জিপ কেবল খ্যার্‌র্‌র্‌, খ্যার্‌র্‌র্‌ করছে। ড্রাইভার মুখ বের করে বললে, "ঠেলনে হোগা সাহাব।"

ডি. এম. দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "ঠেলনে হোগা সাহাব। কেউ ঠেলবে না। তুম আপনা স্টার্ট করো।"

কমল ভৌমিকের দিকে চেয়ে বললেন, "কতবার শয়তানটাকে বলেছি গাড়িটাকে ঠিক রাখিস, টিপটপ রাখিস। গাড়ির ওপর মানুষের মানসম্মান নির্ভরশীল। গেস্টদের সামনে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না, এর চেয়ে অপমান আর কী থাকতে পারে। তাও কার গাড়ি, না ডি. এম.-এর গাড়ি। গেস্টদের সামনে ডি. এম. গাড়ি ঠেলবে? মারো, উসকো মারো।"

ড্রাইভার মুখ ঝুলিয়ে বললে, "সাহাব, মারো মত। হামারা ইউনিয়ান হ্যায়।"

"আরে গাধা, সেল্‌ফ মারো, মারো সেলফ।"

শেষে সেই ঠেলতেই হল। ভারী জিপ। খাড়া পথ। কার সাধ্য, ঠেলে তোলে। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে যাবার পথে এইটাই শেষ চড়াই। পথ একেবারে ঢালু হয়ে অনেক দূরে একেবারে সিমেন্ট কারখানার পাশ দিয়ে ঘুরে কোথায় চলে গেছে। চড়াইয়ের একেবারে মাথায় উঠে পথটাকে দেখতে বেশ লাগে। সাদা পাথুরে রোদে একেবারে ঝকঝক করে।

জিপটাকে সবাই মিলে ঠেলেঠুলে খানিক তোলে তো আবার গড়িয়ে নেমে আসে হড়হড় করে। যতবার নেমে আসে ততই জেদ চেপে যায় যারা ঠেলছে, তাদের। এ একটা চ্যালেঞ্জ। সবাই ঘেমে-নেয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত।

কমল ভৌমিক সুদর্শনকে বললেন, "আপনি তো মশাই টারজান, তা কই তার প্রমাণ রাখুন। এক হাতে ঠেলে গাড়িটাকে তুলে দিন ওপরে।"

"ওটা টারজানের কাজ নয়। টারজানের কাজ হল গাছের ঝোলা শিকড় ধরে দুলতে দুলতে এ-গাছ থেকে ও-গাছ, ও-গাছ থেকে এ-গাছ করা। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানো। পাগলা হাতির সঙ্গে লড়াই। আমার লাইন হল হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই আর জন্তু-মানুষের মতো বনেজঙ্গলে বসবাস। 'ইয়া হু' বলে চিৎকার করা।"

"তা হলে এটা কে পারবে?"

"পারলেও পারা উচিত নয়। কী লাভ।"

কমল ভৌমিক ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে মোটা দড়ি আছে?"

ড্রাইভার একটা দড়ি বের করে দিল। কমল ভৌমিক সামনের বাম্পারে বেঁধে দড়ির একটা প্রান্ত ধরে ওপরে উঠে গেলেন ঢালু পথ বেয়ে। দড়িটাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। উঁচুতে উঠে চিৎকার করে বললেন, "বাচ্চা লোগ, ইধার আ যাও।"

নিতু আর সুকু ছুটে গেল। ডি. এম. কোমরে হাত রেখে অবাক হয়ে দেখছেন। সুদর্শন ছটফট করছেন। দেখা যাক, কলকাতার কমল ভৌমিক কী খেলা দেখান! কমল ভৌমিক এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। দড়িটা মাঝে মাঝে টান করছেন। এমন একটা ভাব করছেন, যেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। জিপটা দাঁড়িয়ে আছে অচল দৈত্যের মতো। পাহারাদার দু'জন ডি. এম.-এর দিকে পেছন ফিরে খইনি ডলছে।

কমল ভৌমিক হঠাৎ জোরে শ্বাস নিয়ে বুকটা ফোলালেন। ফোলালেন, কমালেন, কমালেন ফোলালেন। তারপর গাড়ির দিকে পেছন ফিরে কোমরে দড়ি বেঁধে সামনে ঝুঁকে হাঁটতে শুরু করলেন। জিপ ঠেলে উঠছে ওপরের দিকে। নিতু আর সুকু হাততালি দিচ্ছে। কমল ভৌমিক এখন আর কথা বলবেন না। সে-কথা আগেই বলে দিয়েছেন। পাহারাদার দু'জন, 'আররে কেয়া দিস, কেয়া দিস' বলে চিৎকার করছে।

জিপটা চড়াইয়ের মাথায় উঠতেই নিতু আর সুকু চিৎকার করে উঠল, "স্টপ, স্টপ।"

কমল ভৌমিক থেমে পড়লেন। কোমর থেকে দড়ি খুলে ফিরে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে হাসলেন। জাদুকর খেলার শেষে যেভাবে সকলকে অভিবাদন জানান, অনেকটা সেইভাবে।

কমল ভৌমিক কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। জিপের পাদানিতে পা রেখে, সুদর্শন বললেন, চিৎকার করে, "আপনি বোকা!"

কমল ভৌমিক ধীরে ধীরে আসছেন। আসতে আসতে বললেন, "কেন? বোকামির কী দেখলেন!"

"বলুন তো! কেন বললুম!"

"যাদের গায়ে জোর বেশি থাকে তারা মাথামোটা হয়, এইরকম একটা ধারণা চালু আছে।"

"আছে নাকি! তা হলে ধারণাটা মিথ্যে নয়। পেছনে তাকিয়ে দেখুন। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হতে হতে এই টপে এসেছে।"

"তা তো হবেই। নিচু থেকে উঁচু হয়। ক্রমশ উঁচু হয়। এইবার সামনে তাকান, ওই দেখুন, উঁচু থেকে আবার নিচু হতে হতে পথ কোথায় নেমে গেছে! ওঠা আর পড়া, এই তো নিয়ম! এতে আবার বোকা চালাকের কী দেখলেন! ডোন্ট

টক ননসেন্স, আই সে। আমি কিন্তু এইবার সাংঘাতিক রেগে যাচ্ছি। রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না।"

"রাগুন না, কেউ রেগে গেলে আমার ভীষণ হাসি পায়। চোখ দুটো কীরকম বড় বড় হয়ে যায়। লাল জবাফুল। দাঁত কিসকিস। হাত মুঠো। একবার এদিক ছুড়ছে, একবার ওদিক ছুড়ছে।"

"এদিক-ওদিক ছুড়ব না। ছুড়ব আপনার নাকে। থেবড়ে যাবে।"

"আরে মশাই, গাড়িটাকে কষ্ট করে টেনেটুনে টঙে না তুললে ঠেলে নীচে নামালেই হত। তা হলেও স্টার্ট নিয়ে নিত।"

"স্টার্ট-ফার্ট আমি জানি না মশাই, আমার ওপরে তোলা কাজ, তুলে ছেড়ে দিলুম। দেখিয়ে দিলুম, টারজান আপনি নন, টারজান আমি।"

ডি. এম. এসে ফিসফিস করে বললেন, "আপনারা কী নিয়ে আলোচনা করছেন? জানেন, এই জেলার সমস্ত সরকারি আলোচনা, এমনকী বেসরকারি সভাসমিতিও আমাকে ছাড়া হয় না। আমি, ধরুন পাঁচ বছর এসেছি এ-জেলায়, তিরিশটা সভায় সভাপতি হয়েছি। আমার স্ত্রী হয়েছেন সভাপত্নী।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন! সবই ঠিক বললেন, একটা শব্দ ভুল হয়ে গেল, সভাপত্নী নয় সভাপেত্নী!"

ডি. এম. শুনতে পেলেন না, বললেন, "ও সব একেবারে গ্রাহ্য করবেন না। ভাল কাজের সমালোচনা হবেই। ডু ইয়োর ডিউটি কাম হোয়াট মে। নিন, নিন, উঠুন উঠুন। এরপর ছাবড়িওয়ালের কাছে গেলে চা আর চানাচুর খাইয়ে হাতে একটা মিঠে পান ধরিয়ে ছেড়ে দেবে।"

ডি. এম. তড়বড় তড়বড় করে জিপে গিয়ে উঠলেন, "স্টার্ট, স্টার্ট।"

সুদর্শন বললেন, "গাড়ি তো চলছে না। স্টার্ট নিচ্ছে না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে! ওতে লজ্জার কিছু নেই।"

কমল ভৌমিক বললেন, "মিস্টার টারজান, জানেন তো উনি কানে কম শোনেন, টারজানের গলায় হেঁকে বলুন।"

সুদর্শন ভীষণ চিৎকার করে বললেন, "গাড়ি চলছে না স্যাররর।"

ভুরু কুঁচকে ডি. এম. বললেন, "চলছে না মানে, এই তো চলে চলে এতটা উঁচুতে উঠে এল। কী করে এল। নাও নাও, স্টার্ট, স্টার্ট।"

সুদর্শন বললেন, "মশাই, চলুন, আগে যে-কোনও জায়গায় গিয়ে একটা কানের যন্ত্র কিনে আনি, তা না হলে পাগল হয়ে যাব মশাই, পাগল।"

ড্রাইভার আসনে বসে বললে, "কই গড়া দিজিয়ে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "বাপস, হিন্দির কী ছিরি!"

সুদর্শন বললেন, "আরে মশাই, ও যে নেপালি!"

॥ ১৪ ॥

"ওঁর কানটাকে যদি কোনওরকমে মেরামত করানো যেত! এ এমন একটা দেশ, যেখানে না আছে গাড়ির মেকানিক, না আছে কানের মেকানিক। আমি এইবার পাগল হয়ে যাব।"

সুদর্শন খানিকটা নেচে নিলেন, তারপর চিৎকার করে বললেন, "এ-গাড়িটা ইঞ্জিনে চলেনি, এই যে, এই যে, এই ভদ্রলোক, কোমরে দড়ি বেঁধে, টেনে টেনে, ওপরে তুলেছেন।"

ডি. এম. জিপে ড্রাইভারের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে ছিলেন। তিনি কী শুনলেন কে জানে। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "ও, অমন হয়, কী আর করা যাবে বলুন! সময় সময় ডি. এম.-কেও হাঁটতে হয়, কষ্ট করতে হয়। অ্যাঃ, নিন উঠে পড়ুন। উঠে পড়ুন। এরপর ছাবড়িওয়াল আর খেতে দেবে না।"

সুদর্শন পরাজিত সৈনিকের মতো, পথের ধারে পাথরের ওপর বসে পড়লেন। "অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। এঁর এক্ষুনি পদত্যাগ করা উচিত। এত বড় একটা পোস্টে বসে থাকবেন, আর কিছুই কানে নেবেন না, তা তো হয় না। এভাবে শাসন চলে না।"

কমল ভৌমিক ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। সুদর্শনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ছোট কথা কানে নিলে দেশ শাসন করা যায় না বলেই বড় কানের মানুষকে চেয়ারে বসানো হয়েছে। ঠিক জায়গায় ঠিক লোক। শুধু শুধু চিৎকার না করে, এই যে ঘটনা আটকে গেছে, সেই ঘটনাকে ঠেলে গড়িয়ে আবার চালু করে দি।"

কমল ভৌমিক জিপের পেছনে দাঁড়িয়ে ডান পা দিয়ে স্রেফ একটু ঠেলে দিলেন। ঢালু বেয়ে জিপ গড়াতে লাগল। ডি. এম. সামনের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে, হাসতে হাসতে হাত নাড়লেন। যেন গুডবাই করছেন।

টিলার ওপর থেকে ঢালু হয়ে পথ চলে গেছে সামনে দূরে। একেবারে সোজা। ছাবড়িওয়ালের সিমেন্ট ফ্যাক্টরির গা দিয়ে, সেই সাংঘাতিক পাহাড়ে। যেখানে গিয়ে সহজে কেউ আর ফিরে আসতে পারে না।

সুদর্শন বললেন, "দিলেন তো গড়িয়ে! স্টার্ট তো হল না!"

"না হোক। ও গড়াতে গড়াতে পৌঁছে যাবে।"

উঁচু থেকে দেখতে বেশ লাগছে। জিপটা ছোট হতে হতে কেমন যেন খেলনার মতো হয়ে যাচ্ছে।

কমল ভৌমিক এইবার আদেশের সুরে বললেন, "আমাদের এখন অনেক

কাজ। একটা ঘটনা, আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকে দিন প্রায় কাবার করে এনেছি। যাক, এখন আমার মুক্তি। লেট আস স্টার্ট।"

সুদর্শন বললেন, "স্টার্ট! স্টার্ট বললেই স্টার্ট! কী স্টার্ট করবেন! জিপটাকে তো ঠেলে গড়িয়ে সরিয়ে দিলেন! মানুষে তো আর ইঞ্জিন নেই, যে সেলফ মারলেই স্টার্ট নেবে!"

"ওই যে বললেন, সেলফ, ওইটাই আসল জিনিস, ওইটাই আমাদের ইঞ্জিন।" সুকু এত রেগে গেছে। চোখ মুখ লাল। ভাল লাগে নাকি! বড়দের, বুড়োদের, এইসব ঘ্যানঘেনে, ঘিনঘিনে ব্যাপার। সুকু বললে, "আমি পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেছি। আমি আর নিতু এখন হাতি ধরে শহরে ফিরে যাব।"

কমল ভৌমিক অবাক হয়ে বললেন, "হাতি ধরে! হাতি ধরে মানে!"

"সন্ধের একটু আগে ওই পাহাড়ের দিকের জৈন মন্দির থেকে হাতি চেপে সব শহরে ফিরবে। তারই একটায় আমি আর নিতু চেপে বসব।"

"আর আমরা! বা রে মজা, আমরা তা হলে যাব কোথায়!"

সুদর্শন বললেন, "আর তোমার চিড়িয়াখানা! অত বড় একটা চিড়িয়াখানা, তুমি রাগ করে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে! শোনো, রাগ ভাল; কিন্তু যে রাগে মানুষের নিজের ক্ষতি হয়, সে রাগ ভাল নয়। রাগ করে তুমি একবেলা ভাত খেলে না। ঠিক আছে, খেলে না খেলে না। নো হার্ম। এক বেলা উপোসে শরীরটা বরং ভালই হল। রাগ করে লাভের জিনিস ছেড়ে দেওয়া, খুব খারাপ। অপরাধ।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তখন থেকে চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা করে আপনি অত লাফাচ্ছেন কেন? আপনার কী ইন্টারেস্ট!"

"আমার আবার কী ইন্টারেস্ট! আমি তো মশাই সত্যান্বেষী, ভাগ্যান্বেষী, যাযাবর। আমার আবার স্বার্থ কী!"

কমল ভৌমিক বললেন, "মশাই, আপনি কী ধরনের সত্যান্বেষী? আপনার একবার সন্দেহ হল না, একজন জেলাশাসকের কী এক্তিয়ার আছে, যে তিনি একটা সরকারি সম্পত্তি একটা ছেলেকে দিয়ে দেবেন! সরকারি দপ্তরটা কি তাঁর মামার বাড়ি?"

"তা হলে?"

"তা হলে আবার কী! এর পেছনে একটা রহস্য আছে। সেই রহস্য খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমি একা মানুষ। আমি কত খুঁজে বের করব। প্রথমে খুঁজতে হবে সেই হারিয়ে যাওয়া সায়েবকে। খুঁজতে হবে নেপিয়ারের চক্রকে। খুঁজতে হবে বেঁটেকে। সব কিছুর তো একটা সীমা আছে।"

সুকু বললে, "কমলদা, আর অনুসন্ধানের দরকার নেই। চলুন, আমরা পালাই।"

হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ। শহরের দিক থেকে আসছে। লাল রঙের জিপ। ওয়্যারলেস ভ্যান। দু'পাশে দুটো অ্যান্টেনা লটাকপটাক করে দুলছে। জিপটা রাস্তা বেয়ে গাঁগাঁ করতে করতে উঠে আসছে টিলার ওপর।

গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশের গাড়ি। একজন অফিসার, দু'জন কনস্টেবল। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "ডি.এম. কোথায়?"

সুদর্শন বললেন, "ওই যে, গড়গড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দিকে চলেছেন। আমরা দড়ি.দিয়ে টেনে তুলে, পা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছি। হাম নেই কিয়া। কিয়া ইন লোগ।"

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কে?"

সুদর্শন বললেন, "আমরা ডি. এম.-এর লোক।"

নিতু সুকুর কানে কানে বললে, "চ' ভাই, আমরা পালাই। আবার এক ঝঞ্ঝাট।"

কমল ভৌমিক বললেন, "অফিসার, ওভাবে সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাবেন না। আমি ব্যাখ্যা করছি। ডি. এম.-এর লোক মানে, আমাদের নিয়ে ডি. এম. যাচ্ছিলেন চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানাটা এই ছেলেটিকে দেওয়া হবে।"

অফিসার তড়াক করে নেমে এলেন, "আরে মশাই, ওই জন্যেই তো ছুটে এসেছি। এই পাগলা ডি. এম. আমাদের পাগল করে দেবে। এই, এই দেখুন, মন্ত্রীর চিঠি। টেলিগ্রাম : স্টপ ডি. এম.। ডি. এম. স্টপ। ডি. এম-কো রোকো।"

ঢালু বেয়ে লাল জিপ গড়গড়িয়ে নেমে গেল। ডি. এম.-কো রোকো।

সুদর্শন বললেন, "আমার ছোট্ট ভায়েরা, রাগ কোরো না সোনা। চলো, আমরাও ছাবড়ির কাছে যাই। খিদেও পেয়েছে। খেলাও জমেছে।"

॥ ১৫ ॥

সুদর্শন বললেন, "বাদ দিন মশাই। আমরা এতগুলো লোক বিনা নিমন্ত্রণে ওই কে এক ছাবড়িওয়ালের ওখানে গিয়ে নাই বা খেলুম। আমাদের একটা প্রেসটিজ আছে, তাই না! তার ওপর ডি. এম. বোধহয় এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে গেছেন।"

কমল ভৌমিক বললেন, "অ্যারেস্ট হবেন কেন? অমন একজন নাইস জেন্টলম্যান!"

"দেখলেন না স্পেশ্যাল পুলিশ ফোর্স ছুটল। কী সব সমাজবিরোধী কাজটাজ করে বসে আছেন!"

নিতু বললে, "আসলে ওঁর মাথার গোলমাল। ও কিছু না, দিন তিনেক থানকুনিপাতার রস খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সুদর্শন বললেন, "অসম্ভব। তোমার ওই কোবরেজি আমি মানতে পারলুম না। থানকুনিতে পেট ভাল হয়। আমি আমার কাকার কাছে শুনেছি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আর-একটা জিনিস শোনেননি, তাই এই জ্ঞানের প্রতিবাদ করছেন। মুড়ি আর ভুঁড়ি। পেটের সঙ্গে মাথা যুক্ত। এটা ঠিক হলে ওটা ঠিক হবে। ওটা ঠিক হলে এটা ঠিক হবে। এটা ঠিক হলে ওটা ঠিক হবে।"

সুকু বললে, "আমার রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে।"

সুদর্শন বললে, "তার মানে তোমার তেতো খাওয়ার দরকার। কালমেঘের রস।"

সুকু বেশ রেগে বললে, "আপনাদের প্রত্যেকের মাথায় লাগানো উচিত মধ্যমনারায়ণ তেল। সেই তখন থেকে হচ্ছেটা কী! আমি আর নিতু ওইদিকে চললুম।"

সুদর্শন বললেন, "ও মা, ওই দিক থেকেই তো এলুম আমরা। ওদিকে যাব কেন? উপনিষদ বলেছেন, 'চরৈবেতি', মানে এগিয়ে চলো। আমরা সামনেই যাব। যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ, তারাই পেছু হটে। আমাদের নীতি হল, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। চলো, চলো, এগিয়ে চলো। যেতে যেতে...।"

কমল ভৌমিক ভেংচি কাটলেন, "যেতে যেতে, কোথায় আমরা যাব? কোথায় যাব বলে বেরিয়েছি আমরা। ছোট ছেলেকে যা-খুশি তাই বলে নাচিয়ে দিচ্ছেন? বেলা পড়ে এল, একটু পরেই সন্ধে নামবে। আপনার না হয় বাড়ি-ঘরদোর নেই, যাবার জায়গা নেই। আমাদের আছে। আমরা এখন বাড়ি ফিরব।"

"ফিরব বললেই ফেরা যায়। ফিরবেন কী করে! শহর থেকে কত দূরে আছেন জানেন?"

"আমরা হেঁটে যাব। পায়দলে যাব।"

"পঞ্চাশ মাইল হাঁটবেন? মাথা খারাপ হয়েছে?"

"আমরা সব পারি। মনের জোর থাকলে মানুষ সব পারে। হেঁটে বিশ্বভ্রমণ করতে পারে। কলকাতা থেকে বাঁক কাঁধে তারকেশ্বরে যায়। কলকাতা থেকে তারকেশ্বর কত মাইল?"

"অত সব জানি না মশাই, এইটুকু জানি, সন্ধের পর এ-রাস্তায় মাঝে মধ্যে বাঘ বেরোয়।"

নিতু বলল, "বড়রা ভীষণ ঝগড়া করেন। আমার আর ভাল লাগে না বাপু।"

সুকু বললে, "সেই তখন থেকে শুরু হয়েছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তোমাদের বেশ মজা লাগছে না? সেই সকাল থেকে কেমন আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি?"

সুদর্শন বললেন, "আসুন, আমরা একটা ব্যাপারে একমত হই। আমরা একটা গাড়ি জোগাড় করি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "কীভাবে?"

"আমরা ওই সিমেন্ট কারখানায় যাই। কেমন? গিয়ে দেখি কী হয়?"

"কী আবার হবে? সেখানে গেলে ছাবড়িওয়াল প্লেটে করে একটা গাড়ি এগিয়ে দেবেন? আপনি কিন্তু আবার ঝগড়ার লাইনে চলে যাচ্ছেন। কখন কোথায় কার ভাগ্য খোলে কেউ কি বলতে পারে? আমি একবার সাহারা মরুভূমিতে আস্ত একটা উট পেয়ে গিয়েছিলুম। আর পেয়েছিলুম বলেই, আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি।"

"আবার গুল মারছেন? আপনি সাহার মরুভূমিতে কী জন্যে গিয়েছিলেন? কেউ যায় ওইরকম একটা থার্ড ক্লাস জায়গায়?"

"যাব কেন, পড়ে গিয়েছিলুম।"

কমল ভৌমিক হাহা করে হাসতে লাগলেন, "কোথা থেকে পড়েছিলেন?"

"আকাশ থেকে।"

"আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে, আমিই আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছি। আপনি আকাশে কী করতে উঠেছিলেন? চুনকাম করতে! হোয়াইট-ওয়াশ করতে?"

"আজ্ঞে না, আমি উঠেছিলুম প্লেনে। প্লেন যাচ্ছিল সাহারার ওপর দিয়ে আফ্রিকা। দুম ফটাস অ্যান্ড ধপাস।"

"কত সালে?"

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।"

"কে সাক্ষী?"

"খবরের কাগজ। আর সাক্ষী আমার এই ডান পা।"

সুদর্শন প্যান্ট গোটাতে লাগলেন। গভীর একটা কাটা দাগ একেবারে তলা থেকে ওপরে উঠে গেছে। খালের মতো।

কমল ভৌমিক বললেন, "বেঁচে গেলেন! আশ্চর্য, রাখে কেষ্ট মারে কে? তা গল্পটা বলুন।"

সুকু বললে, "এখন গল্প! আমরা দু'জনে তা হলে আসি।"

সুদর্শন বললেন, "হ্যাঁ, এসো।"

বলেই খেয়াল হল, কী বলছেন! সামলে নিয়ে বললেন, "না, এসো না। কোথায় যাবে? পাগল হয়েছ। বোসো এখানে। গোল হয়ে সব বোসো। সাংঘাতিক গল্প।"

হঠাৎ দেখা গেল দূরে একটা গাড়ি আসছে। পাহাড়ের দিক থেকে। সাদা গাড়ি। মাথায় নীল আলো। সবাই চুপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সুকুর ভেতরটা আনন্দে লাফাচ্ছে। গাড়িটা তার চেনা মনে হচ্ছে। সেন্ট টমাস হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স। বাবা ওই হাসপাতালেরই বড় সার্জেন। জয় ঠাকুর। গাড়িটা হুহু করে আসছে। মাথার ওপর নীল আলোটা দপদপ করছে।

আরও একটু কাছে আসতেই, সুকুর আর কোনও সন্দেহ রইল না।

"নিতু, আমাদের ফিরে যাবার ব্যবস্থা ভগবান করে দিলেন। আমাদের হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স।"

সুকু আর নিতু দু'হাত তুলে গাড়িটাকে থামাবার জন্য রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে পড়ল। সামনে ড্রাইভারের পাশের আসনে ফাদার পেরিয়ার। জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, "সুকু, মাই সান, হোয়াট ইউ আর ডুইং হিয়ার?"

"ফাদার, সে অনেক ব্যাপার। পরে বলছি। আমরা তোমার গাড়িতে যাব।"

"অ, শিয়োর। প্লিজ, গেট ইন।"

পেছনের দরজা খুলে একে একে সবাই উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। পেছনে অনেক জায়গা। কারওই বসতে অসুবিধে হল না। গাড়ি কিছু দূর যাবার পর, পেছনে পাহাড়ের দিক থেকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ ভেসে এল।

সুদর্শন বললেন, "কোথাও ডাকাতি হচ্ছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই সন্ধেবেলা ডাকাতি?"

"ডাকাতির কোনও সময় আছে মশাই! এ তো আর ছিঁচকে চুরি নয়। হাতে বন্দুক, মনে সাহস। মারো আর কাড়ো। ওদিক দিয়ে চলে গেছে রাঁচি, লোহারখানা রেললাইন। এই সময় একটা ট্রেন আছে। বড় বড় ব্যাবসাদাররা টাকা নিয়ে শহর থেকে ফেরে। ওই রেলেই ডাকাতি হচ্ছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "যাক গে, মরুক গে। আমরা যে ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরছি এই যথেষ্ট।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে সব ফিরি, তারপর বলবেন। সামনে বিশাল জঙ্গল।"

"জঙ্গল তো কী হয়েছে! আমরা তো দিব্যি আরাম করে গাড়ির ভেতরে বসে আছি। আমাদের কী আর এমন ভয়?"

আবার কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ।

সুদর্শন বললেন, "খুব জমিয়ে ডাকাতি হচ্ছে। এখানে আবার জানেন তো, ডাকাতরা ঘোড়ায় চেপে আসে, যেন ইংরেজি সিনেমা।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আর ডাকাত ডাকাত করবেন না তো। আমার আর ভাল লাগছে না। আপনার সেই সাহারার গল্প বলুন।"

"গল্প নয় মশাই, সত্য ঘটনা। রোমহর্ষক রোমাঞ্চ। কোনও বাঙালির জীবনে ঘটেনি। ধুন্ধুমার লড়াই বেধে গেছে। আর আমি যাচ্ছি আফ্রিকা।"

"কেন যাচ্ছেন?"

"উকিলের মতো অত জেরা করলে বলব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা বলুন, বলুন। আর প্রশ্ন করব না।"

"আমাদের প্লেন আক্রান্ত হল।"

"কেন হল? ও সরি, সরি। প্রশ্ন তো চলবে না।"

"ছর্ ছর্ মেশিনগানের গুলি। ব্লক করে আগুন ধরে গেল। আমি বেল আউট করলুম।"

"আর পাইলট।"

"আমিই তো পাইলট।"

"থাক, থাক, আমি আর শুনতে চাই না। ওসব গুলগাপ্পা আমার আর ভাল লাগে না। অনেক বয়েস হয়েছে মশাই।"

"আবার গুল বলছেন?"

"তা ছাড়া কী? একজন পাইলটের এই অবস্থা হয়?"

"কী অবস্থা? কী এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে আমার!"

নিতু বললে, "বাবা রে, আর তো পারা যায় না। কথায় কথায় ঝগড়া।"

সুকু বললে, "সাহারা সাহারাতেই থাক। আমরা বরং গান গাই। সন্ধে হয়েছে।"

॥ ১৬ ॥

নিতু যে কত ভাল গান গায়, সুকু সেইদিন বুঝতে পারল। মনে মনে ভাবল, এমন যার গানের গলা, তার আর ভাবনা কীসের! নিতু গাইছে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। সুকু গলা মিলিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমল

ভৌমিকের গলা পড়ল। সুদর্শন আর থাকতে পারলেন না। তিনিও সুর মেলালেন। সাহারার প্লেন ভাঙার গল্প ধামাচাপা পড়ে গেল।

মিশনের অ্যাম্বুলেন্স পাহাড়ি পথ ধরে হু হু করে ছুটেছে। চারপাশে বন। কেউ কোথাও নেই। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একটু পরেই হায়েনা বেরোবে, বনবিড়াল, মাঝে মধ্যে চিতাবাঘও নেমে আসে। লোকে বলে চিতাবাঘ, আসলে গুলবাঘ। গাড়ি চলেছে। গান জমে উঠেছে খুব। পরশমণির পর নিতু ধরেছে, তোমার অসীমে। একসময় কমল ভৌমিক প্রশ্ন করলেন, "নিতু, কোথা থেকে তুমি এমন সুন্দর গান শিখলে?"

"শুনে শুনে।"

সুদর্শন বললেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এসব পূর্বজন্মের সাধনা। এই যে আমি এত ভাল লিখি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "চুপ করুন। প্লিজ স্টপ। আপনি মোটেই ভাল লেখেন না। আপনার কোনও পূর্বজন্ম নেই।"

"পূর্বজন্ম নেই? এমন একটা অবৈজ্ঞানিক কথা, দুম করে এই ভর সন্ধেবেলা বলতে পারলেন? জানেন আপনি মানুষ কীভাবে জন্মায়।"

"আমার জেনে দরকার নেই।"

"ছি ছি ছি, অজ্ঞান হয়ে থাকতে চান! নলেজ...।"

"বাস, বাস, চুপ। নো মোর কথা।"

"বেশ, আমি এই ছেলে দুটোকে শেখাই, আপনি কান বন্ধ করে থাকুন।"

"ওরাও শুনবে না। পূর্বজন্মের কথার মধ্যে কোনও বিজ্ঞান নেই।"

"কোনও বিজ্ঞান নেই! জাতিস্মরের কথা শোনেননি। প্যারাসাইকোলজি কাকে বলে জানেন?"

"জেনে দরকার নেই। আমি প্যারালিসিস জানি, ওই যথেষ্ট।"

"প্যারালিসিস আর প্যারাসাইকোলজিতে আকাশপাতাল তফাত।"

"চুপ করুন।"

'করব না।"

"গাড়ি থেকে নামিয়ে দোব।"

"গাড়ি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমার।"

"গা-জোয়ারি কথা বলবেন না।"

নিতু বললে, "আবার আপনারা শুরু করলেন? দেখুন তো, আমরা ছোট, আমরা কী সুন্দর আছি।"

সুকু বললে, "ভয় নেই, বেশিক্ষণ চালাতে হচ্ছে না। আমরা এসে গেছি। ওই তো দৈত্যপাহাড় দেখা যাচ্ছে।"

নিতু বললে, "দৈত্যপাহাড় মানে? খুব বড় পাহাড়?"

"পাহাড় তেমন বড় নয়। সবাই বলে, ওখানে একটা দৈত্য থাকে। বছরে একবার কালীপুজোর দিন অমাবস্যার ঘোর রাতে তাকে দেখা যায়। সে হাঁ করলেই মুখ দিয়ে ভক ভক করে আগুন বেরোয়।"

সুদর্শন বললেন, "আমি দেখতে যাব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "মরার ইচ্ছে হয়েছে বুড়ো বয়েসে!"

"দৈত্য আপনি বিশ্বাস করেন?"

"আপনি পূর্বজন্ম বিশ্বাস করতে পারেন, আর আমি দৈত্য বিশ্বাস করতে পারি না?"

"কুসংস্কার।"

"পূর্বজন্মও কুসংস্কার।"

নিতু বললে, "আবার শুরু হল।"

হঠাৎ সুদর্শন ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলেন। থরথর করে কাঁপছেন।

কমল ভৌমিক বললেন, "এ আবার কী।"

সুদর্শন কোনওমতে বললেন, "অ্যাটাক।"

আর বলতে পারলেন না, কাঁপতে কাঁপতে দুমড়ে মুচড়ে ধীরে ধীরে সিট থেকে নীচের দিকে পড়তে লাগলেন।

কমল ভৌমিক তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আরে আরে, সত্যিই যে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মুখের চেহারা অস্বাভাবিক। চোখ দুটো উলটে আসছে। গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও।"

সুকু হাত তুলে বললে, "আমরা চ্যাপেলে ঢুকছি। পাশেই হাসপাতাল।"

কমল ভৌমিক বললেন, "হে ঈশ্বর, এমন মানুষটাকে নিয়ে নিয়ো না। বড় সুন্দর মানুষ।

অ্যাম্বুলেন্স থেমে পড়ল। গির্জার চূড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথার ওপর ধকধক করছে একটা তারা। পরিষ্কার ঝকঝকে সিমেন্ট বাঁধানো পথ। সুকু নিমেষে দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল।

সাদা গাউন-পরা ফাদার নেমে এসেছেন। নিতু নেমে এসেছে। কমল ভৌমিক সুদর্শনকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। ফাদার সুকু আর নিতু ছুটল মিশন হাসপাতালের ওদিকে। ফাদার ছুটতে ছুটতে বললেন, "সুকু ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, রিং ইয়োর ফাদার। তোমার বাবাকে ফোন করো। আমি স্ট্রেচার দেখছি।"

সুকু হাসপাতালের রিসেপশানে গিয়ে ফোন তুলে নিল। মা ধরেছেন, "কে বলছিস, সুকু! কী আশ্চর্য ছেলে! সারাটা দিন ভেবে ভেবে... তোর কবে বুদ্ধি হবে!"

"মা তুমি আমাকে পরে বোকো, আগে শিগগির বাবাকে দাও।"

ডক্টর মুখার্জি ফোন ধরলেন, "কে সুকু, কী বলছিস?"

"তুমি শিগগির মিশন হসপিটালে চলে এসো। এখন আর কোনও কথা নয়।"

সুদর্শনের কাঁপুনি বন্ধ হয়নি। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। একপাশে ফাদার, চারপাশে সিস্টার। ডাক্তার মুখার্জি রুগিকে পরীক্ষা করছেন। মুখ ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে। নিতু আর সুকু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আশ্চর্য! এ তো ভারতীয় অসুখ নয়। এ-অসুখ দেখা যায় একমাত্র সাহারা মরুভূমির বেদুইনদের মধ্যে।"

কথা বলতে বলতে ডক্টর মুখার্জি কনসালটেশন রুমে এসে বসলেন।

"এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কী করে!"

প্রশ্নটা কমল ভৌমিককে।

কমল বললেন, "তা হলে গোড়া থেকে বলি। একটু সময় লাগবে।"

সুকু বললে, "না, না, সে অনেক সময় লাগবে, আমি ছোট করে বলি, সুদর্শনকাকু একজন সরকারি গোয়েন্দা, রহস্য-রোমাঞ্চ লেখেন। আসল নাম জানা নেই। ছদ্মনাম সুদর্শন।"

"আমার প্রথমেই জানা দরকার, ভদ্রলোক কি সাহারা ডেজার্টে বেশ কিছু দিন ছিলেন। তা না হলে আমার রোগবিচারকে অন্য রাস্তায় চালাতে হবে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আসতে আসতে উনি বলছিলেন, সাহারায় প্লেন ভেঙে পড়ে গিয়েছিলেন একবার। তা আমরা গুলগাপ্পা বলে থামিয়ে দিয়েছিলুম সে গল্প। আর শুনতে চাইনি।"

নিতু বললে, "দেখলেন তো, মানুষকে অবিশ্বাস করা উচিত নয়। বলা কি যায়, কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে!"

ফাদার বসেছিলেন ডক্টর মুখার্জির ডানপাশে। গালে হাত রেখে। নিতু দেখছিল আর মনে মনে ভাবছিল, কী সুন্দর দেখতে! ফরসা টকটকে রং। উঁচু নাক। নীল কাচের মতো চোখ। মানুষ এত সুন্দর হয় কী করে! গলার স্বরটা কত মধুর!

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "সাহারা ডেজার্টে এক ধরনের ছোট ছোট মাছি থাকে। খানিকটা সোনালি, খানিকটা নীল। দেখলে মনে হবে কত সুন্দর জীব। কিন্তু বড় সাংঘাতিক প্রাণী। প্রতিটি কামড়ে মানুষের শরীরে একটু করে বিষ

ঢুকিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম দুর্বল হতে হতে একসময় অকেজো হয়ে যায়।”

ফাদার বললেন, “এত দিন পরে আফ্রিকান সিকনেস। আফটার সো মেনি ডেজ!”

“না, না, আমার মনে হয় প্রথম আক্রমণটা সামলে উঠেছিলেন কোনওরকমে, দিস ইজ সেকেন্ড অ্যাটাক। এই যে দেখছেন কাঁপুনি, কাঁপতে কাঁপতে রুগি একসময় চলে যাবে গভীর ঘুমের কোলে। সে ঘুম আর ভাঙবে না।”

কমল ভৌমিক বললেন, “সে কী! এর কোনও চিকিৎসা নেই!”

ফাদার উত্তর দিলেন, “আছে। প্রার্থনা।”

“প্রার্থনায় অসুখ সারবে? তা হলে মানুষ মরে কেন?”

“প্রার্থনা ঠিক হয় না বলে। আমার জীবন দিয়ে আমি প্রার্থনার শক্তি যাচাই করেছি। আমাকে একবার ব্ল্যাক কোবরায় কামড়েছিল।”

কমল ভৌমিক বললেন, “কালো কেউটে? আপনি বেঁচে আছেন? সত্যি আপনি বেঁচে আছেন?”

“আমি আপনার সামনে বসে আছি।”

“না, মানে এমন কোনও প্রমাণ আছে, যে, আপনিই সেই, যাকে সাপে কামড়েছিল। এমনও তো হতে পারে, আপনি জানেন না, আপনাকে বদলে দিয়েছে।”

ফাদার মুচকি হাসলেন। হেসে বললেন, “অবিশ্বাসীদের মাথা খুব উর্বর হয়। এর চেয়েও অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা তাদের মাথায় আসে।”

ডক্টর মুখার্জি বললেন, “আমি এই ভদ্রলোকের ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতুম, কিন্তু কে ঝুঁকি নেবে! এঁর আত্মীয়স্বজন কেউ থাকলে একটা বন্ড লিখিয়ে নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেত।”

ফাদার বললেন, “কেন? যা করবেন, তাতে কি পেশেন্টের ভাল না হয়ে খারাপ হতে পারে?”

“পারে। তবে ভাল হবার চান্সই বেশি। ধরুন, এইটটি টোয়েন্টি চান্স।”

কমল ভৌমিক বললেন, “বেশ, তা হলে এক কাজ করা যাক। ভদ্রলোকের পকেট সার্চ করে, কাগজপত্র সব বের করে, দেখা যাক, লোকটি কে। লোকটি কে জানা হলে পর, খোঁজ করা হোক বাড়ি কোথায়। বাড়ি কোথায় জানার পর সেখানে পাঠানো যাক টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম পেলেই এসে যাবেন আত্মীয়স্বজন।”

ডক্টর মুখার্জি হাসলেন, “ঠিক অতটা সময় পাওয়া যাবে না। তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।”

ফাদার বললেন, "অল রাইট, ইউ ক্যারি অন। আপনি শুরু করে দিন, আমি পুলিশকে জানিয়ে রাখছি।"

শহরের বাইরে অনেকটা দূরে দৈত্যপাহাড়ে যাবার পথে টিয়াসাঁকোর ধারে আলম বলে একটা লোক থাকে। টিয়াসাঁকো কেন বলে? তলা দিয়ে পুঁচকে একটা নদী চলে গেছে। গ্রীষ্মে জল থাকেই না। গোল গোল পাথর গড়াগড়ি যায়। সুকুরা সেই সময় দল বেঁধে আসে। নানান রঙের বড়-ছোট পাথর কুড়োতে। এই পাথরের ব্যাপারে একটা গল্প এখানে চালু আছে। লোকে বিশ্বাসও করে। বহুকাল আগে মুঙরুর দাদি এক গ্রীষ্মের দুপুরে এই নদী থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বেশ বড় সুপুরি মাপের একটা হিরে। সেই থেকে মুঙরুরা কী বড়লোক হয়ে গেছে। বাপস। পাহাড়ের ধারে কেল্লার মতো বাড়ি করেছিলেন মুঙরুর দাদি। আবার সেই হিরেটা মুঙরুদের ভাগ্য কী ফেরানোই না ফিরিয়েছিল। শুধু টাকা, মুঙরুরা শিকার ছেড়ে লেখাপড়া শিখে, বিলেত টিলেত গিয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল। ইংরেজ আমলে বাড়িতে সায়েম-মেম এসে ভোজ খেত। তারপর মুঙরুর এক দাদা স্বদেশি করলেন, তখন আবার বোম্বাই থেকে দিল্লি থেকে বড় বড় নেতারা আসতেন। আর মুঙরু এখন থেকেই চেষ্টা করছে। এম. এল. এ. সে হবেই। তা সেই থেকে ওই নদী শুকোলেই পাথর খোঁজার ধুম পড়ে যায়। কেউ বলে না যে হিরে খুঁজছি। সবাই বলতে পারে, কী বোকা! গত সত্তর-আশি বছরে আর একটাও হিরে কেউ পায়নি।

সবাই বলে, আমরা অ্যাকোরিয়ামের জন্যে পাথর খুঁজছি। আমরা আমাদের বাগানে ক্যাকটাসের পাহাড় করব। এইসব বলে। সুকুর গভীর বিশ্বাস, সে একদিন একটা হিরে পাবেই পাবে। স্বপ্নে দেখেছে। আজকাল সাঁকোর তলায় পাথর খোঁজা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওখানে ঝাঁক ঝাঁক টিয়াপাখি বাসা বেঁধেছে। অ্যায়সা ঠোকরান ঠোকরায়, মাথা ছ্যাঁদা করে দেয়। টিয়ার জন্যেই নাম হয়েছে টিয়াসাঁকো।

সাঁকোর ধারে ভাঙাচোরা ভুতুড়ে একটা বাড়িতে আলম থাকে। কেউই ঠিকমতো বলতে পারে না, আলম কে। কোথা থেকে এল। যে বাড়িতে আছে, সেই বাড়িটা কার? বাড়িটা অমনই বা কেন? এপাশে-ওপাশে ছড়ানো। একটা দিক উঁচু, একটা দিক নিচু। এখন বনবাদাড় হয়ে গেছে। বড় বড় গাছে দিনের বেলায় বাদুড় ঝোলে। রাতের দিকে একের পর এক হুস হুস করে উড়ে যেতে চায়। আলমের কেউ কোথাও নেই। সে একা ওই বিকট, বিশ্রী বাড়িটায় থাকে। তার চেহারা অদ্ভুত। তার পোশাক অদ্ভুত। আলম কারও সঙ্গে মেশে না। সবাই জানে, তার একটা ঝকঝকে তরোয়াল আছে। সবাই দেখেছে, সে মাঝে

মাঝেই তার ওই বিদঘুটে বাড়ির ছাদে নেচে নেচে পাগলের মতো তরোয়াল ঘোরায়। কেউ ওই পথে যেতে যেতে দেখতে পেলে থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে তাকে হয়ই। অমন দৃশ্য ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। মধ্যযুগের তুর্কি সৈন্যদের মতো পোশাক পরে আলম একা একা তরোয়াল খেলছে। মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করছে, যেন প্রতিদ্বন্দীর বুকে তরোয়ালটা গেঁথে দিচ্ছে, আর হাহা করে হাসছে। সবাই জানে আলমের একটা বর্শা আছে। মাঝে মাঝে করে কী, সুলতানের আস্তাবলে গিয়ে সাদা একটা ঘোড়া ভাড়া করে। তুর্কি সৈন্যের পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বর্শা উঁচিয়ে তিরবেগে ছুটে যায়, সেন্ট জেমস চ্যাপেলের সামনের রাস্তা দিয়ে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে সার্কিট হাউস পেছনে ফেলে সোজা উত্তরে বনপাহাড়ের দিকে।

সুকু একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "লোকটি কি পাগল?"

বাবা বলেছিলেন, "না, পাগল নয়। লোকটি রোম্যান্টিক। আলম মাঝে মাঝে অতীতে চলে যায়। সত্যি সত্যি চলে যায়। অভিনয় নয়। এটাকে অসুখ বললে অসুখ। সারভেনটিসের 'ডন কুইজোট' পড়লে বুঝতে পারবে।"

সেই আলমের কাছে কী আছে! সুদর্শনের এই অদ্ভুত অসুখের সঙ্গে আলমের কী সম্পর্ক! শহরের আলো, লোকজন, সব বহু দূরে পড়ে আছে। ডাক্তারবাবুর গাড়ি অন্ধকার পথে হেডলাইট জ্বেলে হুহু ছুটছে। ড্যাশবোর্ডের আলোয় সুকুর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কপালে এসে পড়েছে ঝুমকো চুল। টিয়াসাঁকো পেরিয়ে গেল। আলমের বাড়ি এগিয়ে আসছে। এদিকে জনপ্রাণী নেই। একটা শেয়াল গাড়ির আলোয় ভয় পেয়ে আবার জঙ্গলে পালাল। টিইট, টিইট করে কী একটা ডাকছে। এক ধরনের পোকা আছে ডাকলে মনে হয় কাঠে করাত চালাচ্ছে। সুকুর ভয়টয় নেই, নিতুর বেশ ভয় ভয় করছে। কমল ভৌমিক একবার কেবল বললেন, "অনেকটা আফ্রিকার মতো লাগছে।"

সুকুর মনে হল, এই কথাটা সুদর্শনের সামনে বললে সহজে পার পেতেন! এখনই তর্ক জুড়ে দিতেন, আপনি আফ্রিকা গেছেন? সেই মানুষটি এখন ঘুমে অচৈতন্য। গাড়ির আলোয় বিরাট একটা টিলা হুহু করে এগিয়ে আসছে। সুকু ভিতু নয়, তবু সুকুরও শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। সে একবার বাবার মুখের দিকে তাকাল। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে বাবা। হাতের আঙুলের হিরের আংটি মাঝে মাঝে ঝিলিক মারছে। একপাল শেয়াল দূরে সমস্বরে ডেকে উঠল।

নিতু ফিসফিস করে কমল ভৌমিককে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ভয় করছে না?"

কমল ভৌমিক বললেন, "করবে না, খুব করছে।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "এখনও তো ভয়ের জায়গা আসেনি, এইবার আসছে।"

॥ ১৭ ॥

গাড়ি ডান দিকে বাঁক নিল। বিশাল একটা পিপুলগাছ রাতের বাতাসে শনশন করছে। পথের ঢাল বেয়ে গাড়ি অনেক নীচে নেমে পড়েছে। চাকায় পাথর মাড়ানোর শব্দ হচ্ছে। ডানপাশে ছোট্ট একটা টিলা। পাহাড় হতে চেয়েছিল, শৈশবেই থেমে পড়েছে। মনে হয় আর পাথর পায়নি বলেই এই অবস্থা। সামনে এগোতে গাড়ির বেশ কষ্ট হচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি ছোট ছোট পাথরে চাকা হড়কে যাচ্ছে। আরও কিছুটা ওইভাবে গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ থামতেই বোঝা গেল, চারপাশ কত নিস্তব্ধ। রাতের একটা নিজস্ব সিনসিন শব্দ আছে।

ডক্টর মুখার্জি ড্যাশবোর্ড খুলে পাঁচ সেলের একটা টর্চ বের করলেন। তারপর পেছনে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "যাদের ভয় করবে, তারা গাড়িতেই বসে থাকুক।"

কমল ভৌমিক কুটুস করে নিতুর হাতে একটা চিমটি কাটলেন। নিতু কলের গানের মতো বেজে উঠল, "কাকু, আমাদের কোনও ভয়ডর নেই।"

ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ কাকু বলে ফেলে নিতুর ভীষণ ভাল লাগল। ডাক্তারবাবু বাঁ হাত বাড়িয়ে নিতুর ন্যাড়া মাথাটা আদর করে নেড়ে দিলেন। বললেন, "ভেরি গুড, ভেরি গুড।"

গাড়ি থেকে সবাই একে একে নেমে পড়ল। সবার আগে ডাক্তার মুখার্জি, তারপর নিতু, তারপর সুকু, সব শেষে কমল ভৌমিক। লাইনটা এইভাবেই সাজিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। সামনে বড়, পেছনে বড়, মাঝে দু'জন ছোট। কেন এমন করলেন, কেউ তেমন বুঝল না। ডাক্তার মুখার্জি জানেন জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। একেবারে নির্জন। দূরে ঘন জঙ্গল। ছোট ছোট টিলা। ছোট পাথর, মাঝারি পাথর, গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর ছড়িয়ে আছে চারপাশে। সাপের অভাব নেই। মাঝে মাঝে হায়েনা বেরোয়। বড় ধূর্ত জীব। প্রায়ই এই অঞ্চল থেকে দুটো-একটা হায়েনা-কামড়ের কেস আসে।

বাতাস থেমে আছে। প্রকৃতি স্তব্ধ। টিক-টিরির, টিক-টিরির করে কী একটা ডাকছে। হতে পারে রাতচরা কোনও পাখি। পাতলা চাদরের মতো সেই

স্তব্ধতা। ওই শব্দ যেন ফুটো ফুটো হয়ে যাচ্ছে। যেন অদৃশ্য কোনও জায়গায় বসে এক স্যাকরা ঠুকঠুক করে সোনার গয়না গড়ছে।

টর্চের মুখে হাত আড়াল করে ডাক্তারবাবু টর্চের বোতাম টিপলেন। একঝলক আলো উপচে পড়ল সামনের পথের ওপর। সাদা সাদা পাথর যেন হেসে উঠল খিলখিল করে। সবার শেষে কমল ভৌমিক। তিনি ফিরে ফিরে পেছনপানে চাইছেন। বলতে পারছেন না। কিন্তু বেশ ভয় ভয় করছে। সেই আকাশে হাতের পাঁচটা আঙুলের মতো অস্পষ্ট একটা আলোর আভাস লেগে আছে। এই অঞ্চলের এইটাই এক বিস্ময়। কেউ জানে না, কেন এমন হয়। সবাই বলে ওইটা দেখা গেলেই বুঝতে হবে, একটা কোনও বিপদ আসছে। সাবধান হতে হবে। গত বছর থেকেই মহাজনটুলিতে একটা চাপা অসন্তোষ ঘোঁট পাকাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দু'দলে মারামারি হয়। মানুষ খুন হয়। পুলিশ এসে লাঠি আর গুলি চালায়। শান্ত করার চেষ্টা হয়েছে অনেক। অনেকরকম উসকানিতে কাজের কাজ ঘোড়ার ডিম হয়।

আকাশের তলার দিকে আলোর পাঁচ আঙুলের দিকে কমল ভৌমিকের ঠিক নজর পড়েছে। বললেন, "কী আশ্চর্য, ওটা আবার কী?"

ডাক্তারবাবু সামনের দিক থেকে বললেন, "ভেরি ব্যাড সাইন। খুব খারাপ একটা ইঙ্গিত। কোনও একটা বিপদ আসছে।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি! সেই বিপদ কি এক্ষুনি আসবে?"

"এক্ষুনি আসবে কি না বলতে পারছি না। তবে যে বিপদের কথা বলছি, তা একজন-দু'জনের ভাগ্যে আসবে না, আসবে এই এলাকার সকলের ওপর। ছেচল্লিশে একবার, পঞ্চাশে একবার, সাতান্ন সালে একবার আকাশে ওই সংকেত দেখা গিয়েছিল।"

"তখন কি সব হয়েছিল?"

"ছেচল্লিশে হয়েছিল দাঙ্গা। পঞ্চাশে হয়েছিল দুর্ভিক্ষ। সাতান্নতে হয়েছিল দাঙ্গা।"

"আবার দাঙ্গা?"

"এ-দেশে দাঙ্গা হলেই হল। উসকানি দেবার লোকের তো অভাব নেই।"

"বাবা! তা হলে কী হবে?"

"কী আবার হবে। যা হবার তা হবে।"

সবাই সিংহদ্বারের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। নিতু মাথা উঁচু করে দেখল। কী বিরাট। কী উঁচু।

সুকু বললে, "একসময় এর তলা দিয়ে হাতি যেত, ঘোড়া যেত।"

"কোন রাজার রাজবাড়ি ছিল এটা সুকুদা?"

"শুনেছি বিশালগড়ের মহারাজার বাবা এইখানে থাকতেন।"

"ধ্যাস! ডাক্তার মুখার্জি শব্দ করলেন।

সবাই চুপ হয়ে গেল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ডক্টর মুখার্জি টর্চের মুখে হাত আড়াল করে আবার টর্চের বোতাম টিপলেন। আলো উপচে পড়ল। নুড়ি-বিছানো পথ সামনে চলে গেছে। এক সময়ের হাতিশাল, ঘোড়াশাল, ভগ্নস্তূপ। একপাশে পড়ে আছে বিশাল দুটো লোহার চাকা। চাকা দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে নানা ধরনের লতা। একটা অর্জুনগাছ সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। ডালপালা আকাশের গায়ে কী যেন খুঁজছে।

"পা টিপে টিপে," ডাক্তারবাবু নির্দেশ দিলেন।

যতই সব পা টিপে টিপে চলুক, পাথরে আর জুতোতে শব্দ হবেই। কমল ভৌমিক বললেন, "এত সাবধান হবার কী আছে বলুন তো?"

"আছে, একটু পরেই বুঝতে পারবেন।"

সিংহদুয়ার থেকে মূল বাড়ি কম দূর নয়। এক মাইলও হতে পারে। একটা সেকেলে গাদা-কামান মুখ উঁচিয়ে আছে। দু'পাশে দুটো লোহার গোলা। কামানের নীচে ভাঙা একটা বেদিতে একজোড়া লোহার নাগরাই জুতো। তরোয়ালের মতো শুঁড় উঁচিয়ে আছে। আজব জিনিস। নিতু অবাক হয়ে দেখছে। এ আবার কী রে ভাই! এ মনে হয় ভূতের জুতো। গভীর রাতে কেউ পায়ে দিয়ে বেড়াতে বেরোয়। অশরীরী কেউ।

নিতুর ভাবনা মনে হয় ডাক্তারবাবু শুনতে পেলেন। ফিসফিস করে বললেন, "এই কামান আর লোহার নাগরা দু'পাটি দেখে রাখো। গল্প আছে। পরে বলব। অলৌকিক।"

কমল ভৌমিক বললেন, "অলৌকিক! মানে একটু ভূত জাতীয়?"

"হ্যাঁ, একটু ভূতের ভাব আছে।"

"তা হলে দিনের বেলায় বলবেন। আমি তো কলকাতার ছেলে, কলকাতায় ভূত জিনিসটা নেই। ম্যালেরিয়াও ছিল না, আবার এসেছে।"

"ভয় নেই, তা হলে ভূতও আবার আসবে। ম্যালেরিয়ায় ধরলে কাঁপে, ভূতে ধরলেও কাঁপে। এবার চুপ। আর কথা নয়।"

সবাই মিলে আবার এগোতে লাগলেন পা টিপে টিপে। হঠাৎ দূরে সাদামতো কী একটা বড় জন্তু এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে চলে গেল। বেশ বড় সাইজের একটা কুকুর।

কমল ভৌমিক বললেন, "ওই দেখুন।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ভয় নেই, ওটা আসল নয়, নকল।"

"তার মানে?"

"মানে ওর শরীর নেই। গুলি করলে মরবে না।"

"অশরীরী?"

"সে যে যেমন মানে করে।"

কমল ভৌমিকের হাঁটার গতি বেড়ে গেল। পেছন থেকে সরে সামনে ডাক্তারবাবুর পাশে চলে এলেন। কয়েক পা হেঁটে বললেন, "বিশেষ ক্ষতিকর নয় তো?"

"আমাদের কিছু করবে না, তবে চোর-ডাকাত হলে রেহাই পাবে না।"

কমল ভৌমিক নিতুকে ফিসফিস করে বললেন, "ওটা মনে হয় ভূতই, বুঝলে নিতু?"

নিতু বললে, "কুকুর-ভূতকে কুকুররাই ভয় করবে, আমাদের কী? আমরা তো মানুষ।"

ভাঙা প্রাসাদের পেছন দিকে কোথাও একটা কুকুর কেঁদে উঠল। সে এমন ডাক, গা হিম হয়ে যায়। সুকুর মতো সাহসীরও পা থমকে গেল। নিতুর এতক্ষণ বেশ মজা লাগছিল। কুকুরের কান্না শুনে তারও কাঁদতে ইচ্ছে হল। এত ভয় তার কোনওদিন করেনি। বুকের বাঁ পাশটা ভয়ে ঢিবঢিব করছে।

ডাক্তারবাবু কমল ভৌমিককে বললেন, "ডাকটা শুনে রাখুন। এরও একটা ইতিহাস আছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "পৃথিবীটা দেখছি ইতিহাসে ভরা। ইতিহাস না জানলে কিছুই হয় না।"

ডাক্তারবাবু সামান্য শব্দ করে হাসলেন, ভগ্ন প্রাসাদের দুয়ারদেশে এসে চারজনে থমকে দাঁড়ালেন। বিশাল বিশাল স্তম্ভের মাথায় ভাঙা ছাদ ঝুলে আছে। বটের শিকড় জড়িয়ে ধরে আছে, তা না হলে কবে সব খুলে পড়ে যেত। এর ভেতরে যেতে হবে ভেবে কমল ভৌমিক বেশ ঘাবড়ে গেলেন। খুব নিচু স্বরে বললেন, "একটা কলিং বেল থাকলে বেশ হত।"

ডাক্তারবাবু হাতের চেটো আড়াল করে টর্চের বোতাম টিপলেন। আলো উপচে পড়ল। কিছু দূরে রকের ধারে যেন দুটো হিরে জ্বলছে। কমল ভৌমিক বললেন, "আরেব্বাস, হিরে।"

শান্ত গলায় ডাক্তারবাবু বললেন, "হিরে, তবে আর এগোবেন না, ছোবল মারবে।"

"সাপ?"

"চুপ। শব্দ নয়।"

টর্চের আলোয় কিছুক্ষণ থমকে থেকে, মুখ ঝুলিয়ে রকের গা বেয়ে সাপটা মসৃণ গতিতে নামতে লাগল। কুচকুচে কালো। চকচকে ইস্পাতের মতো শরীর। নামছে তো নামছেই। কত যে বড়। কমল ভৌমিক ভয়ে নিতু আর সুকুর গা

ঘেঁষে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন, "কামড়াবে না তো!"

ডাক্তারবাবু চাপা গলায় বললেন, "চুপ।"

বুনো লতা আর শুকনো পাতার ভেতর দিয়ে সাপটার চলে যাবার খসরমসর শব্দ হচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, রক থেকে নেমে সাপটার গতিপথ বাঁ দিকে, যেদিকে ঢিবির মতো পড়ে আছে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই কমল ভৌমিক বললেন, "আমি এইবার একটা কোশ্চেন করতে পারি? মানে বিপদটা তো চলে গেছে। আপনার কি মনে হয় এই কেল্লার মধ্যে কেউ আছে?"

ডাক্তারবাবু খুব ধীর গলায় বললেন, "আছে কমলবাবু। না থাকলে আমি আসব কেন?"

"না, মানে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো।"

"এটা হল প্রাসাদের বারমহল। বারমহলের পর অন্দরমহল। অন্দরমহলের পর নামাজখানা। আমাদের যেতে হবে সেই নামাজখানায়।"

"অ্যাঁ, বলেন কী!"

"ভয় পাচ্ছেন? আপনি না ব্যায়ামবীর!"

"আসলে কী জানেন, জুডো, ক্যারাটে, কুংফু এসব তো আর ভূত-প্রেত সাপখোপের ওপর চলবে না।"

"মনের জোর তো চলবে। চলুন। ফরোয়ার্ড মার্চ।"

ডাক্তারবাবু ধীর পায়ে রকে উঠলেন। একটা ইট পায়ের চাপে খসে পড়ল। শুকনো পাতায় মচ করে শব্দ হল। বললেন, "ভয় পেয়ো না। এইরকম দু'-চারটে ইট মাঝে মাঝে খসে পড়তে পারে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "মাথায় পড়বে না তো!"

"ধরে নিন পড়বে না।"

কোথায় কী ধরনের কোন মাপের ঘর ছিল, এখনও বেশ বোঝা যায়। একসময়ের রাজকীয় ব্যাপার। দালানটা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কোথায় কোথায় যে চলে গেছে। একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে। কোনও কোনও ঘরে ছাদ আছে, কোনওটার মাথা একেবারে হাওদাখানা। দেওয়ালের কোথাও কোথাও অসাধারণ সব কাজ। লতা-পাতা-নকশা। টর্চের ঝলক ঝলক আলোয় চোখে পড়ছে, পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়সড় সব মানুষের বহুদিনের বেঁচে থাকার ইতিহাস।

কমল ভৌমিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠিক সেই কথাটাই বললেন, "জানেন, ইতিহাস। জিয়োগ্রাফি নয়, হিস্ট্রিই হল সব!"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টন করে মাথায় কী একটা লাগল। "উঃ", করে বসে পড়লেন। "মর গিয়া।"

ডাক্তারবাবু টর্চের আলো ঘোরালেন পেছনদিকে। উলটোদিকের ভাঙা দেওয়ালে গোল রিং-এর মতো একটা ছায়া দুলছে। টর্চের আলো মাথার ওপর ফেললেন ঘুরিয়ে। লোহার চেনে বাঁধা একটা রিং ওপর থেকে নেমে এসেছে নীচে।

কমল ভৌমিক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "নাঃ মরিনি, বেঁচে আছি। তবে কপালটা আলু হয়ে গেল। ওটা কী বলুন তো!"

"লোহার রিং। আরও একটা ছিল।"

"অ্যাঁ, বলেন কী! আমার তো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তখনও রোমান রিং ছিল! রাজা-মহারাজারা ব্যায়াম করতেন? তা হলে ব্যায়ামেরও একটা হিস্ট্রি আছে।"

"হিস্ট্রিটা ব্যায়ামের নয়, অত্যাচারের। অপরাধীর পা দুটো আটকে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চাবুক মারা হত।"

"তা হোক। সেটাও ব্যায়াম। যে ঝুলছে তার শীর্ষাসন। আর যে মারছে তার ফ্রি-হ্যান্ড।"

আরও কিছু দূর এগোবার পর দেখা গেল, একটা দেওয়াল থেকে টর্চের আলো ঝলসে ফিরে এল। সকলেই চমকে উঠেছে। ডাক্তারবাবু হাসলেন, "ঘাবড়ে দিয়েছিল। কত বড় দেওয়াল-জোড়া আয়না দেখেছেন। কালের হাত থেকে কীভাবে বেঁচে গেছে!"

কমল ভৌমিক বললেন, "ফাসক্লাস জিনিস। হাজার হাজার টাকা দাম। কীভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আমরা একেবারে ইতিহাসবিমুখ জাতি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ইতিহাসবিমুখ ও ব্যায়ামবিমুখ। চলুন।"

"আর কত দূর যাব বলুন তো। ওদিকে রুগি কি আর বেঁচে আছে।"

"এ অসুখে মৃত্যু অত তাড়াতাড়ি হয় না। ধীরে ধীরে আসে।"

অন্দরমহল শুরু হবার আগে, বিশাল একটা চত্বর। কোনও একসময় এখানে বসার জন্যে চারপাশে মার্বেল পাথর বাঁধানো বেদি ছিল। ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখে রাখুন একে বলে কবুতর-চত্বর। বারমহল থেকে আসতেন পুরুষরা, অন্দরমহল থেকে আসতেন মেয়েরা। চারপাশে সব বসতেন। আর এই দেখুন, মাঝের এই বাঁধানো জায়গায় থাকত জল। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা নেমে আসত চারপাশের ছাদ থেকে। দানা খেত। ডানা ঝাপটে সব চান করত। আবার উড়ে চলে যেত ছাদে।"

"আঃ, কী রাজার জীবন ছিল। সেই সময় আমি বেঁচে থাকলে এখানে মেয়েদের সব বাস্কেটবল খেলাতুম। ইতিহাস বলে, রাজা-মহারাজাদের অন্দরমহলের মেয়েরা বড় অলস ছিল।"

"আচ্ছা, লেটস গো।"

ডাক্তারবাবু অন্দরমহলের দিকে এগোলেন। কবুতর-চত্বরের মাথার ওপর চৌকো আকাশ। তারার ফুল ছড়িয়ে আছে। চারপাশে ভাঙা ইমারতের কালো রেখা। থেকে থেকে ঝুরঝুর করে বালি ঝরছে। ঝুনঝুন করে নাচের ঘুঙুরের মতো শব্দ উঠল। কে যেন নাচছে।

কমল ভৌমিকের ভয় মনে হয় অনেকটা কেটে গেছে। বললেন, "সব জায়গায় একটা করে ভূত। বারমহলে কুকুর-ভূত। একবার এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ ছুটে বেড়াচ্ছে। অন্দরমহলে রাজনর্তকী ভূত।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ভূত নয়, শজারু। খোলা বাতাসে নাচছে।"

"শজারু! বলেন কী! আমি জীবনে দেখিনি। একবার লাইটটা ফেলবেন?"

"সময় নেই। পরে আপনাকে দেখাব। মুরি ফরেস্টে অনেক পাওয়া যায়।"

নিতু বললে, "আমার গায়ে জল পড়ল।"

কমল ভৌমিক বললেন, "জল নয়, আতর পড়েছে মনে হয়। রাজবাড়িতে জলের কারবার নেই।"

সামনে অন্ধকার। টর্চের আলোর তুলনায় অন্ধকার খুবই গাঢ়। সেই অন্ধকার হঠাৎ যেন দলা পাকিয়ে ওদের দিকে তেড়ে এল। শুধু তেড়ে এল না, ভোঁসভোঁস শব্দে তেড়ে এল।

॥ ১৮ ॥

অন্ধকারের দলাটা টর্চের আলোর বৃত্তে আসতে বোঝা গেল, বিশাল বড় একটা রামছাগল। তেমন ভাল করে বোঝার আগে দাড়িওলা রামবাবু সবেগে কমল ভৌমিকের পেটে একটি মোক্ষম ঢুঁ মেরে ধরাশায়ী করে দিল। তিনি হাতের ভর দিয়ে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করলেন, "জিনিসটা কী বটে?"

জিনিসটা ততক্ষণে ছুটে বাইরে চলে গেছে। কমল ভৌমিক পড়ার সময় নিতুকে নিয়ে পড়েছিলেন। নিতু উলটে পড়েই আছে। সেই অবস্থাতেই বললে, "ছাগল বটে।"

"অ্যাঁ, সামান্য একটা ছাগল আমাকে ফেলে দিলে! আমার আত্মহত্যা করা উচিত।"

"আত্মহত্যা করলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল, আপনার করা উচিত ব্যায়াম। আজ আপনি কী প্রমাণ পেলেন! একটা রামছাগল আপনার চেয়ে বলশালী।"

"আমি আপনার এই যুক্তি মানতে রাজি নই। স্ট্রেট ফাইট হলে রামবাবু হেরে যাবে।"

মুখ থেকে কথা খসেছে কি খসেনি, রামছাগলটা পেছন দিক থেকে তেড়ে এসে কমল ভৌমিককে আর একটা ঢুঁ মেরে খড়বড় খড়বড় করে সামনের দিকে ছুটে গেল। কমল ভৌমিক উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। ঝেড়েঝুড়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আর ক্ষমা নেই। কোনওমতেই আর ক্ষমা নেই। এইবার আমি জানোয়ারটার পেছনের ঠ্যাং দুটো ধরে মারব আছাড়, একেবারে ছাতু হয়ে যাবে।"

কমল ভোমিক একেবারে রণং দেহি। এক পা সামনে, এক পা পেছনে। বুক চিতিয়ে জামার হাতা গুটোচ্ছেন। নিতু আর সুকু দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার মুখার্জি একটা খাঁজে ঢুকে পড়েছেন। তিনি বললেন, "মেজাজের দিক থেকে রামছাগল আর গন্ডারে খুব একটা তফাত নেই। প্রায় একইরকম গোঁ।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "যে-কোনও কারণেই হোক, আপনাকে টার্গেট করে ফেলেছে। খুব সাবধান। দ্বিপদ হলে যদিও বা পারতেন, চতুষ্পদের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।"

সুকু বললে, "বাবা, আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা। ওদিকে সুদর্শনকাকুর কী হচ্ছে..."

সুকুর কথা শেষ হল না। হুঁহুঁ করে ছাগলটা আবার ছুটে এল। আর কমল ভৌমিক ওরেব্বাবা রে বলে সামনে ছুট লাগালেন। ছুটতে ছুটতে কোথায় যে চলে গেলেন!

ডাক্তারবাবু বললেন, "এই সেরেছে, ভদ্রলোক পথ হারিয়ে মরণকূপে গিয়ে না পড়েন।"

নিতু বললে, "সে কী কাকাবাবু!"

"রাজা-রাজড়ার ব্যাপার বাবা। মানুষ মারার কত কায়দা যে সে যুগে ছিল! সোজাসুজি না মেরে খেলার ছলে মারার ব্যবস্থা। এই যেরকম কমল ভৌমিক ওই ছুটলেন, সেইরকম যাকে মারা হবে তাকে ছোটানো হত। সে ছুটতে ছুটতে আচমকা পড়ে যেত গভীর গর্তে। ঘন অন্ধকার। তারপর যা হত বুঝতেই পারছ।"

সুকু বললে, "সে-সব এখনও আছে বাবা?"

"কেন থাকবে না। ভাঙাচোরা অবস্থায় সবই আছে। চলো, চলো, ভদ্রলোককে বাঁচাতে হবে।"

তিনজনে ছুটলেন কমল ভৌমিকের সন্ধানে। ছুটতে ছুটতে সুকুর মনে হল, একটা কাজ একসঙ্গে অনেকে মিলে করতে গেলে বড় গোলমাল হয়ে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। একই দিনে দু'-দুটো কাজ পণ্ড হতে বসেছে। সকালে ডি. এম-এর সঙ্গে ওই হল, রাতে এই হচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে তিনজনে আবার বাইরে। না ছাগল, না কমল ভৌমিক। কারও পাত্তা নেই। গাছতলায় বাড়ি। চারপাশ হাহা করে যেন হাসছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই বোধহয় হল। আহা অমন সুন্দর একজন মজার মানুষ!"

সুকু বললে, "বাবা, তুমি আগেই কেন খারাপটা ভাবছ! তুমিই না বলো, আগেই খারাপটা ভাববে না। ভাল হবে ভেবে এগোবে। খারাপ হলে হাসিমুখে মেনে নেবে। হতাশ হবে না।"

"ঠিক। আমি তো তাই বলি। থ্যাঙ্ক ইউ সুকু। তুমি আমার চরিত্রের একটা ত্রুটি ধরিয়ে দিলে। সেটা হল, আমি যা বলি, তা বিশ্বাস করি না। চলো, তা হলে খুঁজে দেখা যাক।"

ডাক্তারবাবু আবার ভাঙা গড়ের দিকে এগোলেন। এগোতে এগোতে থেমে পড়লেন। সামনে অস্পষ্ট একটা ছায়া লুটিয়ে আছে। অন্ধকার। তা হলেও আকাশের আলো ভাঙা গড়ের চারপাশ দিয়ে ঢোকার তো চেষ্টা করবেই। কালো পথের ওপর আরও কালো ছায়া। মানুষের মতো সে-ছায়ার মাথা আছে। হাত-পা আছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখেছ? এখানে একটা মানুষের ছায়া পড়ে আছে?"

নিতু বললে, "মানুষ ছাড়া, মানুষের ছায়া কী করে হয়?"

"ঠিক, ঠিক বলেছ। কায়া ছাড়া ছায়া হয় না। যেমন আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না। তা হলে আমাদের ডানপাশে কোথাও একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা বলো তো, ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে সেই মানুষটার দূরত্ব আন্দাজ করা যায় কি?"

সুকু বলল, "যায়। বেশ দূরেই আছে, আর উঁচু একটা জায়গায়। দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, অল্প অল্প কাঁপছে।"

"তা হলে চলো, ডানদিকে যাওয়া যাক।"

সুকু বললে, "নিতু, তোর ভয় করছে না তো?"

"না সুকুদা, আমার বেশ মজা লাগছে। আমার কোনও কিছুতেই ভয় নেই। আর সবাই বলে, তোর ভয়ডর নেই বলেই, তুই এত বিপদে পড়িস।"

"আমারও একদম ভয় করে না। ভূতের গল্প শুনলে হাসি পায়!"

ডানদিকটা বেশ দুর্গম। এদিকটাই বেশি ভেঙেছে। স্তূপাকার পাথর, ইট। বড় বড় থাম শুয়ে পড়েছে। ছোট-বড় কাঠের টুকরো। অসাবধানে পা পড়লেই ইট, পাথর ধসে পড়ছে। তিনজনে কখনও ওপরে উঠছে, কখনও নামছে। মাথার ওপর কখনও আকাশ, কখনও ছাদ। ভেঙে ঝুলছে। জায়গায় জায়গায় তারের জালি।

অনেকটা যাবার পর সমতল এলাকা পাওয়া গেল। ধাপ ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। একসময় সিঁড়িটা মানুষকে কোথাও এক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারত। এখন সিঁড়ি, শুধুই সিঁড়ি। কয়েক ধাপ উঠে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেছে। সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে কমল ভৌমিক দাঁড়িয়ে আছেন স্ট্যাচুর মতো। ডক্টর মুখার্জি টর্চের আলো ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে কমল ভৌমিক বললেন, "চিনতে পারছেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মনে হয় পারছি।"

"আমি স্ট্যাচু হয়ে গেছি।"

"এবার মানুষ হয়ে নেমে আসুন।"

"সেই বাঁদরটা কোথায়?"

"এর মধ্যে বাঁদর আবার এল কোথা থেকে? ছিল তো ছাগল।"

"ছাগলও মাঝে মাঝে সঙ্গদোষে বাঁদর হয়ে যায়।"

কমল ভৌমিক ধাপে ধাপে নেমে এলেন। নেমে এসে বললেন, "মশাই, ছেলেবেলায় বোসেদের পেয়ারাবাগানে একবার কুকুর তাড়া করেছিল, আর এই একবার রামছাগল। মশাই, এরকম রাগী ছাগল আমি কখনও দেখিনি। একেবারে ইডিয়ট। আনসিভিলাইজড, অমানুষ।"

"মানুষ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, ছাগল আর মানুষ হবে কী করে!"

"ও-কথা বলবেন না। আমাদের শিমুলিয়ার বাড়িতে একটা ছাগল ছিল, সে যে মশাই কী জিনিস! অবিকল মানুষের মতো। ছাগলটা বাষট্টি সালে দেহ রাখল। যাকে বলে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে আরোহণ।"

সুকু বললে, "চলো বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো চলো। ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? সামনে চলো, সামনে।"

চারজনে সিঁড়িকে বাঁয়ে রেখে এগোতে লাগলেন। পথটা প্রায় সুড়ঙ্গের মতো। মাঝে মাঝে ছাদ ধসে গেছে, তাই রক্ষে। নয়তো কী যে হত। সাপ কামড়ে শেষ করে দিত। কথা বললে শব্দ একেবারে গমগম করে উঠছে। চামচিকের আস্তানা। মাঝে মাঝেই ঝাপটা মেরে চলে যাচ্ছে।

কমল ভৌমিক বললেন, "হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকেতেও লাথি মারে। কথাটা কত ঠিক দেখেছেন, একশো ভাগ সত্যি।"

সুকু বললে, "আমরা এত ঘুরছি কেন বাবা?"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভালই তো। যত ঘুরবে ততই ভাল। হজম হয়ে যাবে। চনচনে খিদে হবে।"

নিতু বললে, "আর খিদে! আমার পেটের ভেতর এখনই ছুঁচো লাফাচ্ছে। সকাল থেকে তো কিছুই খাওয়া হয়নি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সে কী! সারাদিন তোমরা তা হলে কী করলে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "যাকে বলে অরণ্যে রোদন। ক্রাইং ইন দি ওয়াইল্ড ফরেস্ট।"

যেতে যেতে যেতে হঠাৎ সামনে একটা দরজা। এতক্ষণে একটা দরজা দেখা গেল যা হোক। ছোটখাটো নয়, বিশাল দরজা। পেতলের দুটো বড় বড় চোখ লাগানো। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

ডাক্তারবাবু বললেন, "এই হল আলমসাহেবের ডেরা; কিন্তু দরজাটা যে ভেতর থেকে বন্ধ।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভদ্রলোক ভালই করেছেন। সাবধানের মার নেই। যা সব চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব।"

সুকু বললে, "বাবা, তুমি কতদিন পরে এলে?"

"তা ধরো, বছক-ছয়েক পরে।"

নিতু বললে, "আপনি কী করে চিনে চিনে এলেন কাকু?"

"এ বাবা এমন জায়গা, একবার এলেই চেনা যায়। এ তো সাধারণ জায়গা নয়। রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা।"

কমল ভৌমিক বললে, "সবচেয়ে ভাল হত যদি একটা কলিং বেল থাকত!"

"তা যখন নেই, আসুন, দরজায় টোকা মারি। আমার টর্চের ব্যাটারি কমে আসছে। এরপর নিবেই যাবে। টোকার পর টোকা, শেষে ধাক্কা, দরজা খোলার নাম-গন্ধ নেই। ভেতরে কেউ কি আছে? থাকলেও কি বেঁচে আছে। ঘুম হলে ভেঙে যেত এতক্ষণে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তা হলে শেষ করে দি এবারে! আমার সেই ক্যারাটে কিক!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনি আর আমি আমাদের দু'জনেরই বুদ্ধি বেশ কমে গেছে। অবিলম্বে আমাদের ফসফরাস খাওয়া উচিত। কোথায় ধাক্কা মারছেন? দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ। এই দেখুন ছিটকিনি লাগানো।"

ডাক্তারবাবু টর্চ ফেললেন। কমল ভৌমিক বললেন, "তা হলে আর কী হবে! ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ নেই।"

"না থাকাই উচিত, তবু একবার দেখা যাক। ছিটকিনিটা খুলুন।"

কমল ভৌমিক বললেন, "প্লিজ, আপনি খুলুন। আমার এই একটাই ভয়। বাইরে থেকে বন্ধ দরজা খুলতে গেলেই বুকটা কেমন করে ওঠে! ভেতরে কী আছে কে জানে বাবা! এটা অবশ্য হবার একটা কারণ আছে, পঞ্চাশ সালে, ইন দি ইয়ার ফিফটি, আহিরিটোলা, আমার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে, কালীপুজোর রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল।"

"কমলবাবু, এখন থাক। অতীত জানার সময় নেই এখন। টর্চটা ধরুন। এ-দরজা এক হাতে খোলা যাবে না।"

কমল ভৌমিক টর্চের আলো ফেললেন, ডাক্তারবাবু দু'হাতে হুড়কো ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। সুকু বললে, "বাবা, ঘরে যখন কেউ নেই তখন শুধু খুলে কী হবে? আলমসাহেব আর কোথাও থাকলে বরং চলো আমরা সেইখানেই যাই।"

ডাক্তারবাবু দরজার হুড়কো খোলার চেষ্টা না থামিয়ে বললেন, "ঘর বন্ধ দেখে চলে যেতে নেই। খুলে দেখতে হয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, লিভ নো স্টোন আনটার্নড।"

কমল ভৌমিক বললেন, "কেন, আমাদের বাংলোই বা কম যায় কীসে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।"

দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে অনেক কালের জমে থাকা বদ্ধ একটা শীতল বাতাস বেরিয়ে এল, সঙ্গে অসম্ভব রকমের বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। কমল ভৌমিক বললেন, "হ্যাঁ মশাই, বাঘটাঘ নেই তো! বিশ্রী বিকট দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখি, টর্চটা আমার হাতে দিন। আপনারা সব বাইরে দাঁড়ান। আমি ভেতরটা দেখে আসি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তা কি হয়! আমি যাব। আমি বেঁচে থাকলেও কাঁচকলা, আমি মরলেও কাঁচকলা। আপনার জীবনের দাম জানেন?"

শেষে সবাই একসঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়লেন। নিতু আর সুকু কি সহজ ছেলে! কিছু হলে সকলের একসঙ্গে হবে। পাথরের ইট দিয়ে গাঁথা বিশাল বড় একটা ঘর। ছাদটা খুব নিচু। ডাক্তারবাবু এরই মাঝে ঘরটার বিবরণ দিলেন, এই ধরনের ঘরকে ইংরেজিতে বলে সেলার। এই ঘরে রাজা-মহারাজাদের মদ থাকত। কাঠের ব্যারেলে। ব্যারেলের পর ব্যারেল। বছরের পর বছর ধরে সেই মদ কাঠের পাত্রে গেঁজে গেঁজে সুস্বাদু হয়ে উঠত। রাজা-মহারাজাদের ব্যাপার, বলার কিছু নেই।

টর্চের আলো দেওয়াল থেকে দেওয়ালে ঘুরছে। সারা ঘরে কী ঝুল হয়েছে! ফিনফিন কাপড়ের মতো এপাশ থেকে ওপাশ ঝুলে ঝুলে আছে। আলো পড়লেই মনে হচ্ছে ডাইনির আঁচল। কিঁচকাঁচ শব্দ করতে করতে কীসব দৌড়ঝাঁপ করছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, গেছো ইঁদুর আর ছুঁচো।"

ঘরের একপাশে একটা সুদৃশ্য ড্রয়ার, তার ওপর বসানো বিশাল বড় একটা মোমবাতি। সুকু দেখেই চিনতে পারল। বড়দিনের সময় চার্চের বাতি-কারখানায় এইরকম বড় বড় বাতি তৈরি হয়। ডাক্তারবাবু বললেন, "যাক, বাতির ব্যবস্থা হয়েই আছে। কমলবাবু ওটাকে জ্বালান তো।"

"সে না হয় জ্বালাচ্ছি, কিন্তু গন্ধে যে আর টেকা যাচ্ছে না মশাই।"

"খুব গন্ধ!"

"খুব মানে? পাগল করে দিচ্ছে। এখানে আপনি কী খুঁজছেন? আলম কি এখানে আছে?"

"আমি আলমকে খুঁজছি না, আমি এখন খুঁজছি গন্ধ। কীসের গন্ধ? কার গন্ধ? কোথায় গন্ধ?"

এই রহস্যময় ঘরেরও রহস্য আছে। দূরে একটা খিলান। তার ওপাশে আরও কিছু আছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে অতলে।

কমল ভৌমিক বললেন, "মশায়, এ যে দেখি মিশরের ফারাওদের কবরখানার মতো। গুপ্ত ঘর। তারপর গুপ্ত গুপ্ত ঘর। এরপর গুপ্ত গুপ্ত গুপ্ত গুপ্ত।"

"ব্যস ব্যস। বেশি কথা বলবেন না।"

কমল ভৌমিকের হাতে টর্চ। ডাক্তারবাবুর হাতে মোমবাতি। পাথরের দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে। দুঃসহ গন্ধ। প্রাণ যায়। তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে আবার একটা গুহা-ঘর। সেই ঘরে ডালা-খোলা বিশাল একটা কফিন। আলো পড়তেই সকলের মুখ দিয়ে একটা ভয়ের চিৎকার বেরিয়ে এল।

॥ ১৯ ॥

ঘরের মাঝখানে ঝকঝকে একটা নতুন কফিন। কারুকার্য করা। ফুল, লতা, পাতা। মাঝে মাঝে পেতল লাগানো। আর ডালাটা হাট খোলা। আর ভেতরে চিত হয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। মুখটা তার সাদা মার্বেল পাথরের মতো। দীর্ঘ দেহ। পরনে সুন্দর পোশাক। মনে হচ্ছে যেন মোমের দেহ। গলে গলে

এসেছে। বুকের ওপর একটা কোরান। তার নীচে একটা সাদা কাগজে কী সব লেখা। কাগজটা তুলে নেবার জন্যে ডাক্তারবাবু হাত বাড়াতেই কমল ভৌমিক হাঁহাঁ করে উঠলেন, "ছি ছি, ছোঁবেন না ছোঁবেন না। ও মশাই, ছোঁবেন না।"

ডাক্তারবাবু তবুও কাগজটা তুলে নিলেন। বড় বড় করে লেখা, 'আমি এখন ঘুমোচ্ছি। কেউ আমার ঘুম ভাঙিয়ো না। এই ঘরেই আমি থাকব। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেয়ো না। এই রাজবংশের আমিই শেষ পুরুষ। আমাকে ঘুমোতে দাও। বিরক্ত কোরো না।"

কমল ভৌমিক বললেন, "মৃত্যু। নিশ্চয় মারা গেছেন আলমসায়েব। আমি একেবারে নিশ্চিত। আমার চোখের সামনে দু'-দুটো মৃত্যু হয়েছে। আমার ঠাকুরদা, আমার দাদু।"

ডাক্তারবাবু শান্ত গলায় বললেন, "চুপ করুন। এই অবস্থায় কথা যত কম বলবেন ততই ভাল।"

সুকু বললে, "তুমি এখন কী করবে বাবা!"

"খুব একটা অন্যায় কাজ করব। সেই প্রাচীন বিদ্যা। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা।"

ডাক্তার ঘরের শেষ মাথায় চলে গেলেন। সেখানে একটা কুলুঙ্গি। মোমের আলো আর টর্চের আলোয় ঝলসে উঠল পাশাপাশি সাজানো নীল নীল শিশি। কতকালের পুরনো পাথরের দেওয়ালে, এই পাথরের তাক। ঝিলঝিল করে ঝুল ঝুলছে শতশত মাকড়সা। তিরতির করে নামছে, উঠে যাচ্ছে সরসর করে ওপরে। এ-কোণ থেকে চলে যাচ্ছে ও-কোণে। বেঁচে থাকার কী আনন্দ! ওদিকে কফিনে শুয়ে আছে মৃত্যু। এদিকে ক্ষুদ্র এতটুকুটুকু প্রাণী মনের আনন্দে পেতে চলেছে ফাঁদ। পোকা ধরার ফাঁদ।

নিতু ফিসফিস করে সুকুকে জিজ্ঞেস করলে, "কী আছে বলো তো শিশিতে! অমন জ্বলছে কেন? ঝলসে উঠছে কেন আলো পড়লেই!"

ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে হাত বাড়ালেন শিশির দিকে। আর ঠিক সেই সময় কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে। সারা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। চমকে উঠে হাত টেনে নিলেন ডাক্তারবাবু।

কমল ভৌমিক বললেন, "কী হল! ভয় পেলেন নাকি?"

প্রশ্ন করেই, কাউকে কিছু বোঝার অবসর না দিয়ে কমল ভৌমিক তাক থেকে খপ করে একটা শিশি টেনে নিলেন। এরপর কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! তীব্র হিসহিস শব্দে সারা ঘর ভরে গেল। মনে হতে লাগল কানের পরদা ফুটো হয়ে যাবে। সারা গায়ে মনে হতে লাগল ছুঁচ ফুটছে।

কমল ভৌমিক ছুটে পালাতে চাইছিলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "দাঁড়ান। এক-পা নড়বেন না। যা হবার তা হবে। স্ট্যান্ড স্টিল।"

"যদি কামড়ায়!"

"কী কামড়াবে?"

"সাপ।"

"কোথায় সাপ! একটা সাপও নজরে পড়েছে! দেখতে পেয়েছেন?"

"তা হলে?"

"আর-একটা শিশি সরান।"

কমল ভৌমিক যেই আর একটা শিশি সরালেন, সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন সুরে হিসহিস শুরু হল। কমল ভৌমিক আরও একটা শিশি সরালেন, এবার আর-এক সুরে হিসহিস শোনা গেল।

কমল ভৌমিক বললেন, "ব্যাপারটা কী বলুন তো? বেশ মজার ব্যাপার।"

"বুঝতে পারছেন না, এ-হল এক ধরনের অরগ্যান। অজস্র ফুটো। ফুটোর মুখগুলো শিশি দিয়ে বন্ধ করা। বাইরে থেকে বাতাস ঢুকছে সবেগে। ভেন্টিলেটার না বাদ্যযন্ত্র কে বলতে পারে! সেকালের রাজামহারাজাদের খেলা।"

"এইসব নীল শিশিতে কী আছে বলুন তো?"

"সাপের বিষ, স্নেক ভেনস। যার খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। এখন দেখতে হবে কোন শিশিতে আছে। সব ক'টা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

বাতি জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। মোমের ফোঁটা চোখের জলের মতো মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছে টুপুস টুপুস করে। চারপাশ চুপচাপ, নিস্তব্ধ। বাতাস ফুঁসছে হিসহিস শব্দে। কফিনে শুয়ে আছে পাথরের মতো সাদা আলম।

একটা শিশিতে তেলের মতো কিছুটা তরল পদার্থ টলটল করছে। ওই হল সাপের বিষ। ডাক্তারবাবু শিশিটা সাবধানে পকেটে রাখলেন। তারপর কমল ভৌমিককে বললেন, "কী করা যায়?"

"এইবার পথ চিনে চিনে ফিরে যাওয়া যায়।"

"আমার বন্ধু আলমের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো! মৃত্যুর পর সমাধি।"

"এইখানেই উনি থাকুন না। বেশ ঘুমিয়ে আছেন। কে আর আসবে এখানে!"

পথ চিনে চিনে সবাই আবার বাইরে এসে অবাক। কী আশ্চর্য! ভোর হয়ে গেছে। ফিকে আলোয় চারপাশ ধুয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস। দূরে দূরে ধোঁয়াটে পাহাড়। অজস্র পাখি কিচিরমিচির করছে।

কমল ভৌমিক বললেন, "কী আশ্চর্য, সময়টা হজম করে নিলে। ওই মৃত্যুপুরীতে আমরা এতক্ষণ ছিলুম! ভাবা যায় না মশাই!"

ডাক্তারবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। মোটরের দরজায় চাবি লাগালেন। দরজাটা খুলতে যাচ্ছেন এমন সময় গাঁ-গাঁ করে একটা জিপ এসে পাশে ব্রেক কষে দাঁড়াল। সামনের সিট থেকে বীরের মতো লাফিয়ে নামলেন গোলমোহর থানার ও. সি.।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন, "উঃ, পারেন বটে আপনি ডক্টরসাব। আপনার জন্যে সারা মহল্লা কাল জেগে কাটিয়েছে। মশাই, দু'চোখের পাতা কেউ এক করতে পারেনি। সে কী দুশ্চিন্তা! ওদিকে নেপিয়ার ফাটক ফেঁড়ে বেরিয়ে গেছে। আজকালকার পুলিশ মশাই একেবারে অপদার্থ। কুছ কামকা নেহি। আর বলবই বা কী, দিল্লির অত কড়া তিহার জেল থেকে শোভরাজ সরে পড়ল। এখন এস পি আসছেন, আজ একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে। চাকরি থাকে কি যায়! নিন চলুন, আপনাকে দিয়ে আসি।"

"কোথায় দিয়ে আসবেন?"

"কোথায় আবার, বাড়িতে। শ্রীমতী মুখার্জির যা অবস্থা হয়েছে!"

"আমাকে তো এখন হাসপাতালে যেতে হবে, তা ছাড়া এখানে আপনার কাজ রয়েছে।"

"আমার কাজ তো হয়ে গেল!"

"আপনার কাজ শুরু হল। সোজা চলে যান ভেতরে। মাটির তলার ঠান্ডিঘরে দেখবেন কফিন। সেই কফিনে শুয়ে আছেন আলমসাহেব। যতদূর মনে হয়, মারা গেছেন, তিন দিন আগে।"

ও সি হাত-পা নেড়ে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "আমি ওর মধ্যে নেই, আমি ওর মধ্যে নেই। মনে করুন, আমি ছুটিতে আছি।"

"কী করে মনে করব! চোখের সামনে দেখছি আপনি ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"আপনি কী করতে গিয়েছিলেন ওখানে? যেচে বিপদ ডেকে আনতে?"

"আমি গিয়েছিলুম চুরি করতে!"

"আপনি জানেন কি, আলম যদি খুন হয়ে থাকে পুলিশ আপনাকে ধরে টানাটানি করবে?"

"খুন নয়, স্বাভাবিক মৃত্যু। যান না, গেলেই বুঝতে পারবেন।"

ও সি-র মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডক্টর মুখার্জি গাড়ি ছেড়ে দিলেন। গাড়িতে বসে নিতু সুকুকে বললে, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে?"

সুকু বললে, "না তো!"

"আমারও পাচ্ছে না। ঘুম চটে গেছে।"

"ঘুমের আর দোষ কী! আমি নিজেই নিজের ওপর চটে গেছি। কী যে সব হচ্ছে রে ভাই।"

"আমার বেশ মজা লাগছে। কত কী হচ্ছে, তাই না সুকুদা!"

গাড়ি হাসপাতালের মাঠে ঢুকে পড়ল। নিতু বললে, "কাকু, বাড়িতে কাকিমা ভাবছেন, একবার খবর দিয়ে এলে হত না।"

"সেই কাজের ভারটা আমি আমার ফ্রেন্ড কমলবাবুকে দিতে চাই। সুদর্শনকে একটু সামলে না দিয়ে বাড়ি ফিরি কী করে!"

কমল ভৌমিক বললেন, "আদেশ মাথা পেতে নিলাম, এইসময় আমারও একটু কাজ থাকে।"

"কী কাজ?"

"এই সময় আমি একটু জগিং করি। জগ করতে করতে আপনার বাড়ির দিকে চললুম। আহা, এমন সুন্দর ভোর! এর দাম লাখ টাকা।"

কমল ভৌমিক ধীরে ধীরে ছুটতে শুরু করলেন। ডাক্তারবাবু ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেছ, একেই বলে নিষ্ঠা। সিনসিয়ারিটি। আমাদের সকলকেই এই গুণ অর্জন করতে হবে। পরে আজ রাত্তিরবেলা, সময় পেলে তোমাদের একটা গল্প শোনাব। বিখ্যাত লেখক জ্যাক লন্ডনের নিষ্ঠার গল্প।"

কমল ভৌমিক জগিং-এর তালে তালে চার্চ রোড ধরে স্টেশন রোডের দিকে চলেছেন। ঝকঝকে সকাল। মাজা পেতলের থালার মতো পুবের আকাশ। আকাশের গায়ে নীল পাহাড়। কমল ভৌমিকের সঙ্গী হয়েছে একটা পাহাড়ি কুকুর। বেশ মজা পেয়ে গেছে। পেছন পেছন ছুটছে। কমল ভৌমিক মাঝে মাঝে তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। রাস্তায় তেমন লোক-চলাচল শুরু হয়নি। সুরথ মিঠাইওলা দোকান খুলে বসেছে। বিশাল কড়ায় ঘি-চপচপে হালুয়া হচ্ছে। পাশের কড়াইতে গরমাগরম জিলিপি। হান্ডা কেটলিতে দুধ মোটা ক্ষীর ক্ষীর চা। দু'-চারজন দেহাতি খদ্দের জড়ো হয়েছে। শিউপুজন কন্ট্রাক্টার হাফপ্যান্ট পরে গেলাসে মোটা চা খাচ্ছে। নতুন বাইক কিনেছে। বাইকটা একপাশে সকালের নরম রোদে ঝলমল করছে। শিউপুজন একটু পরেই সাইকেল চেপে চলে যাবে ওই পাহাড়ের দিকে। ওখানে বিদ্যুৎ কারখানা তৈরি হচ্ছে।

দোকানের সামনে এসে কমল ভৌমিকের ছোটা বন্ধ হয়ে গেল। গরম হালুয়া, গরম জিলিপি। কাল থেকে উপবাস চলেছে। সাংঘাতিক খিদে। কমল ভৌমিক থামলেন, থেমে পড়ল ঝুমকো-ল্যাজ পাহাড়ি কুকুর। পটপট করে নড়তে লাগল চামরের মতো ল্যাজ।

কমল ভৌমিক কুকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী দোস্ত, খুব খিদে। আমার মতোই অবস্থা। রাতে ডিনার হয়নি?"

কুকুর ল্যাজ নাড়ল।

কমল ভৌমিক বললেন, "তোমার পেটে তো আবার ঘি সহ্য হবে না। লোম ঝরে যাবে।"

কমল ভৌমিক কুকুরের সঙ্গে সংলাপ শেষ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে দোকানের গোদা বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। একে উপোস, তায় জগিং। পেটে যেন বিসর্জনের ঢাক বাজছে— ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

কমল ভৌমিক মনে মনে বললেন, 'প্রথমে খাব ঘি-চপচপে গরম হালুয়া। তারপর খাব গরমাগরম জিলিপি। তারপর একজোড়া খাস্তা নিমকি, তারপর এক গেলাস মোটা চা, আদ্রক দেওয়া। উঃ, খাব। খুব খাব।'

যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে নীল পাহাড়টা চোখের সামনে স্পষ্ট। সেইদিকে তাকিয়ে হুকুম ছাড়লেন, "হালুয়া লে আও।"

মেঠাইঅলা সঙ্গে সঙ্গে হুকুমটা চালান করে দিল, "এ গালুয়া, বাবুকো হালুয়া লাগাও।"

শিউপুজন গেলাসে চুমুক মারতে মারতে বললে, "বাবু, বাঙালি? বিহারি হালুয়া পেটে নেবে তো?"

একে খিদে, তার ওপর ঠেস দিয়ে বাঙালি তুলে কথা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে গেল। ইংরেজিতে বললেন, "হু আর ইউ?"

শিউপুজন পাটনা কলেজে পড়েছে। উত্তর দিলে, "এ রেসপেক্টেবল জেন্টলম্যান।"

"আমি কে জানেন আপনি?"

"দুবলা বাঙালিবাবু।"

"দুবলা বাঙালিবাবু, তাই না?"

কমল ভৌমিক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সামনেই স্ট্যান্ডে খাড়া ঝকঝকে নতুন সাইকেল। সাইকেলের সামনের রডটা ধরে দু'হাতে উঁচু করে তুলে মারলেন হাতের চাপ। সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে ধনুক। শিউপুজন হাহা করে উঠল।

কমল ভৌমিক সাইকেলটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "হিম্মত থাকে সোজা করে নাও।"

শিউপুজন বললে, "এ আপনি কী করলেন! আমার নতুন সাইকেল। আমার নতুন সাইকেল।"

কমল ভৌমিক কোমরে হাত রেখে বুক চিতিয়ে শিউপুজনের সামনে দাঁড়ালেন, "বাঙালি দুবলা? বাঙালি দুবলা, তাই না!"

শিউপুজন বললে, "ও, কলকাতার বাবুরা অমন রড বাঁকানোর খেলা খুব দেখাতে পারে, উসমে কেয়া হ্যায়? কুস্তি লড়তে পারবেন?"

কমল ভৌমিক একটু ঘাবড়ে গেলেন; কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, কুস্তি যদি লড়তেই হয় তো বক্সিং আর ক্যারাটে কায়দা করে মিশিয়ে দেবেন। কমল ভৌমিক অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "কুস্তি? তোমাকে আমি এক আঙুলে নাচাব।"

"তব চলিয়ে।"

চারপাশে ভিড় জমে গেছে। কমল ভৌমিক বেশ বুঝলেন, ফাঁদে পড়ে গেছেন। কুস্তির প্যাঁচ মেরে লোকটাকে কাবু করতে না পারলে খুব ঝামেলা। বুক চিতিয়ে বললেন, "চলিয়ে। কাঁহা যানে হোগা! চলিয়ে।"

॥ ২০ ॥

রাস্তার ওপারে ফাঁকা মাঠ। সেখানে ছোটমতো একটা মন্দির। মন্দিরের সামনে একটা আটচালা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঁচু বাঁশের ডগায় হলুদ পতাকা সকালের বাতাসে ফুরফুর উড়ছে। শিউপুজন আর কমল ভৌমিক হনহন করে এগিয়ে চলেছেন সেইদিকে। পেছন পেছন চলেছে একদঙ্গল লোক। বহত মজা। কলকাতার বাবুর সঙ্গে জোর লড়াই। দঙ্গলে বেশ স্বাস্থ্যবান প্রবীণ একজন বুক ফুলিয়ে চলেছেন। বেশ ভাল সাজগোজ। চিকনের কাজ-করা হাফ-হাতা বুক-খোলা পাঞ্জাবি পরেছেন। চেক চেক সিল্কের লুঙ্গি। বুকের ওপর দুলছে সোনার একটা পদক। পায়ে খটখটে শুঁড়-তোলা নাগরা। দোকানের সামনে দোমড়ানো সাইকেলটা সেইভাবেই পড়ে আছে।

আখড়ায় এসে দঙ্গল থেমে পড়ল। সামনেই মহাবীরের মন্দির। পইতেধারী দেহাতি এক ব্রাহ্মণ। পরনে মালকোঁচা মারা লাল একটা কাপড়। ব্রাহ্মণ পুজোয় বসার আয়োজন করছেন। সাহায্য করছে বাচ্চা একটা ছেলে। ফুটফুটে সুন্দর। ছেলেটি দুলে দুলে মালা গাঁথছে। ব্রাহ্মণ চন্দন ঘষছেন শিলে।

দঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন, "কেয়া তমাশা?"

শুঁড়ওলা-নাগরা লোকটি বললেন, "লড়াই হোগা।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "জয় মহাবীর বোলো।"

নাগরা কমল ভৌমিক আর শিউপুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনা, মহারাজনে কেয়া কহা? বোলো, বোলো, জয় মহাবীর বোলো।"

কমল ভৌমিকের মহাবীরে তেমন ভক্তি নেই, তিনি হেঁকে বললেন, "জয় রামচন্দ্র কী জয়।"

শিউপুজন হাঁকলে, "পবন-সূত হড়ুমাড় চন্দ্র কী জয়।"

বলেই সে আখড়ার মাটিতে মারলে এক লাফ। নরম তুলতুলে তেলে-ভেজা মাটি দেবে গেল সামান্য। পূজারি ব্রাহ্মণ পূজার দালানে দাঁড়িয়ে বিশাল একটা শিঙায় ফুঁ মারলেন। পোঁ পোঁ করে বিকট একটা শব্দ হল। আর তখনই একটা সাদা ধবধবে গাড়ি মাঠের ওপারের রাস্তায় এসে থামল।

সেইদিকে তাকিয়ে নাগরি বললেন, "কেয়া বাত! চৌবেসাব কাহাঁসে আ গইল বা।"

গাড়িটাকে থামতে দেখেই পূজারি ব্রাহ্মণ শিঙা ফেলে এক লাফে চাতাল থেকে নেমে গাড়ির দিকে ছুটলেন।

যাঁকে চৌবেসাব বলে সবাই কেমন যেন হয়ে গেলেন, সেই বীর বাহাদুর চৌবে এই মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সাংঘাতিক তাঁর দাপট। দাপট তো হবেই। বীর বাহাদুরের বাবার নাম ছিল আগ বাহাদুর। তাঁর বাবার নাম ছিল রণ বাহাদুর। তাঁর বাবার নাম ছিল জিত বাহাদুর। এই জিত বাহাদুর সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া অ্যান মেরিকে বাড়ির ইঁদারার মধ্যে তিন রাত লুকিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েটি সেপাইদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলেও পরে নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছিল। মারা যাবার তিন মিনিট আগে উট্রমকে ফিসফিস করে একটি কথাই বলতে পেরেছিল, 'মাই সেভিয়ার।' তার মানে জিত বাহাদুর আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। সেই জিদ বাহাদুরকে ইংরেজ সরকার পরে সাতমহলার জমিদার করে দিলেন।

জমিদারি পেয়ে যে জিত বাহাদুর ইংরেজ মেয়ের প্রাণ বাঁচালেন, সেই জিত বাহাদুর কমসে-কম দু'-তিনশো দেশোয়ালি ভাইকে যমের বাড়ি পাঠালেন। কী তাঁর দাপট। শোনা যায়, চেহারাটাও ছিল যমদূতের মতো। বাদামি রঙের তাজা একটা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে মহল্লা টহল দিতেন।

বীর বাহাদুর চৌবে তাঁরই বংশধর।

বীর বাহাদুর গাড়ি থেকে দেহটাকে টেনেটুনে বের করলেন। পাক্কা ছ'ফুট লম্বা। তিনি নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে নামলেন তাঁর স্ত্রী। প্রায় মাথায় মাথায় লম্বা। এত সুন্দরী যে, জায়গাটা যেন ঝলমল করে উঠল। এপাশ-ওপাশ থেকে নেমে এলেন দাস-দাসী। গাড়ি থেকে বেরোতে লাগল পুজোর জিনিসপত্তর। সে যেন শেষ নেই।

চৌবেসাহাব লম্বা লম্বা পা ফেলে মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলেন। পেছন পেছন চলেছেন তাঁর স্ত্রী, সঙ্গী লোকজন। আর মন্দিরের পূজারি পাশে পাশে চলেছেন কুঁজো হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে। বড়লোক ভক্ত এসেছেন। হাজার হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে। এমন ভক্তের খাতির তো হবেই।

চৌবেসাহেবের চোখে সানগ্লাস। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর চোস্ত। দামি

আতরের ভুরভুরে গন্ধ। কোমরের কাছটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। রিভলভার ছাড়া চৌবেসাহেব বাইরে বেরোতে পারেন না। বন্ধুর চেয়ে শত্রুই বেশি করে ফেলেছেন।

চৌবেসাহেব কমল ভৌমিকের সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে একগাল হেসে বললেন, "আরে গুরুজি, কেয়া তাজ্জব!"

কমল ভৌমিক অবাক হয়ে বললেন, "আরে, চৌবে তুমি?"

চৌবে নিচু হয়ে কমল ভৌমিককে প্রণাম করলেন। কমল ভৌমিকের খাতির দেখে নাগরা, শিউপুজন সকলেই অবাক। চৌবেকে দেখে সকলেই ইতিমধ্যে জড়সড়।

চৌবে বললেন, "গুরুজি, আপনি এখানে কী করছেন?"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই মর্কটটা আমাকে মারবে বলে এখানে টেনে এনেছে।"

শিউপুজন আর নাগরা ভিড়ের মধ্যে পালাবার তাল খুঁজছিল। কমল ভৌমিক খুচ করে হাতের আর পায়ের কী একটা কায়দা করলেন, দু'জন দু'দিকে অন্তত হাত-দশেক দূরে ছিটকে পড়ল।

চৌবেসাহেব তারিফ করলেন, "আহা, আহা, জবরদস্ত কাজ। গুরুজি, এ-মারটা কোন কেতাবে পড়ে?"

"এ হল তোমার হাত আর পায়ের সাত নম্বর চাল। এ-মারটা তোমাকে এখনও শেখাইনি। আর শেখাব কী, সেই যে তুমি চলে এলে!"

চৌবে নিজের একজন লোককে বললেন, "ধরে আন দুটোকে।"

নাগরা আর শিউপুজনকে তুলে আনা হল। চৌবে বললেন, "গুরুজি, পুনপুনটা একবার সেরে নি, মওকা যখন মিলেছে।"

চৌবে শুধু দুটো হাত দিয়ে কী একটা করলেন, দুটো লোক দু'দিক থেকে ঠিকরে এসে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। ঢিস করে একটা শব্দ হল। ভিড়ের মানুষ হইহই করে উঠল, "কেয়া বাত, কেয়া বাত।" নাগরা আর শিউপুজন মাটিতে পড়ে আছে। মহাবীর মন্দিরের পূজারি জোরে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছেন।

চৌবে পড়ে-থাকা লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত রেখে বললেন, "বেয়াদব কাহাঁকা।" তারপর কমল ভোমিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুজি, হাত এখনও ঠিক আছে?"

"ঠিকই আছে, তবে বাঁ হাতটা একটু স্লো হয়ে গেছে। পুনপুন মারে দুটো হাতই সমান চলা চাই।"

"আঃ, ধরেছেন ঠিক। আমার বাঁ হাতে সামান্য চোট আছে। পায়ের খেলা দেখাব গুরুজি?"

"তুমি পাগোয়ালির কথা বলছ? কার ওপর দেখাবে?"

"কেন, এই দো বদমাশ!"

শিউপুজন হাঁউহাঁউ করে উঠল, "নেহি বাদশা, মর যায়েগা, একদম জিন্দা মর যায়েগা।"

চৌবেসাহেব ভেংচি কাটলেন, "ইঃ মর যায়েগা। তু না মারনে আয়া?"

নাগরাকে দেখিয়ে বললেন, "উয় কৌন, বদবু, য্যায়সা ফিল্‌মকা ভিলেন।"

"মাস্টারজি হজৌর।"

"মাস্টারজি। কিসকা মাস্টার, কাঁহা কা মাস্টার?"

চৌবেজির রকমসকম দেখে ভিড় প্রায় পাতলা হয়ে এসেছে। সব দূরে দূরে সরে গিয়ে আড়ালে আবডালে খাড়া হয়েছে। চৌবেজি বললেন, "হর দুনিয়ামে তো একই মাস্টার হ্যায়, মেরা গুরু কমলজি। বোলো জিন্দাবাদ।"

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "কামাল গুরু, জিন্দাবাদ।"

চৌবে চিৎকার করে বললেন, "হল্লাগুল্লা মাত করো, ইয়ে দেবস্থান হ্যায়।"

মন্দিরের পূজারি মহারাজা শিঙা ফুঁকতে লাগলেন জোরে জোরে। ঝোলানো ঘণ্টার দড়ি ধরে টানছে আর একজন। আর একজন নেচে নেচে বাজাচ্ছে ডুগডুগি। মহাশব্দে, মন্দিরের পাথরের মহাবীর যেন নড়েচড়ে উঠছেন।

চৌবেজি সেই ঘোর হট্টগোলে গলা চড়িয়ে বললেন, "গুরুজিকা গোড় লাগো।"

কমল ভৌমিকের কী খাতির। সবাই প্রণাম করতে লাগল। শিউপুজন আর নাগরা দাড়া-ভাঙা আরশোলার মতো রাস্তা পেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। দোকানের সামনে পড়ে আছে ঢেউ খেলানো সাইকেল।

চৌবেজি কমল ভৌমিককে নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসলেন। কমল ভৌমিকের খাতির তখন দেখে কে! গুরুর গুরু, মহাগুরু। ওদিকে মহা ধুমধামে মহাবীরের পুজো শুরু হয়েছে। বেঁটে, পাকতেড়ে শ্রীহনুমানজির মতো চেহারার একটি লোক নেচে নেচে শিঙা ফুঁকছে। বাচ্চা ছেলেটা দু'হাতে দড়ি পাকড়ে দুলে দুলে ঝোলা ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঢ্যাং ঢ্যাং করে। এমন শব্দ হচ্ছে যে কমল ভৌমিক কিছু বললে চৌবেজি শুনতে পাচ্ছেন না, চৌবেজি কিছু বললে কমল ভৌমিক শুনতে পাচ্ছেন না।

চৌবেজি জিজ্ঞেস করছেন, "গুরুজি, আপনি এখানে কেমন করে এলেন?"

কমল ভৌমিক বললেন, "স্কুলের জিমন্যাস্টিক দেখাবার জন্যে এসেছি।"

"আপনাকে আর ছাড়ছি না। আমার গেস্ট হয়ে কমসে-কম এক বছর থেকে যেতে হবে।"

"কলকাতায় আমার কাজ নেই চৌবে? আমার ইনস্টিটিউট কে দেখবে? সেখানে হাজার ছেলে ট্রেনিং নিচ্ছে।"

"এখানেও আপনাকে একটা আখড়া করতে হবে। আপনাকে একটা মহল্লা লিখে দিচ্ছি। এক লাখ টাকার মতো ইনকাম। সবসময় একশো চেলা আমার গুরুজির সেবা করবে। জয়, গুরুজির জয়।"

বিশাল একটা লরি মাঠের ধারে পিচের রাস্তায় এসে থেমে পড়ল। ধুপধাপ করে লাফিয়ে পড়ল জনা-ছয় দৈত্যের মতো চেহারার লোক।

চৌবেজি চিৎকার করে বললেন, "কেয়া, আ গাইল বা গাবুয়া।"

গাবুয়া চিৎকার করে বললে, "হাঁ মহারাজ।"

চৌবে কমল ভৌমিককে বললেন, "তাঁবু এসে গেছে। আজ বড় উৎসব হবে। সারারাত ভজন-কীর্তন আর মহাবীরজির ভোগ হবে। আমার স্ত্রীর মানত ছিল।"

কমল ভৌমিক হঠাৎ লাফিয়ে নেমে পড়লেন রক থেকে। মনে পড়ে গেছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়ে খবর দেবার কথা।

চৌবেজিও নেমে পড়লেন, "এ কী গুরুজি, আপনি চললেন কোথায়! আপনার সেবা, আর মহাবীরের সেবা এক জিনিস।"

কমল ভৌমিক হাসতে হাসতে বললেন, "কী যে বলো! আমার তো এখনও একটা জিনিস কমতি আছে। আমার তো ন্যাজ নেই। মহাবীরের কত বড় ন্যাজ দেখেছ?"

"গুরুজি, মহাবীরের ন্যাজ বাইরে আছে, আপনার আছে ভেতরে। আপনি মহাবীর সে কমতি কেন হোবেন?"

কমল ভৌমিক বুঝতে পারলেন না চৌবের এই কথায় তাঁর গৌরব বাড়ল না কমল। তিনি বললেন, "শোনো চৌবে, এখনই আমি তোমাকে কিছু বলব না। আমি ভেবে দেখি!"

মাঠের মাঝখানে হইহই করে তাঁবু খাটানো শুরু হয়ে গেছে। চৌবের আয়োজনের কোনও অভাব নেই। এর মধ্যেই মাইক চালু হয়ে গেছে। হিন্দি গান বাজছে হইহই করে। কমল ভৌমিক হনহন করে মাঠ পেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। আশপাশের সবাই এখন তাঁকে নমস্কার করছে। করবেই তো, গুরুর গুরু বলে কথা। শিউপুজন করুণ মুখে তার ধনুক হয়ে যাওয়া সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমল ভৌমিকের খুব দুঃখ হল।

পেছন থেকে হাত রাখলেন পিঠে, "শোনো বাবু, বাঙালি, হিন্দুস্থানি বলে কিছু নেই।"

শিউপুজন বললে, "জি হুজুর।"

"হুজুর নয়, বলো দোস্ত। আমরা সবাই মানুষ। পৃথিবী আমাদের দেশ।"

"জি সরকার।"

"জি হুজুর!"

"মারব মুখে এক থাবড়া। বলছি না, সরকার নয়, হুজুর নয়, দোস্ত। বুঝেছি, তোমার দ্বারা হবে না। তোমার ধাত খারাপ হয়ে গেছে। দেহের ব্যায়ামও হয়নি, মনের ব্যায়ামও হয়নি।"

"জি সরকার।"

"তোমার মাথা। সরো দেখি, সাইকেলটা সোজা করে দি।"

কমল ভৌমিক নিচু হয়ে সাইকেলটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিলেন। দম বন্ধ করে, আবার উলটোদিকে মোচড় মারলেন। রড সোজা হয়ে সাইকেল আবার সাইকেল হয়ে গেল। শিউপুজন বললেন, "আরে ব্বাপ।"

চৌবে ওপাশ থেকে চিৎকার করছেন "কী হল গুরুজি? বেয়াদব কিছু বলছে?"

কমল ভৌমিক চিৎকার করে বললেন, "না না, কিছু বলেনি। সাইকেলটা সোজা করে দিলুম।"

জোরে গান বাজছে। কে কী শুনলেন কে জানে! সামনের রাস্তায় একটা গাড়ি যেতে যেতে গতি কমে এল। সামনের আসন থেকে সুকু চিৎকার করছে, "কাকু, কাকু।"

গাড়ি থেমে গেল, ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী, আপনি এখানে কী করছেন? এখনও বাড়ি যাননি?"

ডাক্তারবাবুকে দেখে চৌবে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন, "নমস্তে, নমস্তে ডাক্তারসাব। ইনি আমার গুরু।"

"আপনার গুরু? আচ্ছা, আচ্ছা।"

"আসুন না, আজ আমাদের ফেস্টিভাল। সবাই মিলে একটু ভজন পূজন।"

"এখন তো সময় হবে না। দুপুরে আসব, হসপিটাল সেরে।"

কমল ভৌমিক পেছনের আসনে উঠে বসলেন। গাড়ি ছুটল।

নিতু জিজ্ঞেস করলে, "কী করছিলেন কাকু?"

"সত্যি কথা বলব, মারামারি। একটু গা-গরম করে নিলুম।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "গরম হয়েছে তো?"

॥ ২১ ॥

গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই রুকু আর ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রাজ্যেশ্বরী ছুটে এলেন। চিন্তায়-ভাবনায় সারারাত কেউ ঘুমোতে পারেননি। সারা বাড়ি থমথম করছে। কুকুরটাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। রাজ্যেশ্বরী ধরাধরা গলায় বললেন, "কী যে তোমরা করো, ভেবে পাই না। যেখানেই থাকো, বলেছি একটা ফোন করবে।"

ডাক্তারবাবু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, "বিশ্বাস করো, এমন দুর্যোগ গেল, ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। জানি তুমি খুব ভাবছ।"

কমল ভৌমিক বললেন, "বউদি, সে যা হল না! একটা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা যায়। ভাবছি, আজ দুপুর থেকেই বসে যাব।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "সে বসুন, ক্ষতি নেই। তবে তার আগে স্নানটান করে খাওয়া দাওয়া করে নিন। দেখেই মনে হচ্ছে সারারাত ঘুম নেই।"

নিতু ফিসফিস করে সুকুকে বললে, "আমি এইবার যাই দাদা।"

"কোথায় যাবে?"

নিতু উত্তর দিতে পারল না। সামনের ফুলে-ভরা স্থলপদ্ম গাছের দিকে উদাস মুখে তাকিয়ে রইল। মামার বাড়িতে যাবার সাহস নেই। মামা আর মামি দু'জনেই ধরে বেধড়ক পেটাবেন। নিতু আসার পরদিন থেকেই নিতুর মামিমা বলতে শুরু করেছেন, 'ছেলেটা এক নম্বরের অপয়া অলক্ষুনে। বাপ-মাকে খেয়ে এইবার আমাদের খেতে এসেছে।' বলার কারণ, নিতু আসার পরের দিন মামার বাড়ির পোষা বেড়ালটা রাতে ইঁদারায় পড়ে মারা গিয়েছিল। তারপর দুষ্টু ছেলেরা দোকানের কাচের বয়াম ভেঙে দিয়ে গেল। তারপর মামার হাজার টাকা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। প্রথমে সন্দেহ করা হল নিতুকে, 'তুই নিয়েছিস?' নিতু বলেছিল, 'হাজার টাকা নিয়ে আমি করবটা কী?' মামি বলেছিলেন, 'ফুর্তি করবে। ফুর্তি। অকালেই তো পেকে গেছ?' নিতু বলেছিল, 'আমাকে খুঁজে দেখো, নিলে তো টাকাটা বাড়িতেই রাখব। আমার তো একটাই জামা, আর একটাই প্যান্ট। তুমি পকেট দেখো।' 'মুখে মুখে তক্কো', মামিমা ঠাস করে এক চড় মেরেছিলেন। আর-একটা চড় তুলেছিলেন, নিতু মামিমার হাত মচকে দিয়েছিল। মহিলা লেগেছে কি লাগেনি, পাক্কা আধ ঘণ্টা, 'ওরে বাবা রে, আমায় মেরে ফেললে রে, আমায় মেরে ফেললে রে,' বলে কী চিৎকার! পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। হরেনমামা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নিতুকে বের করে দিলেন। সেদিন নিতুর আর খাওয়া জুটল না। নিতুকে ওই গভীর ইঁদারা থেকে দিনে অন্তত একশো বালতি জল তুলতে হয়। একগাদা মুরগি

পুষেছেন হরেনমামা, তাদের সেবা করতে হয়। কয়লার গুঁড়ো মাটি দিয়ে মেখে গুল দিতে হয়। সংসারের কত কী যে করতে হয় নিতুকে!

নিতু যখন কোনও উত্তর না দিয়ে ফুলগাছের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, তখন কমল ভৌমিক রাজ্যেশ্বরীকে বলছেন, "ফার্স্ট থিং ইন দি মর্নিং, এক গেলাস ঘোল খাওয়া উচিত। সকালে ঘোলের মতো উপকারী আর কিছু নেই।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "এখন আর মর্নিং নেই। আর কিছুক্ষণ পরেই ইভনিং।"

"এখনও কারও ব্রেক্‌ফাস্ট হল না, ইভনিং হয় কী করে!"

নিতু মাথা নিচু করে যাবার জন্যে পা বাড়াল। সুকু বললে, "দাঁড়াও। তোমার যাওয়া হবে না।"

নিতু চোখ তুলে তাকাল। নিঃশব্দে কাঁদছে। হরেনদা চুল কামিয়ে ন্যাড়া করে দিয়েছেন। ডোরাকাটা জামাটা ময়লা হয়ে গেছে। কুঁচকে মুঁচকে শ্রীহীন। প্যান্টে জিপগাড়ির ময়লা, তেলকালি। ফরসা টকটকে রং রোদে পুড়ে তামাটে। নিতু সুকুর চেয়ে সুন্দর। নিতুর ঠোঁট কাঁপছে, কথা বেরোচ্ছে না।

কমল ভৌমিক হঠাৎ ফিরে তাকালেন। এতক্ষণ নিজের খেয়ালে ছিলেন। নিতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী, মাই ফ্রেন্ড, তোমার চোখে জল কেন? তোমার কীসের দুঃখ আমাকে বলো।"

পকেট থেকে পরিষ্কার একটা রুমাল বের করে নিতুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ মোছাতে লাগলেন। কমল ভৌমিকের স্নেহে নিতুর কান্না আরও বেড়ে গেল। আজ পর্যন্ত নিতু কারও কাছে কখনও স্নেহ পায়নি। শুধু বকুনি আর গালাগাল পেয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আহা, ছেলেটার খিদে পেয়েছে।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বোকা ছেলে। আমি কত কী রেঁধে রেখেছি, সব চান করে এসো না। খেতে দি।"

কমল ভৌমিক বললেন, "না, না, আমি আর উৎপাত করব না। আমি বরং চৌবের উৎসবে যাই।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "যান তো দেখি, কেমন যেতে পারেন। এত দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা নিয়েও আমি সারা সকাল বসে বসে রাঁধলুম কীসের জন্যে? না খেয়ে চলে যাবার জন্যে? আসুন। ভেতরে আসুন সব।"

কমল ভৌমিক নিতুকে বুকের কাছে ধরে রেখেছিলেন, এইবার তার হাত ধরে, সবার আগে বাড়ি ঢুকলেন। নিতু কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। সহজ হতে পারছে না। কেবলই তার মনে হচ্ছে, ভগবানদাসের কাছে চলে

যায়। ভগবানদাসের আশ্রমে। মাথাটা তো ন্যাড়াই আছে। মাঝে মাঝে ভয় আসছে, আবার যদি ভগবানদাসের আশ্রম থেকে বেঁটে ধরে নিয়ে যায়! তা হলে আর আস্ত রাখবে না। নিতু ভাবছে, এই যে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে দূরে পাহাড়তলির পাশ দিয়ে কোথায় না কোথায় চলে গেছে, একা-একা আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে। কোথাও না কোথাও এই পথ তাকে নিয়ে যাবে। তার তো কেউ কোথাও নেই। ভয় কী। যেখানে থাকবে, সেইটাই তার বাড়ি। যার কাছে থাকবে সে-ই হবে আপনজন।

রাজ্যেশ্বরী এগিয়ে এসে নিতুর হাত ধরলেন। ছেলেটা অযত্নে রোগা হয়ে গেলেও, শরীরের কাঠামো বেশ শক্ত। কবজির হাড় বেশ চওড়া। একটু আদর-যত্ন, সময়মতো, নিয়মে খাবার দাবার পেলে দারুণ স্বাস্থ্য হবে। রাজ্যেশ্বরী মনে পড়ে গেল নিজের বাবার কথা। লম্বা, চওড়া, কী সুন্দর শরীর ছিল তাঁর। শিকারি ছিলেন। পেশায় ছিলেন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার। এইখানে বেড়াতে এসে মারা গেলেন। সে-মৃত্যুর রহস্য কেমন যেন! স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক? শাড়ির আঁচল দিয়ে নিতুর মুখ মোছাতে মোছাতে তিনি যেন ছেলেটার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। বিশাল চেহারা হয়েছে। ফরসা টকটকে রং। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ভাল শিকারি। তাঁর বাবার রাইফেল আর বাইনোকুলার নিতুর কাঁধে। রাজ্যেশ্বরীর চোখেও জল এসে গেল। সুকু বললে, "মা, আজ থেকে আর-একটা ভাই হল।"

রাজ্যেশ্বরী বড় বড় টানা টানা, মা দুর্গার মতো চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। ঠোঁটে হাসি, চোখে জল।

কমল ভৌমিক বললেন, "বউদির চোখে জল চিকচিক করছে কেন? হিরের দানার মতো?"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "জল না-পড়লে শক্ত মাটি নরম হয় না।"

"আঃ, দারুণ বলেছেন, এইটা আমি আমার উপন্যাসে লাগাব কোথাও।"

"লিখছেন বুঝি?"

"এখনও শুরু করিনি। ব্যায়ামের আগে জগিং-এর মতো, মনটাকে নাচিয়ে নাচিয়ে গরম করছি।"

"ওদিকে সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

নিতু, সুকু আর রুকু তিনজনে মিলে বাগানের ধারে ইঁদারায় চান করতে গেল। ইঁদারার বাঁধানো বেদির চারপাশে গোলাপ গাছ। সাদা, লাল, হলদে, গাঢ় বেগুনি। বড় বড় হয়ে ফুটে আছে। সার সার মন্দির-ঝাউগাছের মাঝখান দিয়ে নুড়ি বিছানো একটা পথ চলে গেছে পেছনের পাঁচিলের দিকে। সেখানে তারের জাল ঘেরা বিশাল বিশাল খাঁচায় সুকুর প্রাণী-হাসপাতাল।

সে-এক মজার জিনিস। প্রকৃতির স্বাধীন জীবকে সুকু খাঁচায় বন্দি করতে চায় না। যেসব প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে, খুঁজে খুঁজে তাদের তুলে এনে তার এই হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করে। এখন ওখানে একটা খরগোশ আছে। খরগোশটার পিঠে একটা ক্ষত আছে। কেউ তিরই মারুক, কি ধারালো কোনও অস্ত্র। মরেই যেত। সুকুর সেবায় বেঁচে আছে। বিরাট একটা চিল। ঘুড়ি ওড়াবার মাঞ্জায় তার ডানদিকের ডানাটা অকেজো হয়ে গেছে। বেচারা ওড়ার চেষ্টা করেও মুখ থুবড়ে পড়ে যায় কেবল। চিকিৎসা চলেছে। মনে হয় ভাল হয়ে যাবে। ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর আছে। পায়ে প্লাস্টার। একটা শজারু আছে। কেউ মনে হয় কলাগাছের কাণ্ড মেরে খাবে বলে শিকারের তালে ছিল। শজারুটার শোচনীয় অবস্থা। অনেকগুলো কাঁটা খুলে চলে গেছে। এইসব প্রাণীরা সুকুকে ভীষণ ভালবাসে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, যে যেভাবে পারে ভালবাসা জানাবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। অত বড় একটা চিল, যার কাজই হল ছোঁ মেরে শিকার ধরা, সেই চিলও সুকুর পোষা। এমনকী, সুকুর আদেশ বুঝতে পারে।

ইঁদারার উঁচু পাড়ে দাঁড়ালে সব দেখা যায়। চারপাশে বাগান। মাঝে বাংলো ধরনের সুন্দর বাড়ি। কতরকমের গাছ! কতরকমের পাখির আসা-যাওয়া। নিতু হাঁ করে দেখছে আর ভাবছে, তার যদি বাবা-মা থাকতেন, আর তাঁরা যদি এইরকম হতেন, তা হলে নিতুও এইরকম একটা বাড়ি পেত, ভাল স্কুলে পড়তে পারত! তার খুব বাগান করার শখ। ভাল ভাল ফুলগাছ এনে চারপাশে লাগাত। কুকুর ভালবাসে। বিলিতি একটা কুকুর পুষত, ওই যেমন কুকুর তাদের ওখানে কাঠকলের ম্যানেজারের আছে। সোনালি লোম, ভাল ছেলের মতো মুখ।

রুকু বললে, "নাও, চান করো। ওই দেখো, মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।"

নিতু বললে, "কী সুন্দর! আপনাদের বাড়িটা!"

রুকু হাহা করে হেসে বললে, "আপনি কী গো! বলো তুমি। তোমার এত ভয় কেন?"

সুকু বললে, "নাও, বোসো, আমি তোমার মাথায় জল ঢেলে দি।"

নিতু বললে, "এখানে মামার বাড়িতে রোজ আমাকে একশো-দেড়শো বালতি জল তুলতে হয়। তোমরা বোসো, আমি ঢালি।"

সুকু বললে, "এটা তোমার মামার বাড়ি নয়, আজ থেকে নিজের বাড়ি।"

নিতু বললে, "আমার এমনি এমনি থাকতে লজ্জা করবে। মাকে বোলো, আমাকে চাকর রাখতে।"

সুকুর বড় বড় চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল, "কী বললে তুমি?

তোমাকে মা চাকর রাখবে! আমাদের ভাই ভাবতে তোমার কষ্ট হচ্ছে? তুমি নীচ, তুমি...তুমি...।"

সুকুর কথা আটকে গেল। তার চোখে জল টলটল করে উঠল। একলাফে ইঁদারার পাড় থেকে নেমেই বাড়ির দিকে ছুটল।

রুকু বললে, "এ তুমি কী বললে! আমার ভাইকে তুমি চেনো না! ওর কাছে আপন-পর নেই।"

নিতু ভয়ে ভয়ে বললে, "এখন কী হবে?"

সুকুকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে রাজ্যেশ্বরী গলা চড়িয়ে বললেন, "কী হল তোর? বলি হলটা কী?"

সুকু মাথা নিচু করে রাজ্যেশ্বরীর পাশ কাটিয়ে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেল। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "কী হল আবার? এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না বাবা!"

কমল ভৌমিক বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোতে বেরোতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমস্যা বউদি? আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?"

"ওই যে সুকুটা, তিনজনে মিলে ইঁদারায় স্নান করতে গেল, উনি স্নান না করে হনহন করে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মাথায় এক খাবলা তেল, পিঠে এক খাবলা তেল, বেলা পড়ে এল। এরপর চান করলে তো অসুখ করবে।"

রুকু ছুটে এসেছে। নিতু পেছনে। ভয়ে ভয়ে চোরের মতো আসছে।

রাজ্যেশ্বরী রুকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে রে? ঝগড়া?"

"না, মা, ঝগড়া নয়? নিতু বলেছে, 'কিছু না করে আমার এ-বাড়িতে থাকতে লজ্জা করবে। তোমার মাকে বলো, আমাকে চাকর রাখতে।'"

নিতু বারান্দার থামের আড়ালে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজ্যেশ্বরী সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, "বেরিয়ে আয় আড়াল থেকে। শিগগির আয়।"

নিতু পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রাজ্যেশ্বরীর সামনে। রাজ্যেশ্বরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুই থাকবি এখানে। আমার রুকু যেমন, আমার সুকু যেমন, তুইও তেমনি। যা, সুকুকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চান সেরে আয়। আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। কাল থেকে উপোস করে আছি।"

কমল ভৌমিক তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, "আপনারা আছেন বলে এই পৃথিবীতে বারে বারে আসতে ইচ্ছে করে।"

রুকু ঘর থেকে চেঁচাচ্ছে, "ও মা, সুকু বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, কিছুতেই উঠছে না।"

কমল ভৌমিক বললেন, "দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। চ্যাংদোলা করে তুলে বাথটাবে ফেলে দিচ্ছি।"

নিতু সুকুর মাথায় হাত রেখে, কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "সুকুদা, আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে, তুমি ওঠো। কাল থেকে মা না খেয়ে আছেন।"

সুকু মায়ের কষ্ট একেবারে সহ্য করতে পারে না। আর সুকুর কাছে কেউ দোষ স্বীকার করলে, তার সাতখুন মাপ। সুকু ধড়মড় করে উঠে বসল।

খাওয়ার পাট সবে চুকেছে, হরেনদা এসে হাজির। সামনেই নিতুকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "কাল থেকে কোথায় আড্ডা মারতে গিয়েছিলে? তুমি বাড়ি চলো, তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।"

কমল ভৌমিক এক গেলাস জলে পাতিলেবু গুলছিলেন, মুখ না তুলে বললেন, "কী করে ছাড়াবেন?"

"কী ছাড়াব?"

"ওই যে বললেন, চামড়া ছাড়াবেন।"

"সে যখন ছাড়াব, যার ছাড়াব, সে ঠিক বুঝবে, আপনাকে ভাবতে হবে না।"

কমল ভৌমিক ঢকঢক করে লেবুর জলটা খেয়ে ফেললেন। তারপর গেলাসটা নামাতে নামাতে বললেন, "মাথায় জল মেখে আসুন। চেয়ারে বসে হবে, না ইটে বসে হবে?"

"তার মানে?"

"মানো একটু পরেই বুঝতে পারবেন। আগে জিনিসটা আনাই। ধারটা পরীক্ষা করে নি।"

"কী বলছেন, কী!"

কমল ভৌমিক চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁক পাড়লেন, "সুকু, মাস্টার সুকু।"

॥ ২২ ॥

কমল ভৌমিকের হাঁক শুনে, রুকু, সুকু, রাজ্যেশ্বরী, ডাক্তারবাবু সবাই ছুটে এসেছেন। হরেনদা একটা চেয়ারে ফ্যালফ্যালে মুখ করে বসে আছেন। নিতু একপাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে। আর কমল ভৌমিক যেন স্টেজে উঠেছেন। এক্ষুনি নতুন একটা খেলা শুরু হবে, এইরকম একটা ভাব।

কমল ভৌমিক রুকু আর সুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এক মগ জল আর ভোঁতা একটা ক্ষুর আনতে পারো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ও হো, সকাল থেকে আপনার দাড়ি কামানো হয়নি, আমি খেয়াল করিনি! এক্সকিউজ মি! ক্ষুর কী হবে, আমার নতুন শেভিংসেট আছে!"

"ব্লেড দিয়ে তো আর মাথা কামানো যাবে না?"

"আপনি ন্যাড়া হবেন?"

"ন্যাড়া হব না, ন্যাড়া করব!"

"কাকে ন্যাড়া করবেন?"

"এই মহামান্য ভদ্রলোককে!"

"ন্যাড়া করবেন কেন?"

"আপনি জানেন, নিজেদের হাতে পেয়ে এই মাথামোটা ভুঁড়িদাস ভদ্রলোক এই বাচ্চা ছেলেটার, যে নাকি ওর ভাগনে, এই শীতে মাথাটা কামিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

কমল ভৌমিক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। মুখ-চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। ঘরময় পায়চারি করছেন আর বলছেন, "জানেন, জোর করে ধরে কারও চুল কামিয়ে দেওয়া একটা কত বড় অপমান। কত বড় ইনসাল্ট। সেই মুহূর্তে এই নিরীহ ছেলেটার মনের অবস্থা কী হয়েছিল আপনারা ভাবুন। আমরা আমাদের পাড়ায় একবার একটা চোরকে ধরে স্রেফ ন্যাড়া করে ছেড়ে দিয়েছিলুম।"

হরেনদা, হাউহাউ করে বললেন, "ও চোর! আমার দেড় হাজার টাকা খোয়া গেছে।"

"ও যদি নিয়েই থাকে, টাকাটা রেখেছে কোথায়?"

"চোর কি নিজের কাছে চোরাই মাল রাখে, পাচার করে দিয়েছে!"

নিতু কান্নাজড়ানো গলায় চিৎকার করে বললে, "মিথ্যে কথা! টাকা আমি নিইনি। চোর আমি না, চোর আমার মামা!"

"কী বললি?" হরেনদা ঘুসি পাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে তেড়েমেড়ে উঠতে গেলেন। মোটা বেমক্কা শরীর। কোমরে বাত, আবার ধপাস করে বসে পড়লেন। বসেই বললেন, "একটা একটা করে তোর সব ক'টা দাঁত আমি কাঁচা উপড়ে নোব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তাই নাকি?"

নিতু মরিয়া। সে তখন বলতে শুরু করেছে, "আমি নিজে দেখেছি, মামাকে বিছানার তলা থেকে নিয়ে নিতে। আমি ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলুম। মামা ভেবেছিলেন আমি ঘুমোচ্ছি। আমি তখন জেগেই ছিলুম।"

হরেনদা বললেন, "মিথ্যে কথা! নিজের টাকা কেউ নিজে চুরি করে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "টাকাটা আপনি আপনার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। ওই টাকার ওপর আপনার কোনও অধিকার ছিল না, তাই আপনি চুরির পথ ধরেছিলেন। নিজের পাপ এখন এই নিরীহ ছেলেটার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন?"

"হঠাৎ এর ওপর আপনার এত দরদ কেন? মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। এ আমার ভাগনে, না আপনার ভাগনে?"

"আপনার ঘোড়ার ডিম। আপনি দয়া করে এখান থেকে সরে পড়ুন। ক্রমশই আমার রাগ বাড়ছে।"

"জানোয়ারটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তারপর কী দাওয়াই দিতে হবে আমার জানা আছে!"

"আপনার দাওয়াই আবার আমার হাতে!"

কমল ভৌমিক সুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার সেই শিশিটা আনো তো!"

"কাকু, কোন শিশিটা?"

"ওই যে গো, যেটার মধ্যে তুমি কাঁকড়া বিছে ধরে রেখেছ। আর রুকু তুমি সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দাও!"

"কেন কাকু?"

"এটা আমাকে মুচিপাড়া থানার ওসি শিখিয়েছিলেন। অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের পুলিশি কায়দা। হরেনবাবুকে চিত করে ফেলব, ফেলে ভুঁড়ির ওপর কাঁকড়া বিছেটাকে ফেলে পাঞ্জাবিটা টেনে নামিয়ে দোব। লাগ ভেলকি লাগ।"

কমল ভৌমিক প্রেমদাতা নিতাইয়ের মতো নাচতে যাবেন, নাচা হল না। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির গেটে। চৌবের গলা, "ডাক্তারবাবু, গুরুজি, আপ সব কাঁহা গিয়া!"

চৌবে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। পেছন পেছন এল চৌবের কালো অ্যালসেশিয়ান। বিশাল তাগড়া চেহারা। আধ হাত লম্বা জিভ সামনে লকলক করছে। মাথাটা নিচু হয়ে আছে মাটির দিকে। নাক ফোঁস ফোঁস করছে। চৌবের চোখ পড়ল হরেনদার ওপর। চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। গোরিলার মতো ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

"আরে হোরেনবাবু যে।"

চৌবে ইচ্ছে করেই গোরিলার মতো সামনের দিকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে এগোতে লাগলেন হরেনদার দিকে। চৌবেকে দেখে হরেনদা কেমন যেন হয়ে গেলেন। ভুঁড়ি চুপসে গেছে। মুখ ঝুলে গেছে। চোখ ছোট হয়ে গেছে।

চৌবে আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হোরেনবাবু নিজেকে খুব চালাক ভাবো! হোরেনবাবু? ভেবেছিলে আর দেখা হবে না! জালি নোটের কারবার কতদিন ধরে চলছে! হোরেনবাবু, রোজ রাতে ভৈরব পাহাড়ের দিকে কেন যাওয়া হয়! কী আছে সেখানে?"

হরেনদা চেয়ার ছেড়ে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করছেন। চৌবে খপ করে বুকের কাছে পাঞ্জাবিটা খামচে ধরলেন, "ভাগছেন কোথায়? চৌবের চোখে ধুলো দিয়ে কেউ পালাতে পারে না!"

ডাক্তার মুখার্জি এতক্ষণ পাশের ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। একগাদা বই পেড়েছেন তাক থেকে। আফ্রিকার অসুখ স্লিপিং সিকনেস সম্পর্কে আরও কিছু জানা দরকার। সুদর্শনকে বাঁচাতে হবে। সরল, আধপাগলা, ভবঘুরে একটা মানুষ। বাইরের ঘরে গোলমাল শুনে বই ফেলে চলে এলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এসব কী হচ্ছে? চৌবেজি এটা ঠিক হচ্ছে না! এ বাড়ির পবিত্রতা আপনি নষ্ট করবেন না!"

"ডাক্তারসাব! এ ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। আমি আপনার ফোনটা ইউস করছি ডাক্তারসাব।" চৌবে হরেনকে ছেড়ে ফোন তুললেন। "পুলিশ!"

কমল ভৌমিক হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে বললেন, "জানতুম, জানতুম, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হরেনবাবু নিতাইকে ধরতে এসেছিলেন। যাক কিছুদিন ঘুরে আসুন।"

হরেনদা দেয়াল ঘেঁষে মেঝের ওপর থেবড়ে বসে পড়েছেন। মুখ-চোখ কেমন হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী, ব্যাপার কী, থানা-পুলিশের কী হল? কী করেছেন কী হরেনবাবু।"

ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে চৌবে বললেন, "নোট জালের কারবার করেছেন!"

হরেনবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা!"

"মিথ্যে কথা?" চৌবে এক দাবড়ানি দিলেন। "আপনি আমার কাছ থেকে একটা গোরু কিনেছিলেন। কিনেছিলেন কি না?"

"হ্যাঁ।"

"বিলিতি জার্সি গোরু!"

"হ্যাঁ।"

"ছ'হাজার টাকা দাম চেয়েছিলুম, আপনি চার হাজারে রফা করেছিলেন? দু'হাজার, দু'হাজার, দু'কিস্তিতে দেবার কথা!"

"দু'হাজার দিয়েছি!"

"সেই দু'হাজার টাকাই জাল! কোত্থেকে পেয়েছেন আপনি ওই নোট?"

হরেনদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "প্রমাণ কী, যে আমি আপনাকে জাল নোট দিয়েছি? মিথ্যে কথা!"

"ঘণ্টাখানেক পরেই আপনি বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল? হোরেনবাবু বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যান। পেমেন্ট যখন করেছিলেন, তখন আমি

নোটের নম্বর লিখিয়ে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলুম। সেই কাগজটা আছে! আর পুলিশ আসছে, দোকান আর বাড়িটা সার্চ করাই, তারপর সত্য-মিথ্যার বিচার হোবে হোরেনবাবু?"

হরেনদা যেখানে বসেছেন, তার থেকে হাত দুয়েক দূরে কমল ভৌমিক মেঝের ওপর থেবড়ে বসলেন। চৌবে বসে আছেন টেলিফোন যেখানে, সেইখানে। ডাক্তারবাবু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মানিপ্ল্যান্টের পাতা চকচকে করছেন। রুকু, সুকু, নিতু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

কমল ভৌমিক অনেকক্ষণ ধরে হরেনবাবুর মুখ দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, "আপনি এতটা খারাপ! নোট জাল করার মতো খারাপ! মনে তো হয় না! ছোটখাটো অপরাধ, ছিঁচকে চুরি, করতে পারেন! স্ত্রীর জমানো টাকা খাটের তলা থেকে সরিয়ে ভাগনের ঘাড়ে চাপাতে পারেন। তা বলে নোট জাল! না না চৌবে, এ তুমি কী বলছ?"

"আমি আর কী বলব গুরুজি! আমাকে যে-টাকা উনি পেমেন্ট করেছেন, সেই টাকা নকলি টাকা।"

পুলিশ এসে গেল। একজন নয়, এক দল। গ্যাটম্যাট করে ঢুকে এল ঘরে। অফিসার বললেন, "চৌবেসাব, কোথায় সেই জালিয়াত?"

হরেনবাবু পুলিশ দেখে ঠিক ছোট ছেলের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেন।

অফিসার বললেন, "এ কেয়া? এতনা বড়া আদমি। রোতা! রোলা দিয়া কিঁউ।"

চৌবে বললেন, "প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদলেই কি পুলিশ ছেড়ে দেবে?"

হরেনদা ভেউ ভেউ করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, পুলিশবাবু, টাকাটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। আর পেয়েছিলুম বলেই গোরু কিনতে গিয়েছিলুম।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ঝেড়ে কাশুন না মশাই। কাশছেন না বলেই তো কাফ মিক্সচার আসছে তেড়ে।"

ডাক্তার মুখার্জি মানিপ্ল্যান্ট ছেড়ে এগিয়ে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি। আপনার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনি। আপনি বেশি কথা বলেন। বোকা বোকা ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে বেশ ধূর্ত, বিষয়ী। স্বার্থপর। তা বলে আপনি নোট জাল করবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।"

চেয়ার টেনে ডাক্তারবাবু বসলেন। পুলিশ অফিসার ডাক্তারবাবুকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। তিনি আর একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলেন। হাতের রুলটাকে মাঝে মাঝে নাচাচ্ছেন। অফিসার বললেন, "বলুন, বলুন, সত্য উদ্‌ঘাটন করুন। সত্য হল সূর্য। সেই সূর্যের আলোতে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাক!"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই কাব্যিক পরিবেশে বেশ কবিতার মতো করে কবুল করে ফেলুন, কোথা থেকে পেলেন হাজার হাজার টাকার নোটের তাড়া!"

"পেয়েছি গর্ত থেকে।"

পুলিশ অফিসার হা হা করে হাসলেন, "গর্তে সাপ থাকে, গর্তে ইঁদুর থাকে, গর্তে আজকাল টাকাও থাকে!"

"বিশ্বাস করুন, যে জায়গায় উইলিয়ামসনের ভাঙা বাড়িটা রয়েছে, ওইখানে কারা মাটি আর পাথর কেটে তুলে নিয়ে যাবার ফলে বেশ বড় একটা গর্ত হয়েছে। সেই গর্তে জন্মেছে অনেক আগাছা। তার সেই আগাছার মধ্যে পড়ে ছিল একটা সুটকেস। সেই স্যুটকেসে থাকে থাকে সাজানো ছিল নোট।"

অফিসার বললেন, "এখন মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ওই উইলিয়ামসনের পোড়ো বাড়ির গর্তে আপনি কেন গিয়েছিলেন?"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভাল প্রশ্ন। অবশ্যই জানা দরকার, কেন আপনি গিয়েছিলেন?"

হরেনদা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন চুপ করে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "উত্তর দিন! উত্তর দিন!"

হরেনদা মুখটাকে করুণ করে বললেন, "লজ্জা করছে!"

"এতে লজ্জার কী আছে? লজ্জার কী আছে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনি না পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষের আবার লজ্জা কীসের?"

হরেনদা বললেন, "যেতে যেতে হঠাৎ পেটটা কেমন করে উঠল। তারপরই বুঝতে পারছেন, তারপর...।"

অফিসার বললেন, "অ বড়বাইরে। আই সি, আই সি! পেলেন পেলেন, টাকাগুলো যদি আসল হত! যাক তা হলে চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই!"

হরেনদা বললেন, "কোথায় যাব?"

"কেন, থানায়! একটু ঘানিটানি ঘুরিয়ে ভুঁড়ি কমিয়ে ফিরে আসবেন।"

চৌবে বললেন, "জায়গাটা একবার দেখে আসা দরকার। হোরেনবাবুর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আশেপাশে কোথাও জালি নোট তৈরি হচ্ছে। সেই আস্তানাটা ভাঙতে হবে।"

হরেনদা বললেন, "এ হল নেপিয়ারের কাজ। নেপিয়ার আমাকে জিপ চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।"

অফিসার বললেন, "তাই নাকি? তা হলে তো আমাদের ফিল্ডে নামতে হবে। তা হলে চলুন উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোয় যাই। তা হরেনবাবু, টাকাটা যখন পেলেন তখন থানায় জমা দিলেন না কেন?"

হরেনদা মাথা চুলকে বললেন, "লোভ। আমার বউয়ের লোভ।"

॥ ২৩ ॥

উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোয় সুকু অনেকবার গেছে। সেখানে এখনও একটা বাগান আছে। ভাল ভাল গাছ অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুকু মাঝে মাঝে সেই বাগান থেকে চারা তুলে এনে নিজেদের বাগানে লাগায়। এই তো সেদিন একটা মুসান্ডা তুলে এনে লাগিয়েছে। গাছটা বেঁচেও গেছে। ওই বাগানে সাত-আটটা ম্যাগনোলিয়া গাছ আছে। ফুল যখন ফোটে গন্ধে চারপাশ একেবারে মাত হয়ে যায়। ইয়া বড় বড় চাঁপা রঙের ফুল। সুকু গাছ ছাড়াও আরও একটা কারণে যায়। উইলিয়ামসনের গ্রেহাউন্ড কুকুরটা এখনও ওই বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। বয়েস হয়ে গেছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। অবিরত জল পড়ে। বাগানের শেষ মাথায় সায়েবের ছোট্ট মেয়ে লিলির সমাধি। কুকুরটা সারাদিন, সারারাত সেই সমাধির পাশে শুয়ে থাকে। সুকু রোজ গিয়ে সেই কুকুরটাকে খাইয়ে আসে। ওষুধ খাওয়ায়, চোখে আই ড্রপস দেয়। কুকুরটা এখন সুকুর পরম বন্ধু।

থানা অফিসার হরেনদাকে নিয়ে চলে গেলেন। ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আমার আর ভাল লাগছে না। এক-একটা সময়ে, এক-একটা ব্যাপারে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমার কাজকর্ম, লেখাপড়া সব মাটি হয়ে গেল। আমি এখন লেখাপড়া করতে চললুম।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমারও খুব ক্ষতি হয়ে গেল। আজ আমার পায়ের ব্যায়াম করার দিন।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সে আবার কী? শুধু পা! হাত, বুক, গলা?"

চৌবে বললেন, "ডক্টরসাব, মডার্ন মেথডে এক-একদিন এক-এক অঙ্গের ব্যায়াম করতে হয়। আজ আমি বুকের ব্যায়াম করেছি। সাড়ে সাতশো ডন মেরেছি সাতবারে।"

"ভাল করেছেন। আমি এখন চললুম।"

চৌবে বললেন, "আজ যখন সব গোলমাল হয়ে গেল, তখন আরও একটু হোক। আমার ফাংশানে চলুন। সকলে মিলে বেশ একটু আনন্দ করা যাক।"

"আমার কাজেই আনন্দ। আমার এক রুগি হাসপাতালে পড়ে আছে। যায় যায় অবস্থা। তার জন্যে পড়াশোনা করতে হবে। আমি ক্ষমা চাইছি। কমলবাবুকে নিয়ে যান।"

"গুরুজি তো যাবেনই। আপনারাও চলুন না। জাস্ট ফর এ ডে।"

"উপায় নেই চৌবেসাব। কর্তব্য আগে, আনন্দ পরে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আজ আমাদের ছেড়ে দাও চৌবে। আজ আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। এই ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হরেনবাবুর ভাগনে।"

"কী হয়েছে ওর?"

নিতুর দিকে চোখ গেল চৌবের। নিতু একপাশে বসে আছে। কেমন যেন হয়ে গেছে! হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়, নিতুর মনের অবস্থা সেইরকম। ডোরাকাটা জামাটা কেচে দিয়েছে। শুকিয়ে গেলে পরতে হবে। আর পরলেই জানে, তার মন ঠিক হয়ে যাবে। পথ দেখতে পাবে। নিতুর বাবা যাবার আগে বলেছিলেন, এই জামা তোমার বিপদের বর্ম।

কমল ভৌমিক বললেন, "হরেনবাবু ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

চৌবে বললেন, "তাতে কী হয়েছে! আমি আছি তো! আমি ওকে মানুষ করে দেব। মিশনারি স্কুলে ভরতি করে দেব। আমার বাড়িতে থাকবে। আমার ছেলেপুলে নেই। আমার স্ত্রী খুব খুশি হবেন। সুন্দর চেহারা। এখন থেকে ব্যায়াম করলে আমার মতো চেহারা হবে।"

"না না, ওর থাকার কোনও সমস্যা নেই। বউদি ভার নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ওকে এখানে রাখা যাবে না। হরেনবাবুর অনেক শত্রু। তারা ওর ক্ষতি করবে। এই তো কালই ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কে, কে? কে কিডন্যাপ করেছিল? গুরুজি, আমি কি মরে গেছি! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আমি দেখে নিতে চাই। চৌবে বন্দুক ছেড়েছিল। আবার বন্দুক ধরবে।"

"ধরেছিল বেঁটে।"

"বেঁটে? বেঁটে আবার ফিরে এসেছে আমার টেরিটোরিতে! আচ্ছা! ভেবেছে আমি কমজোর হয়ে গেছি? আজ রাতেই আমি ব্যবস্থা করছি। কোনদিকে গেছে?"

"মনে হয় পাহাড়ের দিকে।"

"আচ্ছা! আজই আমি ঘোড়া ছোটাব।"

"তোমার উৎসব?"

"ডাক্তারসাব বললেন, কর্তব্য আগে, আনন্দ পরে।"

"মেরে ফেলবে? খতম করে দেবে?"

"না না, খতম কেন করব। আমি খুনি নই। হাত-পা বেঁধে শিশুগাছে ঝুলিয়ে দেব। সাতদিন ঝুলে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। তলা থেকে গন্ধকের ধোঁয়া দেব। ব্যাটার চরিত্র বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।"

"আর, ধরো, যদি মরে যায়?"

"মরে গেলে বুঝব, ব্যাটা দুবলা ছিল। মানুষ তো একদিন মরবেই গুরুজি। কে কবে চিরকাল বাঁচে।"

চৌবে চলে গেল। মুখ দেখে মনে হল, খুব রেগে গেছে। কমল ভৌমিক সুকুকে বললেন, "আমি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার জন্যে তোমাদের ছাতে চললুম, একটা কিছু দিতে পারো, পেতে একটু গড়িয়ে নেব।"

রুকু বললে, "আপনি এই ডিভানে শুয়ে পড়ুন, কেউ বিরক্ত করবে না।"

"আরে সে তো আমি জানি, কিন্তু খোলা আকাশের নীচে চিত হয়ে শোওয়ার আনন্দ জানো? ওপরে ঘন নীল আকাশ, পাখি উড়ছে। প্লেনের মতো ডানা মেলে চিল ভাসছে। উঃ, ভাগ্যিস জন্মেছিলুম, তাই তো এইসব দেখতে পাচ্ছি।"

কমল ভৌমিক আপনমনে গান গেয়ে উঠলেন, "তাই তোমার আনন্দ আমার পর/ তুমি তাই এসেছ নীচে/ আমার নইলে ত্রিভুনেশ্বর/ তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

রাজ্যেশ্বরী দরজার কাছ থেকে বললেন, "আপনি এত ভাল গান জানেন। থামলেন কেন? ওই গানটা আমার ভীষণ প্রিয়।"

"জানেন বউদি, এটা হল আমার আসনের গুণ। তেড়ে একমাস শশঙ্গাসন করলেই গলা একেবারে মিছরির ছুরি। হাঁ করলেই সুর ঝরবে।"

রাজ্যেশ্বরী রুকুকে বললেন, "হারমোনিয়ামটা কাকুকে এনে দাও তো!"

কমল ভৌমিক বললেন, "বউদি, এখন কি ঠিক হবে! ও-ঘরে দাদা লেখাপড়া করছেন।"

"ওঁর কানের কাছে ঢাক-ঢোল বাজালেও কিছু হবে না। পড়তে বসলে মনটা লেগে যায়।"

"দাদা আমার যোগী।"

হারমোনিয়াম এসে গেল। কমল ভৌমিক সেইরকম গাইয়ে, যাঁকে বেশি খোশামোদ করতে হয় না।

হারমোনিয়াম আসতেই গান ধরে ফেললেন, "আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা/আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা/ মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে/ তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

গান না শুনলে বোঝাই যেত না কমল ভৌমিক কত উঁচু দরের গাইয়ে। ডাক্তারবাবু ডাক্তারি বই ছেড়ে কার্পেটের একপাশে এসে বসলেন। তাঁর চোখ দুটি ছলছল করছে। গান শুনলে তাঁর মনটা কেমন করে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে আসে অতীতের সব দৃশ্য। বাবার হঠাৎ মৃত্যু, মায়ের মৃত্যু। কাশীর গঙ্গার ঘাটে প্রায় সন্ধেবেলা মালা জপ করতে করতে মা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। সূর্য অস্ত গেল, মা-ও অস্ত গেলেন। কী যে হয়, গান শুনলেই দুঃখের দরজা খুলে যায়। মনের ভেতর হুহু করে বইতে থাকে উত্তুরে বাতাস। গান শেষ হল।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আপনি কত ভাল গান করেন, তার প্রমাণ ডাক্তারকে বই-ছাড়া করেছেন। এমন হয় না।"

ডাক্তার বললেন, "জিমন্যাস্টিক ছেড়ে আপনি গানের লাইনে চলে আসুন। প্রকৃতই অসাধারণ।"

কমল ভৌমিক চোখ ছলছল করে বললেন, "আর আমার গান, আমার আবার লাইন, আমার জীবন হল বহতা পানি আর রমতা যোগীর মতো। ওই নিতুতে আর আমাতে কোনও তফাত নেই। কলকাতায় পড়ে থাকি আমার ক্লাবঘরের আটচালায়, সকালে হেদুয়াতে চান আর সাঁতার একসঙ্গে সেরে নিই। ওই যে আমার বাড়িটাড়ির কথা বলছিলুম না, ও প্রায় গল্পের মতো। থেকেও নেই। বিরাট তিনতলা বাড়ি। দূর থেকে দেখি। ঢোকার উপায় নেই, সাতটা মামলা ঝুলছে। বাবাতে, জ্যাঠাতে, কাকাতে। দু'বার মর্টগেজ পড়ে গেছে। আমার হল ভোজন যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আপনি আমাদের কাছে থাকুন।"

"কতজনকে পালন করবেন বউদি! বাড়িটা যে শেষে আশ্রম হয়ে যাবে বউদি।"

ডাক্তার বললেন, "এটা তো আশ্রমই কমলবাবু। আমার অনেক প্ল্যান আছে। এতকাল নিজের জন্যে বেঁচেছি, প্রায়ই ভাবি, এবার অন্যের জন্যে বাঁচা শিখতে হবে। অবশ্য আপনার তো আবার নিজের প্রতিষ্ঠান রয়েছে কলকাতায়, এখানে থাকলে কে চালাবে?"

কমল ভৌমিক হারমোনিয়ামে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, "কলকাতার ক্লাব তুলে নেবার সময় হয়েছে। আমাদের কালে ব্যায়াম করতুম সুস্বাস্থ্যের জন্যে, দেশের কাজে লাগার জন্যে। স্বামীজি ব্যায়াম করতেন সাধনার জন্যে, ভগবানকে পাবার জন্যে। আর একালে ব্যায়াম করে মারামারি কাটাকাটি করার জন্যে। দুর্বলের ওপর অত্যাচার করার জন্যে। আজকাল প্রায়ই পুলিশ আসে, হামলা করে। বলে, এই মশাই, আপনার ক্লাবের ছেলে এই করেছে, ওই করেছে।"

কমল ভৌমিক গান ধরলেন, "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই।"

গান শুনতে শুনতে নিতুর মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। গান শুনলেই তার এইরকম হয়। মনে হয়, পাখি হয়ে গেছে। কমলকাকুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলেই সে গেয়ে ফেলবে। নিতু ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। ইঁদারার ওদিকে বাগানের শেষ মাথায় নিতুর ডোরাকাটা জামাটা তারে শুকোচ্ছে।

নিতু জামাটা তোলার জন্য এগিয়ে গেল। দু'পাশে গোলাপের বেড। সাদা, লাল, হালকা হলুদ। সারা বাগানে হরেক ফুল থইথই করছে। নিতু তার থেকে জামাটা তুলে পরে ফেলল। জামাটা তার পরা দরকার। জামাটা না পরলে তার সব গুলিয়ে যাবে। কী করতে কী করে বসবে।

নিতু জামা গলিয়ে ফিরে আসছে ইঁদারার দিক থেকে। কমল ভৌমিকের উদাস করা গান কানে আসছে। হঠাৎ নিতুর চোখ চলে গেল গেটের দিকে। সাদা ধবধবে বিশাল একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। একটু বয়েস হলেও বেশ খাড়া আছে। নিতু বাড়ির দিকে ছুটল। সুকুকে ডাকতে হবে।

সুকু একপাশে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছিল। নিতু তার কানে কানে বললে, "বিশাল একটা সাদা কুকুর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখবে চলো।"

সুকু ছুটে গেল। আরে এ তো সেই উইলিয়ামসনের কুকুর। সুকু গেটটা খুলে দিল। কুকুরটা এসে সামনের দুটো পা সুকুর বুকের ওপর তুলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে আর গাল চাটছে। নিতু দেখলে, কুকুরটার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

সুকু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "বুঝেছি, অ্যালফ্রেড, দু'দিন তোমার খাওয়া হয়নি। আমি তো এক্ষুনি যাচ্ছিলুম, তোমার কাছে। তুমি কষ্ট করে এতটা পথ এলে কেন? যদি গাড়ি-চাপা পড়তে! যদি রাস্তার কুকুর তোমাকে কামড়াত!"

সুকু আর নিতু দু'জনে মিলে অ্যালফ্রেডকে খাওয়াল, মাংস-ভাত। অ্যালফ্রেড চকচক করে এক বাটি জল খেল। তারপর ইঁদারার পাশে, পেঁপেগাছের তলায় সামনের দুটো পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। সুকু নিতুকে বললে, "চলো, অ্যালফ্রেডকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, উইলিয়ামসনের বাংলোয় পুলিশ গেছে। তারা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার ফলে অ্যালফ্রেড বিরক্ত হয়ে চলে এসেছে।"

সত্যিই তাই। ব্যাপার খুব ঘোরালো। সারা বাংলোটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ কমিশনারের বিশাল বিলিতি গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে। ওয়্যারলেসের

অ্যান্টেনা ল্যাকপ্যাক করছে গাড়ির সামনের বনেটে। ভেতরে ওয়্যারলেস রিসিভার ঝাঁঝাঁ করছে। পুলিশ সুকু আর নিতুকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। বাংলোর ছাতে পুলিশ। দোতলার বারান্দায় পুলিশ। সুকু আর নিতু অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর সেই চেনা অফিসারের দেখা পেল। জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে?"

অফিসার বললেন, "কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে।"

নিতু বললে, "কী সাপ?"

"কেউটে সাপ।"

সুকু বললে, "তার মানে?"

"মাস্টার, তুমি মানে জিজ্ঞেস করছ? তুমি এত বুদ্ধিমান ছেলে! আরে, এইখানেই তো সেই নোট-জালের কারখানা। ভেতরে দু'জন ঘুমোচ্ছিল। আমরা তাদের অ্যারেস্ট করেছি। খুব গুলি-চালাচালি হয়ে গেছে। আমাদের দু'জন হাসপাতালে চলে গেছে, ফাটাফাটি ব্যাপার। আমি নিজে ছ'রাউন্ড গুলি চালিয়েছি।"

"আমাদের হরেনদার কী হল?"

"কী আবার হবে, হাসপাতালে শুয়ে আছে।"

"হাসপাতালে কেন?"

"ফটাকসে মার দিয়া।"

"মার দিয়া?"

"হাঁটুর মালাইচাকি উড়ে গেছে।"

শুনেই নিতু কেঁদে ফেলল। অফিসার বললেন, "খোকা, তুমি কাঁদছ? তোমার ওই মামা কী জিনিস জানো? শেয়ালমামা। এই বাগানের ভেতরে লিলিয়ান বলে একটা মেয়ের সমাধি ছিল। সেই সমাধিটাকে আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। উপড়ে ফেলে দিয়েছি। জানো, ভেতরে কফিন নেই, কিচ্ছু নেই। ছিল একটা লোহার সিন্দুক। আর সিন্দুকে ছিল, গাদা গাদা সোনার বিস্কুট। যাও, যাও, বাড়ি যাও। ছোটদের এখানে থাকা উচিত নয়। যাও, যাও।"

॥ ২৪ ॥

ঘটনার পর ঘটনায় সারা শহরটা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। এরকম আগে কখনও হয়নি। যাঁরা প্রবীণ, তাঁরা বলতে লাগলেন, এসব সময়ের দোষ। আধুনিক কালটাই বাজে। সেকাল অনেক ভাল ছিল। পুলিশের ধারণা, সুদর্শন

মুখ খুললে, অনেক কিছু জানা যাবে; কিন্তু সুদর্শন অচৈতন্য হয়ে আছে। কবে জ্ঞান ফিরবে কেউ জানে না! হাসপাতালে পুলিশ-পাহারা বসে গেছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উড়ো চিঠি এসেছে। ভয় দেখানো চিঠি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছেলে তিনটের সর্বনাশ করা হবে। যে লিখেছে, সে সব জানে। তার মানে, কাছাকাছি থাকে। তা না হলে নিতুও যে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আছে জানবে কী করে? পুলিশ বেঁটের সন্ধানে সারা এলাকা তোলপাড় করছে।

ডাক্তারবাবুর বাংলোর আউট হাউসের ছাদটা গড়ানে। তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন কমল ভৌমিক। মাথার ওপর ঝলমল করছে সকাল সাতটার নীল আকাশ। কাল রাতে কমল ভৌমিক ভেবেছিলেন, আজ সকালে দুমকার বাস ধরে চলে যাবেন। ওই উড়ো চিঠিটা আসায় সিদ্ধান্ত পালটেছেন। ছেলে দুটো আর এই পরিবারকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। বুক দিয়ে আগলাতে হবে। একা হবে না। কলকাতার দলটাকে আনতে হবে। চৌবের সাহায্য নেওয়া যেত। তাঁর শিষ্য হতে পারে, তবে ছেলেটাকে বিশ্বাস নেই। দু'নম্বরি কাজকর্ম করে। না করলে দু'হাতে এত টাকা ওড়ায় কী করে?

কমল ভৌমিক যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে সুকুর পড়ার ঘর দেখতে পাচ্ছেন। হাট-খোলা জানলা। সুকুর সামনে বড় একটা গ্লোব। সামনে খোলা বই। একবার করে বই দেখছে, একবার করে গ্লোব দেখছে। একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে। উলটোদিকে বসে আছে রুকু। দু'ভাইকেই দেখতে ভারী সুন্দর। তবে সুকু যেন দেবদূত। ভেলভেটের মতো চুল ফরসা কপালের ওপর এসে পড়েছে। রুকু একরকম, সুকু আর-একরকম। সুকু একেবারে প্রাণশক্তিতে টগবগ করছে। যখন তাকায় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। রুকু বড় বেশি শান্ত। গম্ভীর। হয়তো ওর বাবার মতো বড় ডাক্তার হবে।

কমল ভৌমিক অনেকক্ষণ এইভাবে বসে আছেন। হঠাৎ মনে হল, পাগলের মতো সাতসকালে টঙে চড়ে বসে আছি কেন? কেন বসে আছিস কমল?

কমল ভৌমিক মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে কথা বলেন। বেশ ভাল লাগে। এইভাবে আগে আগে জীবনের বহু সমস্যার সমাধান পেয়েছেন। প্রশ্নের উত্তরে তাঁর ভেতরের কমল বললে, "কমল, ওই উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোটা তুমি যেভাবে পারো দখল করে নাও, তারপর ওখানে এমন কিছু করো, যাতে ওই অঞ্চলের মানুষের উপকার হয়। দেখছ তো চারপাশের অবস্থা। মানুষ সুযোগ পেলেই পাপের পথে পা বাড়াচ্ছে। যারা অন্যায় করছে, তাদের বেধড়ক ধোলাই দাও। তোমার দলের নাম রাখো, ব্ল্যাক হুইপ।"

কমল ভৌমিক গড়িয়ে ধুপুস করে মাটিতে পড়লেন। ঠিক নীচেই ছিল নিতু। সে চমকে উঠল। ওই একবার তাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে অল্পেই ভয়

পেয়ে যায়। কাল রাতে সুকু তাকে খাটের যেদিকে শুতে দিয়েছিল, সেইদিকে ছিল খোলা জানলা। ভয়ে সারারাত ঘুমোতে পারেনি। চোখ বোজে, আর মনে হয়, জানলার কাছে বিশাল, কালো চেহারার একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকায়। কাউকেই দেখতে পায় না। ফটফট করছে চাঁদের আলো। বাতাসে গাছের পাতা হিলহিল করছে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে-যাওয়া নিতুর পিঠে হাত রেখে কমলদা বললেন, "খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?"

"আপনি কোথা থেকে পড়লেন কাকু?"

"ওই যে ছাদ থেকে। হড়কে সড়াক করে নেমে এলুম। জানো তো, ভূতেরা এইভাবেই নামে।"

"ওর ওপর কীভাবে উঠলেন কাকু?"

"কেন? প্রথমে ওই পাঁচিলে উঠলুম। পাঁচিল থেকে হাতের ওপর ভার রেখে, চালে।"

"ওপরে উঠে আপনি কী করছিলেন কাকু?"

"চিন্তা করছিলুম বাবা। উঁচু জায়গায় উঠে ভাবলে, ভাবনা উঁচু দিকে চলে। ওইজন্যে দেখো না, মুনি-ঋষিরা পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ওঠেন। তুমি তোমার এই অদ্ভুত ডোরাকাটা জামাটা পরে সাতসকালেই চললে কোথায়?"

"কাকু আজ আপনাকে একটা মনের কথা বলব?"

"কী কথা গো?"

"একটু আড়ালে আসুন। ওরা না দেখতে পায়!"

কমল ভৌমিক আর নিতু ঘুরে পাঁচিলের ওদিকে কাঞ্চন গাছের তলায় গেলেন। আশেপাশে কেউ নেই। নির্জন, নিরিবিলি। শুধু পাখিদের চিরাপ-চিরাপ শব্দ। নিতু গাছতলায় এসেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কমল ভৌমিক অবাক। পিঠে হাত রেখে বললেন, "এ কী, তুমি কাঁদছ কেন? কেউ কিছু বলেছেন?"

উত্তরে নিতু জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

"তা হলে কাঁদছ কেন?"

নিতু থেমে থেমে বললে, "আমি কারও কাছে এমনি এমনি থাকতে পারি না।"

"তার মানে? এমনি এমনি মানে?"

"দেখুন, আমার তো বাবা-মা কেউ নেই। তা হলে আমি কেন বসে বসে খাব?"

"বাবা-মা নেই তো কী হয়েছে! আমারও তো বাবা-মা নেই।"

"আপনি বড় হয়ে গেছেন, মানুষ হয়ে গেছেন।"

"তোমাকেও তো বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে। মানুষ তো ছোট থেকেই বড় হয় বাবা! তোমার মাথায় এসব পাগলামি আসছে কেন?"

"আমি কীসের জোরে এখানে থাকব? এরা তো আমার কেউ নয়।"

"ভাবলে, এই পৃথিবীতে কেউই কারও কেউ নয়, আবার ভাবলে সকলেই সকলের। তুমি ওরকম বাঁকা চিন্তা করছ কেন? তুমি এখানে থেকে মানুষ হও। বড় হও। তোমার কত বড় ভাগ্য! তুমি এঁদের হাতে এসে পড়েছ। এমন সব মানুষ তুমি কোথায় পাবে? নিজের মামাকে তো দেখলে? বদমাশ।"

"কাকু, আপনি জানেন, আমার এই ডোরাকাটা জামাটা পরলেই আমি আমার ভবিষ্যৎ জানতে পারি।"

"কী তোমার ভবিষ্যৎ?"

"আমার ভবিষ্যৎ হল এই যে পথ সামনে চলে গেছে, এই পথ ধরে সোজা ওই উত্তরদিকে চলে যাওয়া।"

"বাঃ, বাঃ, চমৎকার! নিতু, একেই বলে কবিতা।"

হঠাৎ কমল ভৌমিকের গলার স্বর বদলে গেল। ধমকের সুরে বললেন, "জীবন কবিতা নয়। জীবন হল গদ্য। চ্যালাপ, চ্যালাপ। চল আমার সঙ্গে। জুতো পায়ে দিয়ে আয়। আজ থেকে তুই আমার চেলা। তোকে আমি সৈনিক বানাব। সোলজার। জীবনযুদ্ধের কম্যান্ডার। চ্যালাপ, চ্যালাপ। চোখ মোছ। বিচ্ছু ছেলে। আমার বাবা নেই। আমার মা নেই!"

কমল ভৌমিক নিতুর গলা নকল করলেন। "বাবা নেই, মা নেই তো হয়েছে কী! পৃথিবীটা তো আছে! তুই তো আছিস! আমি তো আছি। চ্যালাপ। যত প্যানপ্যান, ঘ্যানঘ্যান। লাগা বৈঠক। মার ডন। ইডিয়েট! তুই পুরুষ না মেয়ে! চ্যালাপ! হারি আপ!"

নিতু কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। একটা কাঠবেড়ালি অনেকক্ষণ এদিকে আসার চেষ্টা করছিল। কমল ভৌমিকের চিৎকারে পিড়িক পিড়িক শব্দ করে ছুটে স্বর্ণচাঁপা গাছের মাথায় উঠে গেল। কমল ভৌমিক বললেন, "দে খুলে দে। খোল। খোল তোর জামা। তোর ডোরাকাটা জামার নিকুচি করেছে।"

নিতু দু'হাতে জামাটা চেপে ধরে বললে, "এই জামাটা বাবা আমাকে করিয়ে দিয়েছিলেন। এতে মন্ত্র আছে।"

"তোর মন্ত্রের নিকুচি করেছে। জীবনে মন্ত্রের চেয়ে যন্ত্র বড়। চ্যালাপ। খোল জামা।"

কমল ভৌমিক জোর করে নিতুর ডোরাকাটা জামাটা খুলে নিয়ে বাগানের আর-একদিকে ছুটলেন, যেদিকে বাগানের মালি বেশ জুতসই একটা

কাকতাড়ুয়া বসিয়েছে। নিতুও পেছন পেছন ছুটে আসছে, "ও কাকু, আমার ডোরাকাটা জামা। ও কাকু, "আমার ডোরাকাটা জামা।"

কাকতাড়ুয়ার গায়ে ঝলমলে সাদা একটা জামা ছিল। কমল ভৌমিক তার ওপর চাপিয়ে দিলেন ডোরাকাটা জামা। কাকতাড়ুয়ার মাথার ওপর একটা হাঁড়ি। কালো রং মাখানো। তার ওপর রাক্ষসের মতো সাদা চোখ আর দাঁত আঁকা। ডোরাকাটা জামাটা পরে কাকতাড়ুয়ার অহংকার যেন বেড়ে গেল। নিতু মিউমিউ করে বললে, "জামাটার খুব পাওয়ার ছিল কাকু।"

হা হাঃ করে হেসে কমল ভৌমিক বললেন, "মানুষের চেয়ে জামার পাওয়ার যদি বেশি হয়, তা হলে পৃথিবীতে জামারাই রাজত্ব করত। মানুষের আর দরকার হত না, চ্যালাপ।"

"কাকু, তখন থেকে আপনি চ্যালাপ চ্যালাপ বলছেন। চ্যালাপ মানে কী কাকু? কোনও গালাগাল?"

"চ্যালাপ মানে চলো। একে বলে মিলিটারি অর্ডার।"

"কোথায় যাব কাকু!"

"আমার মাথায় একটা সাংঘাতিক পরিকল্পনা এসেছে। সাধে আমি সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে ওই চালে উঠে বসে আছি! আমি যেভাবেই হোক উইলিয়ামসন সাহেবের বাংলোটা দখল করব। তারপর, তারপর তুই দেখবি। নে, চল।"

"আমার যে খালি গা।"

"ও, তাও তো বটে! তা হলে ওই বিশ্রী ডোরাকাটা জামাটাই তুলে নিই। শোন, আজ বিকেলে আমরা বাজার যাব। গিয়ে তোর একটা ভদ্রগোছের জামা কিনব। কিনে এই জঘন্য জামাটাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।"

উইলিয়ামসনের বাংলো পুলিশ ঘিরে রেখেছে। অনেক পুলিশ। একটা জিপ, একটা বড় ওয়াগন এসেছে। আর বিরাট বড় একটা যন্ত্র এসেছে। নিতু বললে, "ওই বড় মতো, রাক্ষসের মতো যন্ত্রটা কী কাকু!"

"ওটা বুলডোজার।"

নিতু চমকে উঠল, "ওই দেখুন কাকু, সেই পাগলা ডি. এম.।"

"অ্যাঁ, তাই তো! ওঁর তো চাকরি চলে যাবার কথা!'"

জিপগাড়ির সামনে ডি. এম.। আরও সব অনেক লোক। সবাই কথা বলছে, হাত নাড়ছে। ভীষণ একটা কিছু হবে মনে হচ্ছে। হঠাৎ ডি. এম. চিৎকার করে বললেন, "তোড়ো।"

কমল ভৌমিক ছুটলেন। ডি. এম.-এর সামনে গিয়ে বললেন, "কী তুড়বে?"

জানেন তো ডি. এম. কানে কম শোনেন। তাই খুব জোরে বলেছিলেন। ডি. এম. কানে হিয়ারিং-এড পরেছেন।

কমল ভৌমিকের চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল। আগে ছিলেন সত্যি কালা। এখন হয়ে গেলেন যন্ত্র-কালা। ডি. এম. অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন, "হু আর ইউ?"

কমল ভৌমিকের সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না কারও 'হু আর ইউ' বলা। কমল ভৌমিক গলা আরও চড়িয়ে বললেন, "হু আর ইউ?"

ডি. এম. বললেন, "হু আর ইউ?"

এরকম কতক্ষণ চলত কে জানে! ডি. এম.-এর একজন সহকারী বললেন, "এটা ঠিক হচ্ছে না। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন চলে না। যে-কোনও একজনকে উত্তর দিতে হবে। ডি. এম. আগে হু আর ইউ বলেছেন, তা হলে আপনি এবার উত্তর দিন, আই অ্যাম....।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আই অ্যাম কমল ভৌমিক অফ ক্যালকাটা।"

সহকারী বললেন, "সো হোয়াট?"

এতটা তাচ্ছিল্য সহ্য করার মতো মানুষ কমল ভৌমিক নন। গলা সপ্তমে তুলে বললেন, "সো হোয়াট!"

ডি. এম.-এর চোখে চশমা ছিল না। কোটের পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগিয়ে কমল ভৌমিককে ভাল করে দেখে বললেন, "আরে! মাই ফ্রেন্ড! আপ কাঁহা সে ফির আ গিয়া।" সহকারীকে ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যায়! চোপ!"

সহকারী চুপ মেরে গেল। ডি. এম. কমল ভৌমিকের কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রেখে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বুলডোজার স্টার্ট নিয়েছে। ইঞ্জিন ঘড়ঘড় শব্দ করছে।

কমল ভৌমিক বললেন, "ওই দৈত্যটাকে আগে স্টপ করান।"

"কেন, স্টপ করাব কেন? এক্ষুনি কী মজা হবে আপনি দেখবেন। সব ভেঙে চুরচুর করে দেবে।"

"সেই চুরচুর করাটা বন্ধ করতে হবে। এই বাড়িটা আমার চাই।"

"অর্ডার আছে?"

"কীসের অর্ডার, কার অর্ডার?"

"হুকুম ছাড়া হাকিম নড়ে না ফ্রেন্ড। এই পোড়ো বাড়িটা হয়ে উঠেছে অপরাধের আস্তানা। এটাকে জমির সঙ্গে মিশিয়ে না দিলে অপরাধীদের নির্মূল করা যাবে না।"

"ভাঙার হুকুম কার?"

"আমার।"

"আপনার চাকরি এখনও আছে? আমি ভেবেছিলুম সেই চিড়িয়াখানা দান করে দেবার ব্যাপারে আপনার চাকরি চলে গেছে। পুলিশ যেভাবে সেদিন তাড়া করেছিল আপনাকে!"

ডি. এম. হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "আপনি ভুল করেছেন। পুলিশ আমাকে তাড়া করেছিল অন্য কারণে। আমার হিয়ারিং-এডটা ফেলে চলে এসেছিলুম। সেইটা দেবার জন্যে পেছনে ধাওয়া করেছিল। হিয়ারিং-এড ছাড়া আমি সব গোলমাল করে ফেলি। ফ্রেন্ড, চাকরিতে আমার খুব সুনাম। সবাই আমাকে বলে, লার্জ হার্টেড ডি. এম., আপনি জানেন না, কী ওপরে, কী নীচে, সব জায়গায় আমার প্রবল প্রতাপ।"

"তা হলে ওরা সেদিন বললে কেন, মন্ত্রী খেপে গেছে, চিড়িয়াখানা দান করে দিয়েছেন বলে দিল্লি থেকে হুকুম এসেছে 'স্টপ ডি. এম.'।"

হাহা হেসে ডি. এম. বললেন, "ওটা টাইপের গোলমাল। এস টি ও পি হয় স্টপ, ওরা বলতে চেয়েছিল। এস পি ও টি। স্পট। টি-টা পি-এর জায়গায় চলে এসেছিল। ভেরি স্যাড। ভেরি ভেরি স্যাড। সেই টাইপিস্ট বেচারার চাকরি গেছে।"

॥ ২৫ ॥

কমল ভৌমিক বললেন, "তা হলে আপনি এখন ওই দৈত্যকে এস টি ও পি বলুন। বলুন, স্টপ।"

ডি. এম. চিৎকার করে বললেন, "স্টপ, স্টপ।" বুলডোজার থেমে গেল। আঃ, কী শান্তি! চারপাশে নিস্তব্ধতা নেমে এল। আবার শোনা গেল পাখি ডাকছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ হচ্ছে। ডি. এম. বললেন, "চলুন, আমরা দু'জনে ওই ঢিবিটার ওপর গিয়ে বসি। ওইখানে ওই বাদামগাছের তলায় খুব ভাল ভাল, বড় বড় কাঠবেড়ালি আছে। উঃ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনি স্বীকার করেন কি না?"

"আমার মনে হয় বাঘই হল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।"

দু'জনে ঢিবির ওপর পাশাপাশি বসলেন। ঢ্যাঙা বাদামগাছ আকাশের দিকে হাত তুলে যেন নাচছে। অনেক পাতা পড়ে আছে গাছতলায়। কিছু শুকনো, কিছু কাঁচা। শুকনো পাতা বাতাস দিলেই খড়খড় করে ওড়ার চেষ্টা করছে।

ঢিবির ওপর বসে ডি. এম. বললেন, "বুঝলেন মশাই, সবসময় কাজ কাজ করবেন না। কখনও কখনও ছুটিরও প্রয়োজন আছে। পড়েননি, ইংরেজিতে

একটা কথা আছে, অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেকস জ্যাক এ ডাল বয়। পাঁচটা মিনিট কথা না বলে চুপ করে বসুন তো। কথা বললেই কাঠবেড়ালিরা আর আসবে না।"

"আচ্ছা আপনি এত বড় একজন মানুষ। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এত বড় একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনি ছেলেমানুষের মতো কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালি করছেন! লোকে কী বলবে?"

"আমি ওই লোকের পরোয়া করি না। লোকে আমার পরোয়া করে। আসুন এই পাতার ওপর পাশাপাশি শুয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই।"

"ঘুমোবেন? এই কি ঘুমোবার সময়!"

"আপনাকে-আমাকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ঘুমই হল জীবন। যখনই সুযোগ পাবেন একটু করে ঘুমিয়ে নেবেন। মাথা একেবারে সাফ হয়ে যাবে।"

"দেখুন, আপনার চালাকিটা আমি বুঝে গেছি। খুব ধুরন্ধর মানুষ আপনি। সেদিনও দেখলাম, সারাটা দিন কোনও কাজকর্ম করতে দিলেন না। একটা ছেলেকে চিড়িয়াখানার লোভ দেখিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারলেন। সেই এক কায়দা আবার আজ ধরেছেন।"

"ওই পোড়ো বাংলোটা আপনার চাই?"

"হ্যাঁ চাই।"

"কী করবেন ওখানে?"

"আশ্রম।"

"আশ্রম? আশ্রম তো সাধুরা করেন! আপনি সাধু?"

"হ্যাঁ, আমি সাধু।"

"আপনার গেরুয়া?"

"গেরুয়া আমার মনে।"

"বেশ, বাংলোটা আপনাকে দিয়ে দিলুম।"

"যেমন চিড়িয়াখানাটা সুকুকে দিলেন।"

"আরে মশাই, চিড়িয়াখানার ভেতর অনেক কাণ্ড আছে। সাংঘাতিক সব ব্যাপার। পরে আমি জানতে পেরেছি।"

"কী কাণ্ড?"

"সে আপনাকে আমি বলতে পারব না। ভেরি, ভেরি, ভেরি সিক্রেট।"

"চিড়িয়াখানায় আবার সিক্রেট। বাঘ, ভালুক, হাতি, উট।"

"ওই তো! না জেনেই মন্তব্য করে চলেছেন! চিড়িয়াখানাটা আপনি দেখেছেন?"

"আমি কলকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখেছি।"

"উঃ, আর পারা যায় না। কোথায় আলিপুর, আর কোথায় শ্রীপুর। আচ্ছা, কেন বকবক করছেন বলুন তো! পাঁচটা মিনিট চুপ করে বসুন না, কাঠবেড়ালিগুলোকে আসতে দিন না। লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। ওদের বাদাম লুকোবার জায়গাটা দেখতে পেলে, উঃ হুঃ হুঃ!"

"কী করে এমন ছেলেমানুষ হয়ে আছেন?"

"ওই যে ভগবানদাসের কৃপায়। আমার গুরু ভগবানদাস, আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন, মানুষের জীবন বড় দুঃখের। যত দিন যায়, যত বয়েস বাড়ে, ততই দুঃখ বাড়ে। মহাপুরুষরা যুগ যুগ ধরে বলে গেছেন, এসেছ কাঁদতে কাঁদতে, যাবে হাসতে হাসতে। সে আর হয় কই! এলেও কাঁদতে কাঁদতে, গেলেও কাঁদতে কাঁদতে। ভগবানদাসকে প্রণাম করলে, জিতা রহো বলেন না, সুখী রহো বলেন না। বলেন, শিশু রহো। প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের সঙ্গে মিলেমিশে থাকো, য্যায়সি পঞ্ছি। পাখির মতো আনন্দে থাকো।"

কমল ভৌমিক আবার কাজের কথায় ফিরে এলেন, "আপনি আমাকে বাংলোটা কীভাবে দেবেন?"

"ভেঙে দেব।"

'এতক্ষণ পরে এই হল!"

"হ্যাঁ, ভাঙা তো হয়েই গেল। এখানে এতক্ষণ বসে আছি কেন?"

"সবসময় হেঁয়ালি ভাল লাগে না। অত হেঁয়ালি করলে, শেষে তারের মতো পাকিয়ে যাবেন। মন আরও কোনওদিন সোজা হবে না।"

"আরে মশাই, এ হল রেল কোম্পানির পুকুর কাটা আর পুকুর বোজানো। জানেন সে গল্প?"

"না, আমি অত গল্পটল্প জানি না। আমি তেমন পড়ুয়া লোক নই।"

"তা হলে শুনুন, রেল স্টেশনের বড়বাবু হেড অপিসে ফাইল পাঠালেন। জংশন স্টেশন, ইঞ্জিন অনেকক্ষণ থামে, জল নেয়, ইঞ্জিনের জল খাবার জন্যে একটা পুকুর কাটাতে হবে। হেড অফিস বললে, বেশ কাটাও। এই এত হাজার টাকা তোমাকে দেওয়া হল। বছর না ঘুরতেই আবার ফাইল গেল হেড অফিসে। এবার কী! না, পুকুর বোজাতে হবে। স্থানীয় লোকের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। মশা হচ্ছে, ম্যালেরিয়া বাড়ছে। শুধু তাই নয়, থেকে থেকে জলে ডুবে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। হেড অফিস বললে, ঠিক আছে পুকুর বুজিয়ে দাও। এই তোমাকে এত হাজার টাকা দেওয়া হল। এইবার বলুন তো আসলে কী হল?"

"পুকুর কাটা হল, পুকুর বোজানো হল!"

"আপনার মাথা হল! পুকুর কাটাও হল না, পুকুর বোজানোও হল না। এই বাংলোটাও সেইরকম হবে। ভাঙা হবে, আবার হবে না। আমি কাগজে-কলমে দেখিয়ে দেব ভাঙার পর আপনি নতুন করে তৈরি করে নিয়েছেন। আপনি রংটং করে একটু মেরামত করে নেবেন। কেমন? একে বলে বুদ্ধি।"

কমল ভৌমিক কৃতজ্ঞতায় ডি. এম.-এর হাত চেপে ধরলেন; আর ঠিক তখনই পশ্চিম আকাশে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভলভল করে কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি।

ডি. এম. তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, "ফায়ার, এ বিগ ফায়ার!"

কমল ভৌমিকও উঠে পড়লেন, "মশাই, আপনার এলাকায় একদম শান্তি নেই। এই ক'দিনে কত কী যে ঘটছে। আপনি অমন ধড়ফড় করে চললেন কোথায়?"

"সত্যি কথা বলব, আমার আগুন দেখতে ভীষণ ভাল লাগে। জানি, অনেকের ক্ষতি হচ্ছে। আমি এখন ওইদিকে যাব। বেশ বড় আগুন। যাবেন আপনি?"

"যাব। আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। একবার হাতছাড়া করলে কোথায় পালাবেন। আমার কাজ আর হবে না।"

"কী যে বলেন! কথা ইজ কথা।"

ঢিবি থেকে নেমে এসে কমল ভৌমিক দেখলেন, নিতু একটা বড় পাথরের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের ওপর গাছের পাতা ঝরে পড়েছে। গোটা দুই সাংঘাতিক চেহারার কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে পাশে ঘুরঘুর করছে। কমল ভৌমিক নিতুকে ঠেলে তুললেন। "চলো মাস্টার। ওঠো। আবার অশান্তি।"

জিপ যত পশ্চিমে আগুনের দিকে এগোচ্ছে, ততই যেন গরমের হলকা বাড়ছে। সামনের আকাশ তামার পাতের মতো গনগনে লাল। কমল ভৌমিকের সন্দেহ হচ্ছে, চৌবের তাঁবুতে আগুন লাগল না তো! সেইদিকেই তো গাড়ি এগোচ্ছে। গাড়ির আগে আগে সব লোক হইহই করে ছুটছে।

ডি. এম. বললেন, "আগুনের আকর্ষণ দেখেছেন? যেন ফিল্‌মস্টার!"

কমল ভৌমিক যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। চৌবের অত বড় তাঁবুটায় আগুন লেগে গেছে। পাশেই মহাবীরের মন্দির। মন্দিরটাকে বাঁচাবার জন্যে, গায়ে বালতি বালতি জল ছোড়া হচ্ছে। কাছাকাছি কোনও পুকুর নেই। দুটো বিশাল ইঁদারা। লোক যেন সেই ইঁদারার পাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

চৌবে ডি. এম.-এর জিপ দেখে এগিয়ে এলেন। মালকোঁচা মেরেছেন।

পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। সিল্কের গেঞ্জি। চওড়া বুকে সোনার পদক ঝকঝক করছে। চৌবেকে আসতে দেখে কমল ভৌমিক তড়াক করে লাফ মারলেন জিপ থেকে।

চৌবে বললেন, "গুরুজি এসে গেছেন। আমি জানতুম আসতেই হবে আপনাকে। মহাবীরজির কৃপা। দেখবেন ডাক্তারসাবও আসবেন।"

"কী করে আগুন লাগালেন?"

দমকা বাতাসে আগুনের ফুলকি আর ছাই উড়ে আসছে। ছুড়ে ছুড়ে সব জল দিচ্ছে। জলের ছিটে লাগছে গায়ে। কমল ভৌমিক জিপের আড়ালে গেলেন। মন্দিরের পাশে সেবায়েতের ঘরদোর পুড়ে ছাই।

চৌবে বললেন, "গুরুজি, মহাবীরের কৃপায় কী না হয়! পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।"

"এই আগুন লাগাটা কৃপা!"

ডি. এম. নেমে এলেন জিপ থেকে। চৌবের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সব ঠিক চলছে তো?"

"হাঁ মহারাজ। সব ঠিক আছে। মহাবীরজির কৃপায়, আজ আমার যজ্ঞে খুদ জেলাশাসক ভি এসে গেছেন।"

"এই হল মহাবীরজির কৃপা!"

"বিশ-বাইশ হাজার গেল বটে লেকিন আগুন কত দূর উঠেছিল বলুন। দু'মন ঘি আমি ওর ওপরেই চড়িয়ে দিয়েছি, জয় মহাবীরজি বলে। যিতনা ফুল ছিল, সব ঢেলে দিয়েছি। ওঁ বৈশ্বানর জাত বেদ, ইহ বাহো লোহিতাক্ষ।"

আগুন প্রায় নিবে এসেছে। চড়চড় করে কাঠ-কঞ্চি পুড়ছে। বিলবিল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দূরে একপাশে বসে বসে চৌবেজির স্ত্রী কাঁদছেন। এত বড় একটা অমঙ্গল হয়ে গেল!

মাঠের ওপর দিয়ে একজন সন্ন্যাসী হনহন করে হেঁটে আসছেন। কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল, সেই ভগবানদাস। কেন জানে না, এই সন্ন্যাসীকে নিতুর খুব ভাল লাগে। ভগবানদাস হনহন করে এসে, কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে, খানিকটা পোড়া ছাই তুলে কপালে ঘষলেন। হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর বড় বড় পা ফেলে মহাবীরের মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠলেন।

নিতু দূর থেকে চোখ রেখেছে, সাধু কী করেন। ভগবানদাসজি জল-সপসপে চাতালে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। দু'দশ বালতি জল তাঁরই গায়ে ঢালা হয়ে গেল। দৃকপাত নেই। প্রণাম সেরে উঠে, জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাস করো। অওর পানি মাত ঢালা করো।"

মন্ত্রের মতো কাজ হল। দশ-বিশটা ঝাড়ু এসে গেল কোথা থেকে। হাতে হাতে ঝাড়ু। শুরু হয়ে গেল ঝাঁটপাট। সপাসপ। থেকে থেকে সবাই একসঙ্গে চিৎকার ছাড়ছেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয়! জয় মহাবীরজি।' ওই পোড়ো শ্মশানেই কে আবার সেই মুহূর্তে লাউডস্পিকার ছেড়ে দিল: ঝিনি রে ঝিনি। রাম নাম রস ভিনি। ঝিনি রে ঝিনি। ঝিনি, ঝিনি, ঝিনি।

কমল ভৌমিক বললেন, "কী জ্বালা রে ভাই! ঝিনি ঝিনি ঝিনি, ঝিনঝিনি।"

ডি. এম. বললেন, "আপনি কখনও বেকড পোট্যাটো খেয়েছেন?"

"না, আমি রোস্টেড টম্যাটো খেয়েছি।"

"আমাদের এখানে, আলুর গুদামে একবার আগুন লেগেছিল। তা আগুন নিবে যাবার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পোড়া আলু খেয়েছিলুম। আঃ, কী ফ্যান্টাসটিক টেস্ট। তারপর আর একদিনও আলুর গুদামে আগুন লাগল না।" ডি. এম.-এর মুখের চেহারা করুণ দেখাল।

কমল ভৌমিক বললেন, "কী মানুষ আপনি! এত ক্ষমতা আপনার, এত বড় পোস্টে চাকরি করেন, অথচ একেবারে বালক-স্বভাব।"

ডি. এম. বললেন, "মশাই, চাকরির সঙ্গে মনকে জড়াবেন না। মন মনের মতো মনের জিনিস নিয়ে থাক। মন দিয়ে চাকরির সময়ে চাকরি। বাকি সময় শুধু নাচো, গাও। আচ্ছা, আমি যাই। আজ গবর্নর আসবেন বিকেলে সার্কিট হাউসে। আমার এইবার কাজ শুরু হবে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমার বাংলো?"

"আপনার বাংলো রয়েছে। জানেন তো, আমি হলুম এক কথার মানুষ। ইচ্ছে হলে আজই আপনি দখল নিয়ে নিন। চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই।"

নিতু আর কমল ভৌমিক ডি. এম.-এর জিপে উঠে পড়লেন। জিপ উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোর দিকে এগোচ্ছে। ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি শাঁ শাঁ করে চলেছে। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। বেশ ভারী কোনও যন্ত্র চলার আওয়াজ। সামনের আকাশে মাঝে মাঝেই দমকা ধুলোর কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ধুমধড়াস শব্দে থেকে থেকে কী সব ভেঙে পড়ছে।

কমল ভৌমিক বললেন, "ব্যাপারটা কী বলুন তো! সামনে কি কল চলেছে?"

ডি. এম. একটা চিউইংগাম চিবোতে চিবোতে বললেন, "গেলেই দেখতে পাবেন। বুলডোজার যুদ্ধ করছে।"

"তার মানে আমার বাংলোটা ভাঙা হয়ে গেল! আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন।"

"আর-একটু পরেই সত্যি-মিথ্যার বিচার হবে। এই তো আমরা এসে গেলুম।"

জিপ যত এগোচ্ছে ততই শব্দ বাড়ছে। একটা দৈত্য যেন খেপে গেছে। রাগে, সব ভেঙেচুরে তছনছ করছে। ভলকে ভলকে ধুলো উড়ছে। একপাল কুকুর তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে।

॥ ২৬ ॥

ডি. এম.-এর জিপ যত এগোচ্ছে ততই শব্দ বাড়ছে। একটা দৈত্য যেন খেপে গেছে। ধুলোটুলো উড়িয়ে সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। কমল ভৌমিক যত বলেন, "কী ভাঙছে বলুন তো? বাংলোটাই মনে হয় শেষ করে দিলে।" ডি. এম. ততই বলেন, "আরে না মশাই! বুলডোজার যখন এনেছি, একটা কিছু তো ভাঙতেই হবে। তা না হলে সরকারকে আমি কী কৈফিয়ত দেব! সরকারি আইনকানুন আপনি কিছুই...।"

কথা শেষ করতে পারলেন না। এত ধুলো। খকখক করে কাশতে লাগলেন। কাশির সে কী দমক! কমল ভৌমিক কাশি আবার সহ্য করতে পারেন না। ডি. এম. এর মুখ-চোখ লাল জবার মতো হয়ে উঠল। আর গাড়ি চলে এল ঘটনাস্থলে। যেখানে বাংলোটা ছিল, সেই জায়গা প্রায় ফাঁকা। ইট, কাঠ, পাথরের ধ্বংসস্তূপ। বাংলোর একটা পাশ কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধেকটাই বুলডোজারের গুঁতোয় ধরাশায়ী।

কমল ভৌমিক দৃশ্য দেখে বললেন, "এ কী হল! এটা কী হল?"

ডি. এম.-এর কাশি থেমে গেছে দৃশ্য দেখে। তিনি শুধু বলতে লাগলেন, "তাই তো, তাই তো!" ঘটনাস্থলে আরও জিপ এসে গেছে। জাঁদরেল এক ভদ্রলোক তকতকে ঝকঝকে পুলিশের ইউনিফর্ম পরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ডি. এম. প্রায় লাফিয়ে জিপ থেকে নামলেন।

কমল ভৌমিক পাশে বসে থাকা নিতুকে বললেন, "ব্যাপারটা দেখলে! বড় বড় লোকদের কথার কোনও দাম নেই। বলে এক, করে এক। স্রেফ ধাপ্পা। স্রেফ ধাপ্পা।"

ডি. এম. গাড়ি থেকে নেমেই সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশকে দেখে অবাক হলেন, "এসপি সাব, আপনি?"

ডি. এম. উত্তরের অপেক্ষা না করে চিৎকার ছাড়লেন, "রোককে, রোককে বাংলো মাত ভাঙো।"

এস. পি. সঙ্গে সঙ্গে পালটা চিৎকার ছাড়লেন, "রোকা মাত। মাত রোকো। ভাঙো, ভাঙো।"

ডি. এম. ফিরে এসে এস. পি.-র মুখোমুখি দাঁড়ালেন কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। ডি. এম. থমথমে গলায় বললেন, "আমার অপমান?"

এস. পি. গম্ভীর গলায় বললেন, "মান-অপমানের কী আছে! সরকারি কাজে আবার মান-অপমান!"

"আপনি হুকুম করার কে?"

"আমি এস. পি.।"

"আমি ডি. এম.। আমি বলছি বাংলো ভাঙা হবে না!"

"আমি এস. পি. বলছি, ভাঙা হবে। ভেঙে মাঠ করে দেওয়া হবে!"

"আপনি আমার আন্ডারে, না আমি আপনার আন্ডারে?"

"আন্ডার অ্যাবাভ জানি না, এই পোড়ো বাংলো অ্যান্টি সোশ্যালদের আখড়া, এ আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।"

"এ খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।"

"কিচ্ছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। আইন ইজ আইন। কানুন ইজ কানুন।"

ডি. এম.-কে ভীষণ অসহায় দেখাল। চারপাশে করুণ মুখে তাকালেন। নিতু কমল ভৌমিককে ফিসফিস করে বললে, "কাকু, বাড়ি চলুন। আমার আর ভাল লাগছে না।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমারও আর ভাল লাগছে না।"

এস. পি. চিৎকার করে বললেন, "স্টার্ট। শুরু করো।"

সঙ্গে সঙ্গে বুলডোজার ঘোঁতঘোঁত করে এগিয়ে গেল, বাংলোর যে অংশটা খাড়া আছে তখনও, সেই অংশটাকে গুঁতো মেরে মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে।

ডি. এম. "শেম, শেম, লজ্জা, লজ্জা" বলতে বলতে জিপে গিয়ে উঠলেন। তারপর কী ভেবে নেমে এসে এগিয়ে গেলেন, এস. পি.-র দিকে, "বাংলোটা আমি কিনতে চাই।"

এস. পি. যাত্রার কংসের মতো হাহা করে হেসে বললেন, "বড় দেরি করে ফেলেছেন স্যার। বাংলো তো আর নেই, আছে এক টুকরো জমি।"

ডি. এম.-কে কথায় ব্যস্ত দেখে কমল ভৌমিক আর নিতু চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে সরে পড়ল। কমল ভৌমিক বললেন, "দেখো নিতু, বড় রাস্তা ধরে যাওয়া চলবে না। চলো, আমরা এই জঙ্গলের পায়ে-চলা পথ ধরি।"

বেলা পড়ে এসেছে। জঙ্গলে আলোছায়ার খেলা। জঙ্গল এমন কিছু গভীর না হলেও কমল ভৌমিক কলকাতার মানুষ। তাঁর গা-ছমছম করছে। বাঘ নেই,

তবে সাপ তো আছে। সাপে ভীষণ ভয়। এমন এঁকেবেঁকে সড়সড় করে চলে। সাপ যদি মানুষ হত, তা হলে ভয় ছিল না। একটা আন্ডার-কাট মেরে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া যেত।

ওই জঙ্গলের পথ ধরে যেতে যেতে কমল ভৌমিকের পুরনো দিনের সব কথা মনে পড়ছে। কিছুকাল দেওঘর বিদ্যাপীঠে গেমস আর জিমনাশিয়াম টিচার হিসেবে কাজ করেছিলেন। বেশ ছিল সেই জায়গাটা। বিশাল বিশাল বড় কম্পাউন্ড। গোলাপবাগান। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। মন্দির। প্রেয়ার হল। জিমনাশিয়ামটা কী বিশাল বড় ছিল! অমন অসাধারণ সুন্দর বিদ্যাপীঠ সারা ভারতে খুব কম আছে। কিন্তু কী করা যাবে! ছেড়ে চলে আসতে হল ভয়ে। সাপের ভয়ে।

কমল ভৌমিক নিজের মনেই চুকচুক শব্দ করলেন। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দু'জনে চলেছেন। মচমচ শব্দ হচ্ছে। ল্যাজ তুলে বহুরূপী ছুটে পালাচ্ছে। কটর কটর করে কাঠ কোরার শব্দ হচ্ছে। শালগাছে পোকা লেগেছে মনে হয়। বিশাল বড় এক হাঁড়িচাচা পাখি অনেকটা মানুষের গলায় কোনও এক গাছের ডালে বসে ডাকছে। যখন এ-গাছ থেকে উড়ে ও-গাছে যাচ্ছে, ডালপালায় ঝড় বইছে। কম ওজন? ওই পাখিটাকে দেখলেই হাসি পায়। অত বড় একটা শরীর করার কী দরকার ছিল! ব্যায়ামট্যায়াম করে নাকি! মনে হয় খুব প্রোটিন খায়।

অনেকটা পথ হাঁটার পর নিতুর সন্দেহ হল, ঠিক দিকে যাচ্ছে তো! "কাকু আমরা ঠিক যাচ্ছি কি?"

"তোমার কী মনে হচ্ছে?"

"আমার মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি, আর জঙ্গল যেন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। সেই পায়ে-চলা পথটাও আর নেই।"

"ওমা, সে কী! কতক্ষণ নেই? তুমি বলোনি তো! পথ ছাড়া পথিক হয় না! না না, দাঁড়াও, আবার এটাও তো ঠিক, পথিক ছাড়া পথ হয় না। পথ ও পথিক, পথিক ও পথ। বেশ গোলমেলে ব্যাপার, এই সময় সুকুর থাকা উচিত ছিল। ওইটুকু ছেলে হলে কী হবে, আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী।"

"এদিকে কিন্তু বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে।"

"আসতেই পারে। সূর্যকে তো আমরা ধরে রাখতে পারব না। বড় স্বাধীন। তোমার পকেটে দেশলাই আছে?"

"না কাকু, দেশলাই কী করে থাকবে! আমি কি সিগারেট খাই! দেশলাই কী করবেন?"

"অন্ধকারে দেশলাই আমাদের পথ দেখাবে। শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে মশাল তৈরি করব। সেই মশালের আলোয় আমরা ডাকাতের মতো, ভোঁ ভনভন, শোঁ শ্যানশ্যান, ভ্যাঁপপো ভ্যাঁপপো ভ্যাঁপ।"

"সেটা কী কাকু?"

"এটা হল জলদস্যুদের গান।"

"আমরা তো স্থলে আছি কাকু!"

"আরে বোকা, জল আর জঙ্গল এক জিনিস। তুমি বলতে পারো কি আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?"

"পশ্চিম দিকে।"

"কী করে বললে?"

"ওই যে লাল আকাশ। সূর্য অস্ত যায়।"

"পশ্চিম দিকে যাচ্ছি কেন? ওটা তো সেই পাহাড়ের দিকে। তার মানে আমরা একটু পরেই সেই নদীটা পাব।"

"তার মানে আমরা বাড়ির উলটো দিকে যাচ্ছি?"

"সেইরকমই তো মনে হচ্ছে আমার।"

নিতু যেন বেশ ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললে, "আমরা তো ওদিকে যেতে চাইনি।"

জঙ্গলে অনেকক্ষণ হাঁটার ফলে কমল ভৌমিকের বেশ সাহস বেড়ে গেছে। প্রথম প্রথম এপাশে-ওপাশে সড়সড় আওয়াজ শুনে চমকে চমকে উঠছিলেন। এখন একেবারে বেপরোয়া। নিতুকে বললেন, "আরে, ওইটাই তো মজা। একেই বলে পথের আকর্ষণ।"

"আমরা তা হলে আর না চলে থেমে পড়ি।"

"তা তো হয় না। থেমে পড়াই মানে মৃত্যু। আমাদের চলতে হবে। আমাকে আমার বাবা উপনিষদ থেকে শ্লোক বলতেন, সেসব যে কী সুন্দর, তোমার ধারণা নেই। একটা শ্লোকে আছে, চরৈবতি। চরৈবতি। চরৈবতি মানে জানো? মানে, এগিয়ে চলো।"

"তা বলে যে-কোনও দিকে তো আর এগোনো যায় না! এই সন্ধেবেলা কে আমাদের বলেছিল, ওই নদী, ওই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে। উপনিষদ?"

"উপনিষদ কেন বলবে! উপনিষদের জগতে দিকটিক নেই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হল আমাদের হিসেব।"

কমল ভৌমিক জানেন না জঙ্গল কী সাংঘাতিক জিনিস। জঙ্গলের একটা নেশা আছে। মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। গভীরে টানে। কেবল বলতে থাকে, আয় আয়, আরও ভেতরে আয়। শেষে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে।

নিতু বললে, "কাকু চলুন, আমরা ফিরে যাই।"

"ধুর পাগল, ফিরতে আছে? পথের শেষ দেখতে হয়।"

"আমি যে আর হাঁটতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে।"

"আরে পাগলা, ভয়ের কী আছে! আমরা তো অন্য গ্রহে নেই, পৃথিবীতেই আছি।"

কমল ভৌমিককে জঙ্গলের নেশায় ধরেছে। গাছ আর গাছ। কেবল গাছ। সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। পায়ের তলায় ঝরা পাতা। মচমচ শব্দ। দু'জনে চলেছেন তো চলেইছেন। পাহাড়ি নদীর কুলুকুলু শব্দ এবার কানে আসছে। পায়ের তলায় বালি এসে গেছে।

সামনে নদী। কেউ কোথাও নেই। ধোঁয়া ধোঁয়া সন্ধে। নদীর ওপারে আবার জঙ্গল। যত দূর চোখ যায়, ছোট-বড় নানা আকারের গাছ। থাকে থাকে ওপর দিকে উঠে গেছে। বহু দূরে পাহাড়ের শ্রেণি। পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আপনমনে জল চলেছে। তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদু সুরে কত কথাই যে হচ্ছে। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। এত নির্জন যে নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁ পাশে কিছু দূরে সাদামতো কী একটা পড়ে আছে, যেন হাত-পা ছড়ানো একটা মানুষ।

কমল ভৌমিক সেদিকে এগিয়ে গেলেন। একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। নিতু ভয়ে কমল ভৌমিকের গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে আছে। কমল ভৌমিক বললেন, "কেমন শুয়ে আছে দেখেছ! সাদা ধবধবে। কী নাম ছিল কে জানে! কঙ্কালের নাম থাকে না। আঃ, কী সুন্দর সাদা ধবধবে! মানুষের খাঁচাটা কী অসাধারণ! কোন হাড়কে কী বলে, আমার সব জানা। তোমাকে চিনিয়ে দোব? চিনবে?"

"না কাকু, আমার ভীষণ ভয় করছে।"

নদীর ওপারে পরপর তিনটে জন্তু জলের কিনারায় থমকে দাঁড়িয়েছে।

"কাকু, বাঘ নাকি?"

"ধুত, তিনটে কেঁদো শেয়াল। এইবার ওরা প্রহরে প্রহরে ডাক ছাড়বে। শেয়াল হল রাতের ঘড়ি।"

"শেয়াল কি মানুষকে কামড়ায়?"

"এমনি কামড়ায় না, তবে খ্যাপা শেয়াল কামড়ায়, খ্যাপা কুকুরের মতো।"

"আমরা এইবার কী করব?"

"তোমার ভাল লাগছে না নিতু? আমার বেশ মজা লাগছে। এ যেন এক অজানা দেশ। মনে করো, আমরা চলে এসেছি আফ্রিকার ট্র্যানসভালে, কি উগান্ডায়, কি কেনিয়ায়! আবার ওই দেখো পেছনে তাকাও, বনের মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে গোল থালার মতো। রাত আর একটু গড়ালেই এই পাহাড়ি নদীতে বাঘ আসবে জল খেতে। হরিণ আসবে। ওই পাহাড় থেকে টলতে টলতে নেমে আসবে ভাল্লুক।"

"কাকু, আমার যে ভীষণ ভয় করছে!"

"ভয়ের কী আছে! পৃথিবীতে এসেছ, কত রকমের কী হবে!" ভয়ে মরে গেলে তো চলবে না বাবা! আমার দাদু সেই কবে শেক্সপিয়ার থেকে আমাকে দুটো লাইন বলেছিলেন, এখনও মনে আছে, 'কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথস/ দি ভ্যালিয়ান্ট নেভার টেস্ট অফ ডেথ বাট ওয়ানস।' কী অসাধারণ লাইন বলো! সেই কবে শেক্সপিয়ার লিখে গেছেন, আজও আমাদের মুখে মুখে ঘুরছে। বাংলাটা বুঝলে?"

"না কাকু!"

"যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ, তারা মরার আগেই হাজার বার মরে, কিন্তু যারা বীর, তারা একবারই মরে। অতএব নিতু, বিষয়টা আমাদের অন্যভাবে ভাবতে হচ্ছে। এই নদীই এখন আমাদের পথ দেখাবে। কীভাবে?"

"জানি না কাকু।"

"জলের স্রোত যেদিকে বইছে সেইদিকেই আমাদের শহর। নদী পাহাড় থেকে নামছে নীচে, তাই না? আমাদের তা হলে বাঁ দিকে যেতে হবে। তাই তো! তা হলে চলো।"

"কাকু, আমি আর হাঁটতে পারছি না।"

"তা বললে চলবে না বাবা। মানুষকে তো কোথাও একটা যেতে হবে। থামা মানেই মৃত্যু। তুমি সারারাত এই নদীর ধারে বসে থাকতে চাও নাকি। বসলেই আমাদের ঘুম এসে যাবে।"

কঙ্কালটার পাশ দিয়ে নিতু আর কমল ভৌমিক এগিয়ে চললেন। নদী চলেছে অস্পষ্ট কুলুকুলু রবে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। চাঁদের আলো পড়েছে জায়গায় জায়গায়। যেন রুপো গলেছে। গাছের ছায়া, পাথরের ছায়া। কমল ভৌমিকের মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্ন। নিতুকে বললেন, "শোনো, আমি যদি মরে যাই, আমাকে ওই জলের ধারে নুড়ি-পাথরের বিছানায় শুইয়ে রেখে চলে যেয়ো।"

নিতু এবার ফোঁসফোঁস করে কেঁদে ফেলল।

॥ ২৭ ॥

কত রাত হয়ে গেল, তবু কমল ভৌমিক আর নিতু ফিরল না। সুকু কেবল ঘর-বার করছে। রাজ্যেশ্বরীর রান্নাবান্না সব জুড়িয়ে গেল। রুকু পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্য দিন হলে সুকু হয় কানে না হয় নাকে পাকানো কাগজ

ঢুকিয়ে দাদার ঘুম ভাঙিয়ে দিত। আজ তার অনেক চিন্তা। এক নম্বর চিন্তা, নিতু আর কমল ভৌমিকের না ফেরা। দু'নম্বর, বাবা হাসপাতালে সুদর্শনকে নিয়ে পড়ে আছেন। কী হল সেই মানুষটির। তিন নম্বর, উইলিয়ামসনের বাংলোটা ভেঙে মাঠ-ময়দান করে দিয়েছে, কুকুরটার কী হল? সুকু ছটফট করছে। কী করবে কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। খুব ইচ্ছে করছে পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। পারছে না ভয়ে। মা রাগ করবেন।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "তুই আর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কী করবি? আসার হলে ঠিক ফিরে আসবে। দাদাকে ডাক, তোদের দু'জনকে খেতে দিয়ে দিই।"

দূর থেকে ডবল হেডলাইট জ্বেলে ঝাঁঝাঁ করে একটা জিপগাড়ি আসছে। গাড়ির আলোয় চারপাশের গাছপালা জ্বলে জ্বলে উঠছে। জিপটা গেটের সামনে এসে থামল। ড্রাইভারের সিট থেকে লাফিয়ে নামলেন চৌবেসাব। নেমেই গেটের সামনে রাজ্যেশ্বরীকে দেখে বললেন, "নমস্কার, নমস্কার।"

রাজ্যেশ্বরী তাড়াতাড়ি বললেন, "নমস্কার, নমস্কার। কোনও খবর আছে?"

"কী খবর দিদি?"

"কমলবাবু আর নিতু সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে, কোনও খবর নেই।"

"আমার দাদাজি কোথায়?"

"হাসপাতালে, এখনও ফেরেননি।"

জিপের পেছনে দু'জন লোক বসে ছিল, চৌবেসাব তাদের বললেন, "এই, মাল নামাও।"

ভারে ভারে সব খাবার নামতে লাগল। গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেল। কচুরি, শিঙাড়া, আলুর দম, পনির-মটর, আচার, লাড্ডু, বালুসাই, প্যাঁড়া। ভেতরে এক-একটা জিনিস যাচ্ছে, আর চৌবেসাব নাম বলছেন। সব শেষে নামল একটা বড় হাঁড়ি। হাঁড়ির মধ্যে হাঁড়ি।

চৌবেসাব বললেন, "এটা আমার দিদির জন্যে স্পেশাল। মালাই আছে মালাই। চারপাশে বরফ। সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন, খাবার সময় বের করবেন।"

"এ-সব আপনি কী করছেন? এই রাতে এত কে খাবে?"

"কী আর এমন রাত হয়েছে দিদি; তবে হ্যাঁ, আপনি চিন্তায় আছেন আমার গুরুজির জন্যে। ভাববেন না, আমি শহর তোলপাড় করে খুঁজে আনছি দু'জনকে। যাবে কোথায়? আজ অবশ্য ডাকবাংলোর মাঠে রামায়ণ হবে।"

"আপনার পুজো কেমন হল?"

"ওঃ, জবরদস্ত! আজ এত জোর হোম লাগিয়েছি, সেরকম হোম জীবনে কেউ কখনও দেখেনি!"

"কীরকম?"

"প্যান্ডেলে আগুন লেগে গেল। সবাই হায় হায় করছে, বলছে অমঙ্গল। আমি ঠাকুরমশাইকে বললুম, 'এই তো হোম চড়ান হাজার আট বেলপাতা।' তিন ক্যানেস্তারা ঘি ঢেলে দিলুম। ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা। সে যা হল! সবই আমার রামজির ইচ্ছা। হনুমানজির ইচ্ছা। বৈশ্বানর গোটা একটা বেলগাছ খেয়ে শেষ করে দিলেন। তিন মন ঘি। জয় রামচন্দ্রজি কি জয়?"

চৌবেসাব কথা বলছেন। জিপগাড়ির সাইড লাইট মিটিমিটি জ্বলছে। সুকু শুনছে। তার চোখ পড়ে আছে রাস্তার দিকে, ঝোপঝাড়ের দিকে। জিপগাড়ির পেছন দিকে, বেশ কিছুটা দূরে একটা ছায়া স্থির হয়ে আছে। সুকু ভাল করে দেখল, একটা বেশ বড় আকারের কুকুর।

ওই তো সেই উইলিয়ামসন সাহেবের কুকুর। সুকু কাউকে কিছু বলল না, ছুটেও গেল না। জানে, এত অচেনা লোকের সামনে আসতে ও ভয় পাবে। কুকুরটা এতদিনে ঠিক ঠিক আশ্রয়হারা হল। চৌবেসাব জিপ নিয়ে চলে গেলেই সুকু কুকুরটাকে ধরে আনবে। ধরতেও হবে না। ডাকলেই চলে আসবে।

চৌবেসাব বললেন, "আচ্ছা দিদি, যাই, আমি দু'জনকে সার্চ করে নিয়ে আসি। আপনি ভাববেন না।"

জিপটা স্টার্ট নিয়ে সোজা চলে গেল। সুকু জানে ঘুরে ওপাশ দিয়ে চলে যাবে। সুকু এইটাই চায়। 'ব্যাক' করলে কুকুরটাকে সরে যেতে হবে।

গাড়িটা চলে যেতেই রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে বললেন, "কে এখন খাবে এত খাবারদাবার! সব নষ্ট হবে।"

সুকু বললে, "তুমি অত ভাবছ কেন মা, আমি লখিয়াদের বস্তিতে গিয়ে সব বিলিয়ে দিয়ে আসছি। ওরা তবু একদিন ভাল খেতে পাবে।"

"ভালই বলেছিস, তবে এত রাতে কি আর জেগে আছে সব!"

"শুনতে পাচ্ছ না মা, ঢোল বাজছে! হোলি এসে গেল। ওরা আর এখন রাতে ঘুমোবে?"

কথা শেষ করেই সুকু রাস্তায় নেমে পড়ল। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "একা অন্ধকারে যাচ্ছিস কোথায়?"

"দাঁড়াও মা, এক সেকেন্ড!"

সুকু কুকুরটাকে ডেকে আনল। গেটের সামনে এসে উইলিয়ামসনের কুকুর রাজ্যেশ্বরীর দিকে মুখ তুলে তাকাল। বয়েস হয়েছে। গলার কাছটা ঝুলে পড়েছে। গেটের কাছের চাপা আলোয় বৃদ্ধ কুকুরের মরা মরা চোখ দুটো দেখা

যাচ্ছে। কুকুরটা জীবনের দুঃখে কাঁদছে। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে গালে।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "এ কী! এ তো সেই সায়েবের কুকুর।"

"হ্যাঁ মা, আজ পুলিশের লোক সায়েবের বাংলো ভেঙে মাঠ করে দিয়েছে। ওর আর কোথাও থাকার জায়গা নেই।"

"ও আজ থেকে আমাদের এখানেই থাকবে।"

"মা, তুমি গ্রেট। তুমি আমার মা।"

রাজ্যেশ্বরী কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী রে, থাকবি এখানে?"

কুকুর আনন্দে ল্যাজ নাড়ল; কিন্তু তখনও তার চোখে জল। সুকুর অনেক জায়গা, খাঁজ-খোঁজ বাড়ির এদিক-সেদিকে ঠিকঠাক করা আছে। কোথায় থাকবে কুকুর, কোথায় থাকবে বেড়াল, থাকবে ডানা-ভাঙা পায়রা? পাম্প ঘরের পাশের কুঠুরিতে চট, খড়, ত্রিপলের টুকরো দিয়ে বিছানা করাই ছিল। সুকু কুকুরটাকে সেইখানে রেখে তাকে বললে, "তুমি এইখানে এখন একটু বিশ্রাম করো, কেমন? আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। যাব আর আসব। এসে তোমার গায়ে চাপা দিয়ে দেব। তোমাকে এক বাটি গরম দুধ খাওয়াব। লক্ষ্মী ছেলে।"

সুকু ফিরে এসে মাকে বললে, "আমি তা হলে চাঁদপালকে ডেকে আনি মা?"

"চাঁদপালকে ডাকবি কেন? চাঁদপাল এখন কী করবে? সেদিনেই তো বাগানের সব কাজ করে গেল।"

"মা, তোমার মনে থাকছে না। অত খাবার তুমি কাকে খাওয়াবে? চাঁদপালকে দিয়ে দাও হাফ।"

"ও, সেইজন্যে ডাকবি! তা যা, ডেকে নিয়ে আয়। সাবধানে টর্চ নিয়ে যাস। ভীষণ অন্ধকার।"

সুকুর আবার টর্চ! পথঘাট তো সবই চেনা। অন্ধকারে সুকুর চোখ জ্বলে বেড়ালের মতো। সুকু সাঁকোর ওপর এসে দাঁড়াল। এই জায়গাটা তার ভারী প্রিয়। সাঁকোর তলা দিয়ে নদী বয়ে যায় কুলকুল করে। সেই পাহাড়ি নদী। সুকু গাছের সঙ্গে, জীবজন্তুর সঙ্গে, নদীর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। সুকু নদীকে বললে, "এইবার একটু ঘুমোও। এরপর শেষ রাতে আজ চাঁদ উঠবে।"

নদী কি আর শোনে মানুষের কথা? পাহাড় তাকে বলছে বইতে। বলছে তোমাকে যেতে হবে সমুদ্রে। সে কি থামতে পারে? নদীকে যেতেই হবে সাগরে।

নদীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বকর বকর করে সুকু সাঁকো পেরিয়ে গেল। দূর থেকে বাজনা বাজাতে বাজাতে দলবল নিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা আসছে। আলোর

রোশনাই কী! তড়াং তড়াং করে জ্বলছে নিভছে। জেনারেটার চলছে ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে। কাছাকাছি আসতে সুকু বরকে চিনতে পারল। মঙ্গলদাসের বড় ছেলে। ওরা খুব বড়লোক। পাথরের কারবারি। রেল কোম্পানিকে বড়-ছোট পাথর সাপ্লাই করে, বিরাট পয়সা।

ছেলেটাকে দেখে সুকুর ভীষণ হাসি পেল। কী সাজাই সেজেছে। মাথায় বিশাল পাগড়ি। বোকা বোকা মুখ করে ভয়ে ভয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। মিছিল চলে গেল। রাস্তা আবার অন্ধকার। আবার ভোঁভোঁ চারপাশ। দূর আকাশে পাহাড়ের শ্রেণি গম্ভীর হয়ে লেগে আছে। বুনো ফুলের গন্ধ মেখে বাতাস বইছে, শীত শীত।

সুকু প্রথমে চমকে উঠেছিল, কী আসছে রে বাবা? জেব্রা নাকি! গায়ে ডোরা ডোরা। সুকু টর্চের বোতাম টিপল। আলোর ঝলক অন্ধকার ফালা করে সামনে ছুটে গেল। নিতু আসছে, নিতু। গায়ে ডোরাকাটা জামা।

"নিতু তুমি?"

নিতু ফোঁসফোঁস করে কেঁদে উঠল। সুকু টর্চবাতি নিবিয়ে দিল।

"তুমি কাঁদছ কেন? কমলকাকু কোথায়?"

নিতু প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারল না। সুকুর দিকে তাকিয়ে রইল। কান্নায় ফুলছে! ফুলে ফুলে উঠছে।

"তুমি বলবে তো, কমলকাকু কোথায়?"

নিতু কোনওরকমে বললে, "কমলকাকু পাগল হয়ে গেছেন।"

"তার মানে? পাগল হয়ে গেছেন মানে? এই তো সকালে সুস্থ ছিলেন! মানুষ হঠাৎ পাগল হয়ে যায় নাকি! একটু একটু করে, দিনে দিনে হয়। কী বলছ তুমি! তুমি নিজেই পাগল হয়ে যাওনি তো?"

সুকু তখন পুরো ঘটনাটা নিতুর কাছ থেকে জানতে পারল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তারা দু'জন নদীর ধারে গিয়ে আর পথ পেল না। এই সেই নদী। এই নদীই ঘুরে, জঙ্গলকে বেড় দিয়ে ওপাশে চলে গেছে। নদীর ধারে গিয়ে কমল ভৌমিক নিতুকে বলেছিলেন, 'জঙ্গল যখন আমাদের ডেকেই এনেছে তখন কী হবে আর লোকালয়ে ফিরে। মানুষের সংসারে কেবল দুঃখ, কষ্ট, আর বেদনা। আজ রাতটা আমরা এখানেই কাটাই। সকালে যখন সূর্য উঠবে, তখন আমরা নদী পেরিয়ে চলে যাব ওই পাহাড়ে। পাহাড়ে অনেক গুহা থাকে, সেই গুহাতেই আমরা বাকি জীবন কাটাব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ আর সাধক আসবেন। আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। আমরা দু'জনে তাঁর শিষ্য হয়ে চোদ্দো বছর সাধন-ভজন করে এক শিবচতুর্দশীর রাতে পাহাড় পেরিয়ে চলে যাব ওপারে। আমি হব বড় সাধু, তুই হবি ছোট

সাধু। আমরা সব সময় সোজা হাঁটব। পেছন ফিরে আর তাকাব না। এই চলতে চলতেই একদিন আমরা পৌঁছে যাব।'

নিতু জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমরা কোথায় পৌঁছাব কাকু?'

উত্তরে কমল ভৌমিক হাহা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'যেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না।'

এরপর কমল ভৌমিক করলেন কী, সব জামাকাপড় খুলে নেমে গেলেন পাহাড়ি নদীর জলে। জল বেশি ছিল না। কোমর জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কমল ভৌমিক স্নান করলেন; তারপর একটা পাথরে বসে অনেক সময় নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গাইলেন, ভবসাগর তারণ কারণ হে। নিতু যত বলে, ও কাকু বাড়ি চলুন, ভীষণ ভয় করছে আমার, কমল ভৌমিক ততই গলা চড়াতে থাকেন। তারপর একসময় গান বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'খিদে পাচ্ছে হে!' নিতু বললে, 'এখানে আর কী খাবেন! বনে কি কিছু পাওয়া যাবে কাকু?' কমলকাকু আবার হাসলেন হাহা করে, 'বোকা, রামায়ণ মহাভারত পড়িসনি? রামচন্দ্র চোদ্দো বছর বনবাসের সময় কী খেয়েছিলেন? কী খেয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময়?'

নিতুর সঙ্গে মিনিট পনেরো বকবক করে কমল ভৌমিক ঘোঁতঘোঁত করে এগিয়ে গেলেন ঝাঁকড়া মতো একটা গাছের দিকে। অন্ধকারে শিকড়ের জড়াজড়িতে পা আটকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে আর ওঠেন না। নিতু ছুটে গিয়ে কমল ভৌমিককে তুলতে গেল। শিকড়ে আর ডালপালায় জড়িয়ে গেছেন। কমল ভৌমিককে ঠেলেঠুলে দাঁড় করাতেই, তিনি আবার বসে পড়লেন। নিতু ভাল করে তাকিয়ে দেখল, কপালের একটা পাশ কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে।

নিতু বললে, 'কাকু, কপালটা যে আপনার কেটে গেছে।'

কমল ভৌমিক বললেন, 'জানি, বেশ জ্বালা করছে আর কী একটা নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আশেপাশেই ওষুধ আছে।' এই কথা বলেই পাশে একটা চারাগাছ ছিল, সেই গাছের পাতা হাতে চটকে কপালে ঘষে দিলেন।

সুকু বললে, "তারপর কী হল?"

"তারপর কমলকাকু তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, উঠেই বললেন, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। পুড়ে গেল, জ্বলে গেল। শেষে ধেইধেই করে নাচতে লাগলেন। নাচেন আর গান, প্রেম দাতা নিতাই বলে, বলো হরি, হরি বলো।

"তারপর নাচতে নাচতে পাগলা হাতির মতো ঝোপঝাড় ভেঙে ঢুকে গেলেন আরও গভীর জঙ্গলে।"

"তারপর?"

"তারপর আমি আর জানি না দাদা। আমি আর ঢুকতে পারিনি। আমার ভীষণ ভয় করছিল।"

"তুমি একা এলে কী করে?"

"আমি দেখলুম, নদীর জল যেদিকে বইছে, আমি যদি সেইদিকে যাই, তা হলে শহর পাব; কারণ নদী আসছে পাহাড় থেকে। আর হলও তাই। ওই সাঁকোর ওপাশে বাতিঘরের কাছে এসে উঠলুম।"

নিতু আর দাঁড়াতে পারল না। বসে পড়ল পথের পাশে। তার পায়ের চটিজোড়া হারিয়ে গেছে। পাথরে পা ঘষে গেছে। তিন-চার জায়গায় কাঁটা ফুটেছে। নিতু ডোরাকাটা জামার পকেট থেকে গোটা কতক পাতা বের করে সুকুর হাতে দিল, "ভাই, এই সেই পাতা। জেঠু তো ডাক্তার, তিনি বলতে পারবেন কী গাছের পাতা?"

সুকু টর্চের আলোয় সেই পাতা দেখে বললে, "আরে ভাই, কী কাণ্ড, এ যে বিছুটি পাতা!"

॥ ২৮ ॥

মিশন হাসপাতালের সামনে বিরাট ভিড়। পুলিশ, লোকজন। ডক্টর মুখার্জি তাঁর চেম্বারে। সামনের চেয়ারে পুলিশের বড়র বড়, তা-বড় কর্তা। থমথমে পরিবেশ।

বড়কর্তা বললেন, "যেমন করেই হোক রুগিকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতেই হবে!"

"অসুখটা জানেন?"

"আমি জানতে চাই না। আমি চাই রুগি সুস্থ হয়ে উঠুক। দিল্লির নির্দেশ। আপনি বুঝছেন না কেন, ও পুলিশ বিভাগের একজন মস্ত বড় গোয়েন্দামশাই। লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সরকারের ওঁর পেছনে। ফট করে মারা গেলে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আপনি জানেন কি?"

"না আমার জেনে দরকার নেই। আমি বুঝি রোগ আর রোগী। আপনাদের ওই সুদর্শনবাবুর সাংঘাতিক এক আফ্রিকান অসুখ করেছে। বাঁচার আশা নেই-ই বলা চলে, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভাল করে তোলার। সবটাই ঈশ্বরের কৃপা।"

"বিজ্ঞানের যুগে আবার ঈশ্বরকে ধরে টানাটানি করছেন কেন?"

"কী করব বলুন, তিনি ছাড়া যে গতি নেই কোনও।"

ডক্টর মুখার্জি কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। রাত হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি যেতে হবে। সেখানেও অনেক কাজ। বিলেত থেকে কাগজপত্র আনিয়েছেন। ডাক্তার ইভানস লন্ডনের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁর বন্ধু। একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। ডাক্তার ইভানসকে দূরপাল্লার ফোনে সব জানিয়েছিলেন। তিনি এই অসুখ নিয়ে ট্রান্সভালে অনেক রিসার্চ করে এসেছেন। এখনও করছেন।

একজন সিস্টার ঘরে এলেন। সাদা ধবধবে পোশাক। বিদেশি মেয়ে। মুখে সবসময় একটা হাসি লেগেই থাকে। ডক্টর মুর্খাজি বললেন, "কী খবর সিস্টার? রুগি এখন কেমন?"

"মিনিট তিনেক আগে একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন।"

"তাই নাকি?"

ডক্টর মুখার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পুলিশ অফিসার বললেন, "তা হলে, তা হলে, তা হলে কি আশা হচ্ছে?"

"আমি আপনাকে এখনই কিছু বলতে পারছি না। অসুখটা সাধারণ নয়। আফ্রিকায় এক ধরনের মাছি আছে, তার নাম হল সেত্‌সি। সেই সেত্‌সি মাছি এই রোগ ছড়ায়। আমাদের ভাষায় এই অসুখের নাম ট্রিপ্যানসোমিয়াসিস।"

"মাছি থেকে হয়! সর্বনাশ! আমার এলাকায় তো ভীষণ মাছি। সব সময় ভ্যানভ্যান করছে। তা হলে আমরাও একদিন মরছি।"

"এ-মাছি সে-মাছি নয়। সেত্‌সি অন্য জাতের মাছি।"

"এই রোগের কী কী লক্ষণ? আমি কি একবার রুগির কাছে যেতে পারি?"

"না পারেন না, কারণ অসুখটা খুব ছোঁয়াচে। বাদামের মতো দেখতে এক ধরনের জীবাণু, তাদের আবার শরীরের দু'পাশে ছোট ছোট পাখনা থাকে। তারা মাছের মতো রক্তের নদীতে খেলে বেড়ায়।"

পুলিশ অফিসার বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "বলেন কী মশাই! আমার তো শুনেই ভয় করছে। তারপর কী হয়? এরা তো আমাদের ক্রিমিন্যালদের চেয়েও সাংঘাতিক। ধরার উপায় নেই, বিচার নেই, সাজাও দেওয়া যাবে না!"

"তা ঠিক। পুলিশের ক্ষমতায় কুলোবে না। প্রথম প্রথম তিন-চার বছর ধরে অল্প অল্প জ্বর হবে। শরীরের এখানে-ওখানে গ্ল্যান্ড ফুলবে। নাড়ি দ্রুত চলবে। তারপর হবে কী, হাত-পা কাঁপতে শুরু করবে। কথা এলিয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি হয়ে যাবে ফ্যালফেলে। তারপর শেষ দশায়, ওই অল্প অল্প জ্বর, আচ্ছন্ন

ভাব, কঙ্কালের মতো চেহারা, রুগির বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকবে না, শেষে মৃত্যু।”

“আর আমার শুনতে ভাল লাগছে না। ভয় করছে। আমি এখন যাই। আপনি হয়তো জানেন না, সারা শহর বেড়ে আমরা একটা জাল ফেলেছি। দিন তিনেকের মধ্যেই আমরা বড় বড় রুই-কাতলা তুলে ফেলব সার।”

সুদর্শন সেই একইভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। স্যালাইন ড্রিপ চলেছে। ডক্টর মুখার্জি নাড়ি দেখার জন্যে হাতটা তুলে নিলেন। খুব জোরে দৌড়োচ্ছে ঘোড়ার মতো; তবে একটু যেন অন্যরকম। যেন একটু শক্তি ফিরে এসেছে। ডক্টর মুখার্জির চোখ দুটো চকচক করে উঠল। তিনি একটা টুল টেনে নিয়ে রুগির বিছানার পাশে বসে পড়লেন। আরও কিছুক্ষণ থাকবেন। সেই কবে ছেলেবেলায় পড়েছিলেন, বিষস্য বিষমৌষধি। বিষের ওষুধ বিষ।

সিস্টার ঘরে এসে ডাক্তারবাবুর কানে কানে বললেন, “সার, আপনি এবার বাড়ি যান। আমি তো আছি সারারাত।”

ডাক্তারবাবু ফিসফিস করে বললেন, “তুমি, বরং আমার বাড়িতে একটা ফোন করে বলে দাও, ফিরতে একটু দেরি হবে।”

“আপনার থাকার দরকার আছে?”

“আছে সিস্টার।”

সিস্টার আর কিছু না বলে চলে গেলেন। জানেন এ-মানুষটির সঙ্গে তর্ক চলে না।

ডক্টর মুখার্জি যখন বিলেতে ছিলেন, তখন এই অসুখটি নিয়ে গবেষণার জন্যে বিলেত থেকে আর এক সহকারীকে নিয়ে গিয়েছিলেন জিম্বাবোয়েতে। জিম্বাবোয়ের রাজধানী হল হারারে। প্রথমে হারারে। হারারে থেকে প্লেনে ওয়াদজে। ওয়াদজে হল চৌকাঠ। টপকালেই সেই সাংঘাতিক এলাকা। তিন হাজার ন’শো বর্গমাইলে পিনপিন করে উড়ছে বিভীষিকা। শত শত সেত্‌সি মাছির জন্মস্থান। সারা বিশ্বের গবেষকরা ফেলেছেন তাঁবু। সামান্য মাছি, সেই মাছির এত ক্ষমতা!

সামান্য মাছি নয়, সাংঘাতিক মাছি। পৃথিবীর আদিমতম প্রাণী। মানুষের ইতিহাস লেখার আগে, প্রাগৈতিহাসিক কালেই এই যমদূতের জন্ম। সাড়ে তিন কোটি বছর আগের ফসিলে এই মাছির দেহাবশেষ মিলেছে। সাংঘাতিক ব্যাপার। ডাইনোসর, টেরোড্যাকটিল, সেত্‌সি মাছি। পৃথিবীটা তখন কী আতঙ্কের ছিল!

সেই ওয়াদজের ক্যাম্পে মোটা ক্যানভাসের জামা-প্যান্ট পরে, সর্বাঙ্গ ঢেকে থাকতে হত। কামড়ালেই মৃত্যু। এই মাছির হুলের এত ক্ষমতা যে, গন্ডারের

চামড়াও ফুটো করতে পারে। খুব সহজে। নিমেষে। ক্যানভাসের জামা-প্যান্ট তো নস্যি। মাছির যা ওজন, এক-এক কামড়ে তার তিন গুণ রক্ত টেনে নিতে পারে। বছরে প্রায় বিশ হাজার আফ্রিকাবাসী এই অসুখে আক্রান্ত হয়। বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ গোরু-ছাগল এই মাছির কামড়ে শেষ হয়ে যায়।

এই মাছি বহুকাল আফ্রিকাকে বিদেশির আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে। মুসলমান আক্রমণ সারা আফ্রিকা নিয়ে নিতে পারত। পারেনি। এই মাছির এলাকায় এসে প্রাণভয়ে পালিয়েছে। ইউরোপের পর্যটকরা খ্রিস্টধর্ম নিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে বাধা পেয়েছে। মাছি একটা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। মাছি যদিও তুমি মৃত্যুর দূত, তবুও তোমাকে নমস্কার।

সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ডক্টর মুখার্জি মাছির কথা ভাবছেন। দেখতে বেশ সুন্দর; কিন্তু কামড়ালেই মৃত্যু। গোটাকতক তাঁকেও কামড়েছিল, ভাগ্য ভাল, এখনও কিছু হয়নি। সেত্‌সির কামড়ে মৃত্যু, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। একদিন সকালে তাঁদের ক্যাম্পে এক মহিলা এলেন, কোলে একটি শিশু। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে শুইয়ে দেওয়া হল হাসপাতালের বিছানায়। তার সারা শরীর কাঁপছে। এক-একবার চোখ খুলে তাকাচ্ছে; কিন্তু কিছুই তেমন চিনতে পারছে না। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল।

ডাক্তার গ্লিন এই মাছি ধরার কৌশল আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই জাতের মাছির দৃষ্টিশক্তি অসম্ভব ভাল; কিন্তু ভীষণ ভালবাসে ষাঁড়ের নিশ্বাসের গন্ধ। ষাঁড়ের নিশ্বাস তুলোয় ধরে ডা. গ্লিন লন্ডনে পাঠান। সেখানে ল্যাবরেটরি সেই নিশ্বাসের নির্যাস তৈরি করে ফেরত পাঠায়। সেই নির্যাস কালো আর নীল রঙের মশারির গায়ে লাগিয়ে গ্লিন মাছি ধরেন। শ'য়ে শ'য়ে মাছি ধরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সারা আফ্রিকায় ওই মাছির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে জোর লড়াই। ডাক্তারবাবুর মনে পড়ছে, গভীর সেই মাছি মারার অভিযান। মাছিরা ওই সময় ঝোপেঝাড়ে, আগাছায় একটু স্থির থাকে। মারতে সুবিধা হয়। ছোট উড়োজাহাজের ককপিটে তিনি বসে আছেন পাইলটের পাশের আসনে। প্লেন উড়ছে খুব নিচু দিয়ে। গাছপালার মাত্র মিটার দশেক ওপর দিয়ে। প্লেনের সার্চলাইটের আলোয় ভুতুড়ে গাছপালা আসছে আর হুস হুস করে পেছনে চলে যাচ্ছে। মাছি মারার সাদা বিষাক্ত ধোঁয়া মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ভয়, উত্তেজনা, সব মিলিয়ে জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্লেন গাছে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। তখন বয়েসটা কম ছিল, সাহসও ছিল তেমনই। মাঝরাতে ওই ফ্লাইবেল্টের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তিনি যেন দেখতে পেতেন অতীতের সব চরিত্র। মুসলমান, খ্রিস্টান অভিযাত্রীর দল। সার সার উট আর ঘোড়া অজ্ঞাত

কারণে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছে। ওঠার ক্ষমতা নেই। সাহসী আর লোভী মানুষদেরও সেই একই অবস্থা। দলকে দল লোপাট। কারণটা তখন জানা ছিল না। আজ জানা গেছে।

সুদর্শন একবার চোখ মেলে তাকালেন। কিছুই চিনতে পারলেন না। শেষ সময়ে সেই আফ্রিকান শিশুটির মতো চোখের দৃষ্টি। হতাশ হলেন ডাক্তার মুখার্জি। মনে হয় তিনি হেরে যাচ্ছেন। মাছির কাছে মানুষের পরাজয়। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে কয়েক সিসি পেন্টামিডিন ভরে নিলেন। ধীরে ধীরে চালিয়ে দিলেন সুদর্শনের শরীরে। শেষ লড়াই। যদি ভাল করতে পারেন, তা হলে আবার একবার বিলেত যাবেন। সেখান থেকে যাবেন আফ্রিকায় ঘুড়ি ওড়াতে। জেয়ার অ্যাঙ্গোলা, উগান্ডা, সুদান, ক্যামেরুন। সুন্দর সুন্দর সব জায়গা; কিন্তু মৃত্যু যে-কোনও মুহূর্তে। ঘুড়ির কাগজে ষাঁড়ের নিশ্বাসের নির্যাস মাখিয়ে বেড়ে যাবেন। গোঁত মেরে বেশ কিছুক্ষণ লাট খাওয়াবেন মাছির এলাকায়। বোকা বদমাশগুলো ছেঁকে ধরবে। ধীরে ধীরে তখন টেনে আনবেন হাতের মুঠোয়। তারপর মাছি মারার বিষ। অনেকদিন জীবন-মরণ কোনও অ্যাডভেঞ্চার করা হয়নি। মনে মনে ভাবলেন, এবার যখন যাব ডাকাবুকো সুকুটাকে সঙ্গে নোব। রুকুটা একটু ঘরকুনো আছে।

ডক্টর মুখার্জি সিস্টারকে ডাকলেন, এবার বাড়ি যাবেন। আজ রাতে এই পর্যন্তই থাক।

এদিকে এইসব যখন হচ্ছে, ওদিকে আর-এক কাণ্ড। চৌবে সারা এলাকা চষে ফেললেন গাড়ি নিয়ে গুরুজি, কমলজির সন্ধানে। কোথায় কমলজি! তিনি ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে বসে পড়েছেন হনুমানজির মন্দিরের চাতালে।

সুকু আর নিতু ওদিকে চাঁদপালের বস্তিতে। চাঁদপাল তখন খুব ঢোল বাজাচ্ছিল, খাঁই-খাঁচা, খাঁই-খাঁচা। যত বাজায়, তত মাথা নাড়ে। সুকু টর্চের আলো মুখে ফেলতেই চাঁদপাল চিৎকার করে উঠল, "আরে কওন বে!"

চাঁদপাল সঙ্গে সঙ্গে ঢোল মাটিতে ফেলে এগিয়ে এল।

"আরে রামজি কা কৃপা। খোকাবাবু আ গিয়া। জোরসে বাজা। জোরসে বাজা।"

"না, এখন নো বাজনা। টক।"

চাঁদপালের সঙ্গে সুকুর এইভাবেই কথা হয়। চাঁদপালকে সুকু সময় পেলেই ইংরিজি শেখায়। চাঁদপাল বড় মজার মানুষ। এত বয়েস হল, প্রায় বুড়ো হয়ে এসেছে, তবু কত কী শেখার ইচ্ছা। সুকুও চাঁদপালের কাছে অনেক কিছু শিখেছে। ঝুড়ি বোনা। পাপোশ বোনা। দড়ির জাল তৈরি। কাঠের কাজ।

চাঁদপাল বললে, "অ, আই সি। এনি ডেঞ্জার!"

"গুড নিউজ, ব্যাড নিউজ মিকসড।"

"আই সি, আই সি।"

"মা তোমাকে ডাকছে।"

"তা হলে তো তুরন্ত যেতে হবে। আমার সাইকিলটা বের করি!"

"সাইকিল না। বলো সাইকেল। তুমি তা হলে চলে যাও।"

"আর তোমরা?"

"আমরা এখন জঙ্গলে যাব।"

"অ্যাঁ, জঙ্গলে যাবে। তোমাদের মাথাফাথা সব খারাপ হল নাকি? এত রাতে কেউ যায়! তোমাদের ভয়-ডর নেই?"

"তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ, নো ফিয়ার।"

"তা বলে, একটা কারণ থাকবে তো!"

"আছে তো! আমার এক কাকু, কলকাতার কাকু, জঙ্গলে ঢুকেছিলেন, আর বেরোচ্ছেন না। হারিয়ে গেছেন।"

"এই কেস! তা আমি বিশটা আদমি নিয়ে নিই। মায়ের কাছে পরে যাচ্ছি।"

"মা তোমাকে অন্য কারণে ডেকেছে। তোমাদের জন্যে খাবার আছে।"

"খাবার! ফার্স্ট কাকু। দেন খাবার। সব আ যাও!"

চাঁদপাল হুংকার ছাড়ল। সে নেতা। এক ডাকে হাজার চেলা জুটিয়ে ফেলতে পারে। চাঁদপাল আবার হোমিওপ্যাথি করে।

"সব একটা করে ঢোল আর মশাল নাও। আমাদের জঙ্গলে যেতে হবে। কুইক। কুইক।"

॥ ২৯ ॥

কমল ভৌমিককে খুঁজতে বিরাট এক শোভাযাত্রা চলেছে। কারও হাতে লণ্ঠন। কারও হাতে টর্চ। কারও হাতে মশাল। ঢিগ-ঢিমি, ঢিগ-ঢিমি ঢোল বাজছে। ঢাকুম ঢাকুম করে তেহাই ছাড়ছে থেকে থেকে। আর তেমনি বেসুরো গান সঙ্গে, গলা নয় তো সব যেন ফাটা কাঁসি। মাঝে মাঝে আবার কালোয়াতি আছে।

বড় খোদা কা নাম লিয়া/ মারতে হেঁজি মারতে হেঁ
ডিল্লিকো ফুকারতে হেঁ
ডিল্লি গিয়া আল্লা কোশ, মার বাহাদুর পহলা চোট।

ঢাঁই-ঢিমি, ঢাঁই-ঢিমি। এদের হাতে ঢোল যেন কথা বলে। সঙ্গে করতাল। খঞ্জনি। ঝঁয় ঝমে, ঝঁয় ঝমে। নিতুর বেশ মজা লাগছিল। যেন বিয়ের মিছিল চলেছে। পাহাড়ের দিক থেকে বেশ শীত শীত হাওয়া আসছে। ঢ্যাবা ঢ্যাবা তারা ফুটে আছে আকাশে। সাঁকোর তলা দিয়ে পাহাড়ি নদী চলেছে কুলকুল করে।

উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। সামনে এসে থেমে পড়ল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে চৌবেজি বললেন, "কীসের জলুস?"

চাঁদপাল বললে, "জঙ্গলের জলুস।"

"সে আবার কী?" চৌবেজি নেমে এলেন।

সুকু এগিয়ে গিয়ে বললে, "কাকু, আমাদের কমলকাকু জঙ্গলে হারিয়ে গেছেন। আমরা সবাই তাঁকে খুঁজতে চলেছি।"

"শুধু কমলজি, সঙ্গে একটি ছেলেও আছে, দিদি বলছিলেন।"

"এই তো ছেলেটি বেরিয়ে এসেছে। আমাদের নিতু।"

"আই সি, তা হলে গুরুজিই শুধু রয়ে গেছেন। দাঁড়াও, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।"

চৌবেজি গাড়িটাকে সাইড করে চাবি বন্ধ করে এলেন। আবার মিছিল চলতে লাগল, "বড় খোদাকা নাম লিয়া। মারতে হেঁজি মারতে হেঁ।"

কিছু দূর যেতে না যেতেই আবার একটা গাড়ি এল। এবার নেমে এলেন ডাক্তারবাবু। সব শুনলেন। শুনে বললেন, "চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।"

আবার মিছিল চলতে লাগল। "ডিল্লিকো ফুকরাতে হেঁ। ডিল্লি গিয়া আল্লা কোশ। মার বাহাদুর পহলা চোট।' টিগ-টিকুম, টিগ-টিকুম, খাঁই-খাঁচা, খাঁই-খাঁচা।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে। চৌবেজি নিতুকে বললেন, "ওকে জিজ্ঞেস করো তো গুরুজি কোথা দিয়ে ঢুকেছিলেন?"

নিতু বললে, "ওকে মানে?"

"মানে ওই ছেলেটাকে, যে গুরুজির সঙ্গে ঢুকেছিল।"

"আমিই তো সেই ছেলে।"

"ও, তুমিই সেই ডোরাকাটা জামা? তা হলে বলো তো বাবু, কোথা দিয়ে ঢুকেছিলে?"

"আর একটু এগিয়ে।"

"আই সি। আই সি।"

আবার সেই শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল, ঢোল বাজাতে বাজাতে। গানের কথা হঠাৎ পালটে গেল,

আ নিনি, যা নিনি, জঙ্গল পাতি বের,
মেরা বাবু খানে জানে দামড়ি কা দো সের।

যত সব গান গাইছে নিতুর তত হাসি পাচ্ছে। গানের কী বাণী! হঠাৎ নিতুর মনে হল, এই সেই জায়গা। বিশাল বিশাল দুটো অর্জুন গাছ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বিশাল এক শিলাখণ্ডের পিঠ জেগে আছে। একটা পাহাড় হতে হতে থেমে গেছে। নিতু জানে পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এইরকম হয়। ভূমিকম্পে পাহাড় ঠেলে ওঠে। কোনওটা আকাশ পর্যন্ত উঠে যায়। উঠতেই থাকে। কোনওটা অল্প একটু উঠেই থেমে পড়ে। এইসব ব্যাপার মনে হয় গভীর রাতে হয়। সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন পাহাড় চুঁইচুঁই করে বড় হয়। ফুলের কুঁড়ি ফিসফিস করে ফুটে ফুল হয়ে বসে থাকে। গাছে গাছে চিনচিন করে নতুন পাতা গজায়। সারা পৃথিবীতে কত ঘটনাই যে ঘটতে থাকে! দিনের বেলা এসব হয় না মনে হয়, তা হলে মানুষ যে সব জেনে ফেলবে?

নিতু বললে, "এই তো সেই জায়গা। ওই তো দুটো গাছ। এইখান দিয়েই আমরা ভেতরে ঢুকেছিলুম।"

চৌবেজি বললেন, "সর্বনাশ। এ যে সেই ডাকাত কালীর জঙ্গল রে বাবা। গুরুজি এর মধ্যে ঢুকে বসে আছেন? রামজিই জানেন, ভাগ্যে কী আছে?"

নিতু এতবার এই পথ দিয়ে গেছে, জঙ্গলে কোনওদিন ঢোকেনি। কেনই বা ঢুকবে? চৌবেজি পাঁচ সেলের টর্চের আলো ফেললেন। আলোর রেখা কিছু দূর গিয়েই ঘন গাছপালায় আটকে গেল। সেখানে একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে।

চৌবেজি সকলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, "সাবধান ভাইসব। শুনেছি এখানে মামারা থাকেন। আমরা কেউই তাঁদের ভোজ হতে চাই না।"

চাঁদপালদের ঢোল বেজে উঠল। খাঁই-খাঁই খাঁই-খাচা, খাঁই-খাচা করতাল। সঙ্গে গান, আ নিনি, যা নিনি। নিতু তার ডোরাকাটা জামার গলার বোতামটা আটকে নিল। এই জামাটাই তার সব। বিপদের বন্ধু। সুকু নিচু হয়ে শুকনো একটা গাছের ডাল তুলে নিল। বনে কোথাও ফুল ফুটেছে। ভুরভুর করে গন্ধ আসছে। ঢোলের বিটকেল শব্দে আর ষাঁড়ের মতো বিটকেল গলার গান শুনে, পাখিরা জেগে উঠে, গাছে গাছে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দু'-একটা পাখি চিঁচিঁ করে ডেকে উঠল।

চৌবেজি চিৎকার করে বললেন, "জঙ্গলের ঘুম ভাঙিয়ো না। আমাদের পাপ হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল আর গান দুটোই থেমে গেল। ভীষণ প্রশান্তি চারপাশে। থকথকে নীরবতা। লাখ লাখ ঝিঁঝিপোকা ঝিনঝিন, চিনচিন করছে। করাতপোকা কটর কটর করে গাছের গুঁড়ি চিরছে। পিংপং বলের মতো জোনাকির আলো ব্লপ-ব্লপ করে ভেসে উঠছে, দুলছে। কোনওটা এদিকে যাচ্ছে, কোনওটা ওদিকে। সে যে কী দৃশ্য, ভাবা যায় না। জঙ্গলে ভয় আছে, আবার আনন্দও আছে।

সবাই পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে গাছের পাতা দুলে দুলে উঠছে। পায়ের তলায় শুকনো ডাল পড়ে মট করে ভেঙে যাচ্ছে। বাতাস ক্রমশই ভারী হয়ে আসছে। যত এগোচ্ছে সুকুর ততই মনে হচ্ছে, কিছু যেন একটা হচ্ছিল, তারা যেতেই সব বন্ধ হয়ে গেল।

এরা এদিক থেকে এগোচ্ছে, ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। এরা জানে না ওরা এগোচ্ছে, ওরা জানে না এরা এগোচ্ছে। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে গেল। ওরা মানে স্পেশ্যাল পুলিশের বিশাল একটা দল। আজ তো সেই রাত। আজই তো কথা ছিল সশস্ত্র পুলিশ জঙ্গল ঘেরাও করে অপরাধীদের ধরবে। বড় বড় সার্চলাইটের আলো ফেলে পুলিশবাহিনী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে চারপাশ থেকে। আজ তার রক্ষা নেই।

চাঁদপাল বলছে, "আমরা তো অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছি, কোথায় সেই ভদ্রলোক।"

চৌবেজি বললেন, "আমরা যাঁকে খুঁজছি তিনি কি এক জায়গায় বসে থাকার মানুষ?"

নিতু বললে, "সেই নদীটা কোথায় গেল?"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "রাত্তিরের জঙ্গল। সহজে কি পাওয়া যাবে? ভোর না হলে কিছু হবে না।" ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, চারপাশ থেকে সার্চলাইটের আলো পড়ে জায়গাটা দিনের মতো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শতকণ্ঠের আদেশ, "হ্যান্ডস আপ। হ্যান্ডস আপ।"

পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল ঘনঘন। চারদিকে দুদ্দাড় শব্দ। জঙ্গলের ডালপালা ভয়ানকভাবে দুলতে লাগল। চাঁদপালের দল ঘেরাও হয়ে গেল। চৌবেজি বললেন, "আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। সেই সকাল থেকে আজ যে কতরকম কী হচ্ছে?"

"সাইলেন্স। সাইলেন্স। যার কাছে যা অস্ত্র আছে, সব ফেলে দাও যে-যার নিজের পায়ের কাছে।"

অস্ত্র মানে তো ঢোল, করতাল, খঞ্জনি, টর্চলাইট, মশাল। মশাল তো জ্বালাতেই হয়নি। কালি পড়া ভুতো হারিকেন। যে-যার সব পায়ের কাছে

নামিয়ে রাখল। অফিসার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "লিডার কে দলের লিডার!"

চৌবেজি বললেন, "লিডার কেউ নেই। আমরা গণতান্ত্রিক দল।"

"কবে নির্বাচন?"

"পাঁচ বছর পরে।"

"সব কেন্দ্রেই ক্যান্ডিডেট দেওয়া হবে?"

শেষ প্রশ্নটা করেই অফিসার বললেন, "সরি। এ প্রশ্ন তো নয়। গোলমাল করে ফেলেছি। আবার প্রথম থেকে শুরু করি। হু আর ইউ?"

"আমরা সার্চপার্টি।"

"তার মানে? আমরাও তো সার্চপার্টি, ব্যাপারটা কীরকম হল!"

পাশ থেকে সেকেন্ড অফিসার বললেন, "আপনি ভুল করছেন স্যার।"

"কী ভুল?"

"মনে নেই, আমাদের ট্রেনিং-এর সময় শিখিয়েছিল, অন্যের কথা বিশ্বাস করব না। যাচাই করে নেবে।"

"কীভাবে যাচাই?"

"এঃ, আর আপনি প্রথম ভাগটাই ভুলে বসে আছেন। প্রথমে প্রত্যেককে সার্চ করতে হবে। তারপর গ্যাং-লিডারকে ধরে বেমক্কা পেটাতে হবে। পিটুনি দিলেই পেটের কথা বেরিয়ে আসবে।"

"তোমার বিদ্যা ওই প্রথম ভাগেই আটকে আছে। তৃতীয় ভাগে কী আছে, মনে নেই! প্রথমেই পেটাবে না। ওটা সব শেষের জন্যে তুলে রাখবে। প্রথমে খুব ভাল কথা, যেমন, ভাই, তোমরা কে?"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আমি এই জেলার সিভিল সার্জেন, ডক্টর মুখার্জি।"

"আরেব্বাস, আপনি ডক্টর মুখার্জি। আপনাকে কে না চেনে? আপনি তো সুদর্শনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন?"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "বিশ্বাস করার আগে ভেরিফাই। ডক্টর মুখার্জি বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে। র‍্যাশন কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই, পাসপোর্ট, যে-কোনও একটা জিনিস দাখিল করতে হবে!"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "এই যে আমার আইডেন্টিটি।"

পকেট থেকে কার্ড বের করে অফিসারের হাতে দিলেন। তিনি টর্চের আলো ফেললেন। সেকেন্ড অফিসার থার্ড অফিসারকে বললেন, "মুখে আলো ফেলো।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "হ্যাঁ মিলেছে, তবে এই মুখের একটা দোষ হল

জন্মগত কোনও চিহ্ন নেই। যেমন তিল, আঁচিল, জড়ুল। থাকলে ঝট করে বলা যেত, হ্যাঁ ইনিই সেই মানুষ। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপনাদের সুবিধের জন্যে, সামনের বার ঠোঁটের ওপর একটা আঁচিল নিয়ে জন্মাব।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "আঃ সেটা যদি করতে পারেন আমাদের খুব সুবিধে হবে। আপনারও অনেক সুবিধে হবে। এক কথায় সব গোলমাল মিটে যাবে। যাক, আমি এখন আপনাকে কুৎসিতভাবে জেরা করব। জানেন তো, পুলিশের পরীক্ষায় জেরা ছিল আমার স্পেশ্যাল পেপার। একশোর মধ্যে নিরানব্বই পেয়েছিলুম। আমার জেরার প্রথম প্রশ্ন হল, এই গভীর রাতে, এ-কুখ্যাত জঙ্গলে আপনি কী করছেন? এখানে তো আপনার রুগি নেই!"

"আমার এক বন্ধুর খোঁজে এসেছি।"

"বন্ধুর খোঁজে জঙ্গলে? এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য উত্তর হল!"

ফার্স্ট অফিসার সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, "কী? জেরা ঠিক মতো হচ্ছে তো?"

"পারফেক্ট। ঠিক জায়গায় চেপে ধরেছেন।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "বেড়াতে এসে হারিয়ে গেছে?"

"কী করে বুঝলেন, তিনি এখানেই বেড়াতে এসেছিলেন? তিনি কি আপনাকে ফোন করেছিলেন?"

"এই ছেলেটি তাঁর সঙ্গে ছিল।"

"ছেলেটি? কোন ছেলেটি?"

"এই যে ডোরাকাটা জামা?"

"এর জামাটা এমন ডোরাকাটা কেন? ও কি কোনও সময় জেলখানার কয়েদি ছিল?"

"না।"

"কিন্তু জামাটা খুব সন্দেহজনক। এরকম জামা তো সাধারণত কেউ পরে না। আচ্ছা বলো তো খোকা, তোমার ফ্যামিলির কেউ কখনও জেলে গেছে?"

নিতু এমনিই খুব ঘাবড়ে ছিল। দুম করে বলে বসল, "আমার মামা এখন জেলে আছে।"

অফিসার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। নির্জন বন যেন চমকে উঠল। সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী বলেছিলুম তোমাকে? পুলিশ লাইনে জেরাই হল সব। এক-একটাকে ধরো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা চালাও। সারা পৃথিবীর খবর বেরিয়ে আসবে। দেখলে তো, জামা

দেখেই আমি বুঝেছি ছেলেটা ক্রিমিন্যাল। নাও, ধরো ওকে। পাকড়াও। আর জামা পালটাতে হবে না। ওটা পরেই ফাটকে যেতে পারবে।”

॥ ৩০ ॥

অন্ধকার। সুকুর গা ঘেঁষে নিতু দাঁড়িয়ে ছিল। ফার্স্ট অফিসার ঘটোৎকচের মতো হাসতে হাসতে আবার বললেন, “দাঁড়িয়ে কেন সব, দাঁড়িয়ে কেন সব, হাতে হাতবালা গলিয়ে দাও। সেই সন্ধেবেলা থেকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে একটাও যদি না পাই, চাকরি যাবে যে। বাঘ-ভাল্লুক না পাই, খরগোশই একটা ধরে নিয়ে যাই।”

নিতুর কিন্তু বেশ সাহস। কোনও ভয়ডর নেই। দুম করে বলে বসল, “আপনারা কি সবাই পাগল? ওই ডি. এম. পাগল। আপনি পাগল। আপনার আর সব লোকেরা, সবাই, সবাই ঘোর পাগল।”

চৌবেজি নিতুকে সমর্থন করলেন, “ছেলেটা বলেছে ঠিক। সব ক’টা পাগল এই জেলায় এসে জুটেছে। আরে মশাই, মামার সঙ্গে ভাগনের কী সম্পর্ক? মামা জেলে গেছে বলে ভাগনেও যাবে?”

“কেন যাবে না? শাস্ত্রে বলে মামা অপরাধী হলে ভাগনেও অপরাধী হবে। মামা সাধু হলে ভাগনেও সাধু হবে।”

“আপনার মামা কি পুলিশ ছিলেন?”

“না।”

“তা হলে আপনি কী করে পুলিশ হলেন?”

“আরে মশাই, আমার মায়ের কোনও ভাই ছিল না। একজন ছিল, তাও সেই অনেক ছেলেবেলায় কলেরা হয়ে মারা গেল। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমার মামা থাকলে সে পুলিশ হত।”

“তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল, ভাগনের মতো মামা হয়, না মামার মতো ভাগনে!”

“অত সব জানি না। অঙ্কে কাঁচা বলেই তো পুলিশ লাইনে এসেছি, তা না হলে তো প্রফেসার হয়ে যেতুম। তা ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন।”

ফার্স্ট অফিসার একটু আমতা আমতা করলেন, তারপর হঠাৎ যেন জোর পেয়ে গেলেন। তাল ঠুকে বললেন, “কিন্তু আমি তো অত সহজে হারব না। মামা যদি ভাগনের মতোই হবে, তা হলে এর মামা কেন অপরাধী হল? তা হলে এ অপরাধী। এই পাকড়ো, ইসকো পাকড়ো।”

চৌবেজি বললেন, "এই রোকো, ওসব পাকড়াপাকড়ি রাখো। আমরা মাঝরাতে জঙ্গলে এসেছি মামা-ভাগনে মামা-ভাগনে করতে নয়। আপনি তো পুলিশ। আপনি কোথায় আমাদের সাহায্য করবেন তা না, তখন থেকে কেবল পাগলামি করে যাচ্ছেন। এই কি স্বাধীন দেশের পুলিশের ভূমিকা!"

"কী আমাকে করতে হবে বলুন না। উই আর অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।"

পুলিশ দলের একজন করুণ সুরে বলে উঠল, "স্যার, মশা কামড়াচ্ছে।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "চুলকে নাও।"

চৌবেজি বললেন, "আমার গুরু কমল ভৌমিক হারিয়ে গেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের অন্ধকার থেকে, যেদিকে চাঁদপালের দলবল, কে একজন বলে উঠলেন, "কই, আমি তো হারাইনি?"

"অ্যাঁ, সে কী?" চৌবেজি চিৎকার করে উঠলেন, "কে আপনি?"

শুকনো পাতার খড়বড় শব্দ। সবকটা টর্চের আলো সেই দিকে পড়ল। কুচকুচে কালো একটি লোক ধীরে ধীরে এল সামনে। সুকুর একবার মনে হচ্ছে, এই আমার কমলকাকু, আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে তা কী করে হয়। তিনি তো ছিলেন ফরসা ধপধপে, আর ইনি তো কালো কুচকুচে। কমল ভৌমিক সব সময় সুন্দর সুন্দর জামাপ্যান্ট পরেন। ইনি তো পরে আছেন একটা ময়লা প্যান্ট আর ছেঁড়া ছেঁড়া গেঞ্জি।

চৌবেজি আবার বললেন, "আপনি কমল ভৌমিক? নিজেকে ঠিক চেনেন তো?"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "বাঃ, চৌবে, ভারী সুন্দর, ভারী সুন্দর বলেছ তুমি।"

"না না, ডাক্তারসাব, আপনিই বলুন, আমার গুরুজি কীরকম দেখতে ছিলেন আর এঁকে কীরকম দেখতে। কালো হাঁড়ির মতো মুখ। আমার গুরুজির মুখ ছিল কত সুন্দর।"

"ধরে এক রাউন্ড দাওয়াই দিয়ে দেব কি? তা হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে লোকটা কে? ইম্পোস্টার।"

নিতু ফিসফিস করে সুকুকে জিজ্ঞেস করল, "ইম্পোস্টার মানে কী?"

"জোচ্চোর।"

চৌবেজি বললেন, "না না, এক্ষুনি দাওয়াই দেবার দরকার নেই।"

"তা হলে ছেড়ে দিন আমার হাতে, আমি জেরা শুরু করি। জেরায় সব বেরিয়ে আসবে।"

লোকটি বললে, "সত্যি বলছি, আমি কমল ভৌমিক।"

নিতু বললে, "আমি গলা শুনে চিনতে পেরেছি। আপনি কমলকাকু।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এসব ব্যাপারে কথা বলতে এসো না খোকা। এসব বড়দের ব্যাপার। আমাকে জেরা করে যাচাই করে নিতে হবে।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "যাচাই করতে হবে না। আমি চিনতে পেরেছি। এখন আমি চিনতে পেরেছি। আর এক মিনিট দেরি না। এক্ষুনি হাসপাতালে চলুন।"

চৌবেজি বললেন, "তা হলে ব্যাপারটা কী হল? আমরা তা হলে এত কষ্ট করে মাঝরাতে, জঙ্গলে এলুম কেন? গুরুজি, কোথায় ছিলেন আপনি?"

কমল ভৌমিকের গলাটা বেশ ভারী শোনাল। বললেন, "আমি তো সেই কখন থেকে আপনাদের পেছন পেছন ওই গানের দলের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে আসছি।"

চৌবেজি রাগ-চাপা গলায় বললেন, "আশ্চর্য মানুষ আপনি! আপনি জানেন না, আমরা আপনাকেই খোঁজার জন্যে দলবল নিয়ে চলেছি। আপনি আমাদের পেছন পেছন আসছেন অথচ একবারও বলছেন না, আমি আসছি।"

"কী আশ্চর্য, তোমরা তো আমাকে দেখতেই পাচ্ছ।"

চৌবেজি হাত-পা নেড়ে বললেন, তাজ্জব কি বাত! আমরা কাকে দেখছি গুরুজি! আপনি কি আর আপনি আছেন?"

"কেন! আমি তো আমিই আছি। খালি আমার জামাটা চলে গেছে, আর সাদা প্যান্টটা ময়লা হয়ে গেছে।"

চৌবেজি আবার বললেন, সেই আগের মতো হাত-পা নেড়ে, "আপনার আয়না আছে, আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন, কী কমলজি ছিলেন আর কী কমলজি হয়েছেন?"

পুলিশের সেই হাবিলদার আবার কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "মশা কামড়াচ্ছে স্যার, বহুত কামড়াচ্ছে।" ফার্স্ট অফিসারের সব ভাল, কেবল একটাই দোষ, বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে হলে ঘুমিয়ে পড়েন। গত বছর একটা খুব শক্ত অসুখ করেছিল, তারপর থেকেই এইরকম হয়েছে। তা না হলে নাগাড়ে তিন-চার রাত জেগে থাকা তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। ফার্স্ট অফিসার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অল্প অল্প নাক ডাকছে। সেকেন্ড অফিসার খোঁচা মেরে বললেন, "স্যার, রামস্বরূপ বলছে মশা কামড়াচ্ছে!"

ফার্স্ট অফিসার ঘুম চোখে বললেন, "অ্যারেস্ট হিম।"

তারপর ঘুম ছেড়ে যেতেই তিনি বীরবিক্রমে বললেন, "আর সময় নষ্ট নয়। আমি বুঝতে পেরেছি এরা সবাই ডাকাত। সব ক'টা মিথ্যে কথা বলছে। এরা চোর। সেই সন্ধে থেকে আমরা জঙ্গল ঘিরে রেখেছি, এই এতক্ষণে আমাদের

জালে বিরাট, বিরাট, বিরাট একটা দল ধরা পড়েছে। এবার আমি প্রোমোশন পাব, এবার আমি কমিশনার হব।”

চৌবেজি বললেন, “ঠিক আছে, আপনি কমিশনার হন, আমরা আপনার জন্যে মেঠাই কিনে আনি।”

ফার্স্ট অফিসার বললেন, “মশাই, এই একটু মজা হল। পরপর তিন রাত আমরা এই জঙ্গল ঘিরে রেখেছি। একটা পাখিও জালে পড়েনি। অথচ কমিশনার সাহেবের ধারণা, যত ক্রিমিন্যাল সব এই জঙ্গলে ঢুকে আছে। প্রথমে আমরা চেয়েছিলুম জঙ্গলটাকে কেটে সাফ করে দেব। বনবিভাগের ঘোর আপত্তি। বলে কিনা, সারা পৃথিবীর আবহাওয়া পালটে যাবে।”

ডক্টর মুখার্জি বললেন, “সারা পৃথিবীর নয়, এই অঞ্চলের আবহাওয়া পালটে যেতে পারে। পাশের ওই পাহাড়ি নদী জমি খেয়ে ফেলতে পারে, যাকে বলে ভূমি-ক্ষয়। বন্যা হতে পারে। বৃষ্টি কমে যেতে পারে। গাছপালার খুব প্রয়োজন আছে।”

“জানি আছে, কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখুন। জঙ্গল নয় তো, ব্লাডব্যাঙ্ক। রক্ত খেয়ে খেয়ে আমাদের মশাই অ্যানিমিয়া করে দিলে। এইভাবে মাসের পর মাস জঙ্গল পাহারা দিতে হলে আমরা মারা যাব। জানেন তো, আমরা একটা স্প্রে এনেছি সঙ্গে। মাঝে মাঝেই ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে দিচ্ছি, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না।”

চৌবেজি বললেন, “এ কি আপনার শোবার ঘর পেয়েছেন? স্প্রে করে কিছু হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা যে স্মোক বম্ব ব্যবহার করত, সেই বোমা চাই মশাই, বোমা। আচ্ছা অফিসার, আমরা তা হলে যাই।”

“এতক্ষণ আপনারা ছিলেন আমরাও বেশ ছিলুম, এখন সারারাত আমরা কী করব? ওই জন্যেই ইচ্ছে করছে, আপনাদের অ্যারেস্ট করে রাখতে। আচ্ছা মশাই, আপনাদের দলে কি এমন কেউ নেই, যাকে গ্রেফতার করা যায়। পরে জামিনে ছেড়ে দেব। তা হলে আজকের রাতটা একটু ঘুমোতে পারি। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলুম। ফাটকে রাতটা ভরে রাখলুম। সকালে কোর্টে হাজির করে জামিনে ছেড়ে দিলুম। যে-কোনও একজনকে দিন না ভাই!”

এই কথা শুনেই চাঁদপালের দল খাঁই-খাঁচা, খাঁই-খাঁচা করে বাজনা আর গান শুরু করে দিলে, “আরে, ভাই রাম বোলো, হালুয়া খালো, বাত বোলো, রামা রামা হো।” পুলিশের দল হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, চাঁদপাল, তার দল, ডাক্তারবাবু, চৌবে, কমল ভৌমিক, সবাই নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়ে আসামাত্রই সারা জঙ্গল যেন ফেটে পড়ল। ভলকে ভলকে গুলির শব্দ।

চৌবেজি বললেন, "আরেব্বাপ, এ যে দেখি চিন-জাপানের লড়াই।"

টাঁই করে একটা গুলি এসে যে ঢোল বাজাচ্ছিল তার ঢোলে লাগল। ঢোলটা ফেঁসে গেল। চাঁদপাল বললে, "সামালকে ভাইসাব। সামালকে। সব শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।"

আর একটা গুলি এসে সামনের একটা গাছের গুঁড়ি ফুটো করে দিল। যে জায়গায় লাগল সেই জায়গা থেকে এক ভলক ধোঁয়া বেরিয়ে এল। একপাল শেয়াল জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে এক পলক থমকে দাঁড়িয়ে আবার ছুট লাগল রাস্তা ধরে। ফটফট করছে চাঁদের আলো। জঙ্গলের ভেতর বাঘা-ভালুকের লড়াই বেঁধে গেছে।

ডক্টর মুখার্জি মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে বললেন, "আমার কিন্তু এবার ভীষণ রাগ হচ্ছে।"

চৌবেজি পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি বললেন, "ডাক্তারসাব, রেগে কী করবেন, যা যুগ পড়েছে, এসব সহ্য করতেই হবে। আগে জঙ্গলে মুনি-ঋষিরা থাকতেন, এখন থাকে চোর, গুন্ডা, বদমাশ।"

গুলির শব্দে পাখিদের ঘুম ভেঙে গেছে। হরেক রকমের পাখি একসঙ্গে ক্যাচোর ম্যাচোর করছে। হঠাৎ গুলির শব্দ থেমে গেল। ঝিমঝিম চাঁদের আলোয় লম্বা ফিতের মতো পড়ে আছে কালো পিচের রাস্তা। সুকু ঘাড় তুলে দেখল অনেক দূরে তিনটে শেয়াল থমকে দাঁড়িয়ে আছে। যতটা সম্ভব নিচু হয়ে তারা বেশ কিছুদূর গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ল। খুব একটা হল যা হোক।

চাঁদপালরা তাদের ডেরায় ফিরে যাচ্ছিল। সুকু বললে, "চাঁদপালদা, মা কিন্তু ডেকেছে।"

"এত রাতে যাওয়া কি ঠিক হবে সুকুদাদা?"

"খুব হবে।"

"তা হলে আমি একা যাই।"

চাঁদপাল লেখাপড়া-জানা মানুষ। বনবিভাগে ভাল চাকরি করে। ডাক্তারবাবুর গাড়ি চেপেই চলল। কমল ভৌমিক এর মধ্যেও আরও কিছুটা ফুলে উঠেছেন। সুকু পাশে বসে তাকাচ্ছিল। মুখটা গোল বেলুনের মতো হয়ে গেছে। রংটা হয়েছে আলুপোড়ার মতো। গলার স্বরটা কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে।

কমল ভৌমিক জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, আমার কী হয়েছে?"

ডাক্তারবাবু গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, "অ্যালার্জি হয়েছে।"

"আমি কি আরও ফুলব?"

"হ্যাঁ, ফুলতে পারেন। আপত্তি আছে?"

"না না, আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো ফুলতেই চাই আবার কমে যাব না তো?"

"ওষুধ পড়লেই কমে যাবেন।"

"তা হলে ওষুধ আর না-ই বা দিলেন।"

সুকুর মা রাজ্যেশ্বরীও কমল ভৌমিককে চিনতে পারেননি প্রথমে। গুরুচরণ বলে ভুল করেছিলেন। বাজারে গুরুচরণের গুড়ের ব্যাবসা। ছেলেবেলায় ভিমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছিল। গুনে গুনে একশো আটটা ভিমরুল কামড়ে ধরেছিল। বর্ষার পাগলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক্কা সাতমাইল ভেসে গিয়ে ডুমরি গ্রামের কাছে নদীর বাঁকে এক পাহাড়ে আটকে গিয়েছিল। গুরুচরণের জ্ঞান ছিল না। সেখানে একটা শিবের মন্দির ছিল। ভাঙাচোরা সাংঘাতিক। সেই মন্দিরে থাকতেন এক ভৈরবী। সেই ভৈরবী দেখতে পেয়ে গুরুচরণকে বাঁচান। বাঁচালে কী হবে, সেই থেকে গুরুচরণের রং হয়ে গেল কালচে-লাল। আর গুরুচরণ ফুলে ফেঁপে একটা কুমড়োর মতো হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য ফিরে গেল। গুরুচরণ ক্রমশ বড়লোক হতে হতে এখন কুবের। দেওয়ালির দিন সাত-আট হাজার টাকার বাজি পোড়ায়। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ তিন ঘণ্টার মতো বাজির ফুলকিতে আলোয় আলো হয়ে থাকে।

কমল ভৌমিক থপথপ করে সবার আগে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। নিতু এত ক্লান্ত যে, বারান্দার ঠান্ডা মেঝেতে ধুপুস করে শুয়ে পড়ল। পড়ামাত্রই ঘুম।

॥ ৩১ ॥

চাঁদপাল বারান্দায় নিতু যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেইখানে থেবড়ে বসে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে ছোট একটা কৌটো বের করে হাতের তালুতে কী একটা নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে দলতে লাগলে। খইনি। বেশ কিছুক্ষণ দলে, এক চিমটে নিয়ে নীচের পাটির দাঁত আর ঠোঁটের মাঝখানে ভরে, বুঁদ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। খুব গাইতে ইচ্ছে করছিল। ডাক্তারবাবুর ভয়ে গাইবার সাহস পাচ্ছে না। গুনগুন করছে আপন মনে।

হঠাৎ চাঁদপালের মনে হল ছেলেটা কেন ঠান্ডা মেঝেতে পড়ে আছে! উচিত নয়। বারান্দার শেষ মাথায় একটা ডিভান পাতা আছে। ছেলেটাকে ওখানে তুলে শুইয়ে দিলে কেমন হয়। চাঁদপাল যা ভাবে তাই করে। নিতুকে দু'হাতে তুলে ডিভানে শোওয়াতেই নিতুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে

প্রথমে বুঝতে পারল না কে দাঁড়িয়ে আছে সামনে! এই সামান্য ঘুমের মধ্যেই নিতু বাবাকে স্বপ্ন দেখছিল। বাবা সামনে এসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতুর দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, "নিতু ওঠ ওঠ, অনেক রাত হয়েছে। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লি বাবা।"

স্বপ্নের ঘোর নিতুর তখনও কাটেনি। চাঁদপালকে অনেকটা তার বাবার মতো দেখতে। নিতু ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, "কে বাবা! বাবা, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?" এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলেই, নিতু তার ভুল বুঝতে পারল। আর ভুল বুঝতে পেরেই সে কেঁদে ফেলল। আর কেঁদে ফেলেই তার মনে হল, পরের বাড়ি। কাঁদলে সবাই বিরক্ত হবে। অথচ কান্না চাপতেও পারছে না। সব সময় তার বাবার কথা মনে পড়ে। আজ আবার স্বপ্নে দেখেছে। কাঁদতে তাকে হবেই। নিতু ডিভান থেকে নেমে ছুটে অন্ধকার বাগানে চলে গেল।

চাঁদপাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বুকটা কেমন করছে। চোখ দিয়ে ফোঁটাফোঁটা জল নামছে। নিতুর মতো তারও একটি ছেলে ছিল। ঠিক তিন বছর আগে ছেলেটি মারা গেছে। ছেলের মা মারা গেছে তারও দু'বছর আগে। সেই থেকে চাঁদপাল বেপরোয়া। দিনেরবেলা কাজ করে। সন্ধেবেলা সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে বেধড়ক ঢোল পেটে। যা রোজগার করে, সব দান করে দেয়। তার টাকায় ছোটমতো একটা স্কুল চলে।

চাঁদপাল আস্তে আস্তে বাগানে গেল। ছেলেটা হঠাৎ তাকে বাবা বলল কেন? কাঁদলই বা কেন? নিতু ইঁদারার পাড়ে চুপ করে বসে আছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। চাঁদপাল আলতো করে নিতুর মাথায় হাত রাখল। নিতু মুখ তুলে তাকাল।

"তুমি কাঁদছ কেন?"

নিতু ধরাধরা গলায় বললে, "চাঁদপালদা, আপনাকে আমার বাবার মতো দেখতে। আমি বাবাকে স্বপ্ন দেখছিলুম।"

"তুমি ডাক্তারবাবুর কে হও?"

"কেউ না। আমি কেউ হই না। আমার কেউ নেই।"

"তোমার কেউ নেই তো? আমারও কেউ নেই। আজ থেকে তুমি আমার, আমি তোমার। সব আমার রামজির ইচ্ছা। রামজির ইচ্ছা। রামজির ইচ্ছায় হনুমান সাগর পেরিয়েছিল এক লাফে। কাঠবেড়ালিও সেতুবন্ধন করেছিল। রামজির ইচ্ছায় রামজি বনবাসে গিয়েছিলেন। আবার রামজির ইচ্ছাতেই রামজি অযোধ্যায় রাজা হয়েছিলেন। জয় রামচন্দ্রজি কি জয়।"

নিতু বললে, "আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। ডাক্তারজেঠু আর জ্যাঠাইমা আমাকে আটকে দিয়েছেন। আমি এখন কী করব?"

"তুমি চলে যেতে চাইছ কেন? তুমি কোথায় যাবে?"

"কোথাও তো যেতে হবে। যেখানে গেলে আমি একটা কাজ পাব। আমি বসে বসে কারও খেতে পারব না। আমার বাবা বলেছিলেন, তোকে অনেক কষ্ট করে বড় হতে হবে। কোনওদিন খেতে পাবি, কোনওদিন খেতে পাবি না। কিন্তু ভয় পাবি না কখনও। আর ভিক্ষে করবি না। ডাক্তারজেঠুকে বললুম, আমাকে চাকর রাখুন। জ্যাঠাইমা বললেন, আমার দুই ছেলে ছিল, এখন থেকে তিন ছেলে হল।"

"বাঃ বাঃ, কেয়া বাত। এঁরা দেওতা। তা তুমি যাবে কেন?"

"আমার ডোরাকাটা জামা বলছে, এ-শহর আমার নয়। আমাকে উত্তরে যেতে হবে।"

"ডোরাকাটা জামা মানে? জামা কথা বলে নাকি?"

"এই যে, এই জামাটা। এই জামাটা আমাকে তৈরি করে দিয়ে বাবা বলেছিলেন, এই জামাটা তোকে আমার দেওয়া শেষ জামা। এই জামাটা গায়ে দিলে, তোর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। আর এই জামা তোকে পথ দেখাবে।"

"এটা তোমার কেমন কথা হল? এ আমি মানতে পারছি না বাবু। এ সব হল দুর্বলের কথা। আমার কথা আলাদা। হ্যাঁ, তোমার আগের কথা আমি সব মানছি। শেষ কথাটা নয়। তোমাকে আমি আমার কাছে রাখব। আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্কুলে পড়বে। অনেক বড় হবে। বড় হয়ে আমার স্কুলেই পড়াবে। তখন আমি থাকব না, তুমি থাকবে।"

"চাঁদপালদা, আপনার জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"এই জায়গাটাও ভাল। আমাদের ডাক্তারদাদা যে কত ভাল, তোমার কোনও ধারণা নেই। বউদিমণি ভাল। দুই ছেলে যেন হিরের টুকরো!"

"সব ভাল খুব ভাল; কিন্তু আমার জামা বলছে, এখানে থাকলে আমার নয় এঁদের খুব ক্ষতি হবে।"

"তোমার জামাটা তুমি ত্যাগ করো। ওটা তোমার বন্ধু নয়, শত্রু।"

ওপাশ থেকে সুকুর গলা ভেসে এল, "চাঁদপালদা, তুমি কোথায়?"

চাঁদপাল হেঁকে বললে, "আই অ্যাম হিয়ার, অন দি গার্ডেন। টেরিফিক মুনলাইট।"

"তুমি মুনলাইট থেকে ইলেকট্রিক লাইটে এসো। মা ডাকছেন।"

"কামিং বস।"

ওদিকে জঙ্গলে পুলিশরা গুলি ছোড়াছুড়ির পর শান্ত হয়েছে। জঙ্গলের বাইরে রাস্তার ধারে দুটো পাথরের ওপর ফার্স্ট অফিসার আর সেকেন্ড অফিসার মুখোমুখি বসে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "ব্যাপারটা কী হল?"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "হঠাৎ গুলি ছুড়লেন কেন?"

"আমি ছুড়ব কেন। প্রথমে তো তুমি ছুড়লে।"

"না, আমি ছুড়ব কেন? আমার এই বন্দুকে কোনওমতেই আর গুলি ছোড়া যাবে না। ট্রিগার লক হয়ে গেছে। এটা এখন আমার হাতের শোভা।"

"তা হলে, কে ছুড়েছে। হু ইজ হি। আমি জানতে চাই। আমি কি ফায়ার বলেছিলুম! আমি ফায়ার না বললে গুলি ছোড়ে কী করে। নিয়মটা কী? সিনিয়ার অফিসারের অর্ডার ছাড়া গুলি ছোড়া যায় না। গাছের ডালে একটা সাদা জামা ঝুলছে। সেই জামা দেখে আমাদের পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলি খতম হয়ে গেল। গুলি কি সস্তা! এর আমি কী জবাব দোব। হাউ আউ ওউ জাস্টিফাই। ইজ ইট মামার বাড়ি?"

"এক্সকিউজ মি, স্যার। ইংরেজিটা কেমন যেন হয়ে গেল।"

"ইয়েস। হল ওইরকমই হবে আমি জানতুম। হাউ দিয়ে শুরু করলেই আমার ওইরকম হয়ে যায়। আগেও লক্ষ করেছি। এখনও লক্ষ করলাম। কিছু করার নেই। হাউ বললেই আমার আই-টা আউ হবেই হবে।"

"সে হোক; কিন্তু ওউটা কী?"

"ওটা উইল। সেকেন্ড অফিসার, ইংরেজির উচ্চারণের ভুল ধরার সময় এটা নয়। আমরা এখন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছি। সেটা ভাষা-সমস্যা নয়। গুলি-সমস্যা। অকারণে গুলি চালানো যায় না। হোয়্যার ইজ দি ডেডবডি? ক্রিমিনালরা কোথায়? ওপরওলাকে আমরা কী জবাব দোব? আই উইল গো ম্যাড। পাগল হয়ে যাব।"

"এইবার আপনার উইলটা উইলই হয়েছে।"

"আর যে হাউ নেই। সেই জামাটা কোথায়, যেটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল।"

"এই যে স্যার। রেডি করে রেখেছি। একেবারে ঝেড়েঝুড়ে সুন্দর করে।"

"গুনে দেখো তো, জামাটায় ক'টা ফুটো হয়েছে! মোট ক'টা গুলি জামায় লেগেছে!"

"একটাও না। নট এ সিঙ্গল গুলি। জামাটা অ্যাজ নিউ অ্যাজ এনিথিং। ইচ্ছে করলে কেচে ইস্তিরি করে পরা যায়।"

"অপদার্থ, অপদার্থ। এতগুলো গুলি ছোড়া হল, একটাও তোমরা জামায় লাগাতে পারলে না। তবু বলতে পারতুম অপরাধী সাতটা গুলি খেয়ে জামাটা ফেলে রেখে পালিয়েছিল। কমিশনারসায়েব, এই দেখুন, জামার গায়ে সাতটা ফুটো।'

"আর এই কথা শুনে কমিশনারসায়েব হা হা করে হেসে বলতেন, যাও, বাড়ি যাও। তোমাকে আর পুলিশগিরি করতে হবে না। যার গায়ে সাত-সাতটা গুলি লাগল, সে জামাটা খুলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে গেল। তাও আবার জামায় ছিটেফোঁটা রক্তের দাগ নেই। গাঁজাটাজা খাচ্ছেন নাকি আজকাল। বড়বাবু এর ফাইলটা আনুন তো, আজই খতম করে দিই।"

ফার্স্ট অফিসার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেকেন্ড অফিসারের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমরা কি অন ডিউটিতে? মানে আমরা কি ডিউটিতে আছি?"

"কী মনে হচ্ছে আপনার? আমরা এখানে নিশ্চয় বনভোজনে আসিনি?"

"তা হলে সিগারেট খাওয়া যাবে না?"

"যাবে না যাবে না। তার জন্যে অত ভাবনা কীসের?"

"না, তা হলে আর একটু বুদ্ধি খুলত।"

"আমার বুদ্ধি খুলে গেছে।"

"যেমন?"

"এই জামাটা যার, সেই হল অপরাধী। ঠিক তো?"

"ইয়েস, সেন্ট পারসেন্ট ঠিক।"

"তা হলে এই জামাটা যার গায়ে হবে, তাকেই আমরা ক্যাচ, কট, কট।"

"আঃ, ফার্স্ট ক্লাস। এবার আমরা একটা সিগারেট খাব। ওসব চাকরিটাকরি আর মানব না।"

"ফট করে সিগারেট ধরবার মতো কিছু হয়নি। আসল কাজটাই বাকি। আঁটিটাকে বের করতে হবে।"

"আঁটি মানে? আঁটি তো আমেরই হয়!"

"আমড়ারও হয়। আমরা খোলসটা পেয়েছি। এখন আমাদের শাঁসটা চাই, কোমরে ফাঁস লাগাবার জন্যে।"

"নাঃ, এবার দেখছি তোমার প্রোমোশানের জন্যে আমাকে ওপরে লিখতেই হচ্ছে।"

"আপনার চাকরি না গেলে আমার প্রোমোশন হবার চান্স নেই।"

"কেন?"

"আর পোস্ট কোথায়? এই কেসটায় ভগবানের দয়ায় আপনার চাকরিটা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রোমোশান; আপনাকে তখন আর লিখতেও হবে না। গাছ থেকে পাকা ফল পড়ার মতো ঝপ করে আমার হাতে এসে পড়বে।"

"তুমি তা হলে আমার শত্রু?"

"মশাই, চাকরির জীবনে কেউ কারও বন্ধু নয়। মনে নেই, ধেমো কোলিয়ারির কেসে সত্যনারায়ণকে ফাঁসিয়ে আপনি প্রোমোশান পেয়েছিলেন।"

"তা যদি বলো, তা হলে তুমিও তো বাবা দেলখোশকে চামুণ্ডা ডাকাতি কেসে ফাঁসিয়ে প্রোমোশান পেয়েছ। দুনিয়াটাই তো ফাঁসাফাঁসির ব্যাপার।"

"যাক গে, যাক গে। চেপে যান। আমরা কেউই সাধু নই। এখন চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি। সারা তল্লাট হুল্লোড় করে, যারা সব শুয়ে আছে, তাদের টেনে টেনে তুলে জামাটা পরাই। যার গায়ে ফিট করবে, তাকেই ক্যাঁক।"

"দাঁড়াও, ওয়াটসন, দাঁড়াও। সেখানেও একটা পরিকল্পনা আছে। প্রথম কোন তল্লাটে যাব?"

"ওয়াটসন মানে? ওয়াটসন আবার কে? আমার নাম তো দীপনারায়ণ!"

"অশিক্ষিত। একেবারে অশিক্ষিত। শার্লক হোমস পড়েনি! আমি শার্লক, তুমি আমার অ্যাসিসট্যান্ট। হোমস-এর অ্যাসিসট্যান্ট ছিল ডক্টর ওয়াটসন। দেখি জামাটা আমার হাতে দাও। হ্যাঁ। টর্চটা ফেলো। এই দেখো, কাপড়টা হল দামি টেরিকটন। তা হলে এ-জামা যার, তার পয়সা আছে।"

"এবং ভদ্রলোক।"

"অ্যাঃ, এই সিদ্ধান্তটা তোমার ভুল হয়ে গেল। আসল ওয়াটসন হলে, দুম করে এমন বলতে পারতে না। ভদ্রলোক হলে জঙ্গলে গাছের ডালে জামা ঝুলিয়ে চম্পট দিত না। যার জামা, সে ভদ্রলোক নয়, তবে হ্যাঁ, চুরি-ডাকাতি করে তার টু পাইস হয়েছে। তা হলে আমরা কোথায় গিয়ে শুরু করব! এই শহরে কিছুই না করে হঠাৎ যারা বড়লোক হয়েছে তাদের ওপর হামলা চালাব? এইবার বলো এমন লোক কে কে আছে?"

"একজনও নেই। নট এ সিঙ্গল। সবাই ব্যাবসা করে বড়লোক।"

"তা হলে তো খুব মুশকিল হয়ে গেল। একজনও নেই?"

"না।"

"তা হলে আমরা কোথায় যাব?"

"আমি ছেলেবেলায় ডিটেকটিভ উপন্যাসে পড়েছি, যারা জামা-কাপড় কাচে, তার জামা দেখলেই বলে দিতে পারে কার জামা।"

"ব্যস, তা হলে তো হয়েই গেল। আমরা এখন ধোবিটোলায় যাব।"

"নো, কভি নেহি। আমরা যাব চৌপট্টিতে। যে চারটে লন্ড্রি আছে সেইখানে যাব। এসব জামা যারা কাচায়, তারা লন্ড্রিতে দেয়।"

"আর লন্ড্রি কোথায় দেয়! তারা ওই ধোপাদেরই দেয়। কমনসেন্স, ওয়াটসন। কমনসেন্স। দিনের আলো ফোটার আগেই একটার কোমরে দড়ি পরাতে হবে। তারপর কমিশনারকে দিয়ে সার্কিট হাউসে, প্রেস কনফারেন্স কল করিয়ে সব

কাগজের সাংবাদিকদের সামনে আমরা বলব, কাল সারারাত রেড চালিয়ে আমরা ডাকুর জঙ্গল সাফ করে দিয়েছি। পালের গোদা ধরা পড়েছে। কিছু পালিয়ে গেছে ভৈরব পাহাড়ের দিকে। আমি হাতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধব। গালে ঢেরা করে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগাব। বলব, নিজের জীবন বিপন্ন করে আসামিকে ধরেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে খিচিং খিচিং করে আমার ছবি তুলবে। পরের দিন সকালে বৈভব বার্তার ফার্স্ট পেজে আমার ছবি। হেডলাইন নিউজ, পুলিশ অফিসারের বীরত্ব। নিজের জীবন বিপন্ন করে...।"

"আমি সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে চিৎকার করে উঠব, ফলস, ফলস। ফলস দিচ্ছে।"

"তাতে তোমারই লোকসান। আমি এস. পি. হলে তবেই না তুমি ফার্স্ট অফিসার হবে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছিলেন কালিদাস।"

"ভুল হল। পায়ে মারেননি। মেরেছিলেন গাছের যে-ডালে বসে ছিলেন, সেই ডালে।"

"ওই হল। সাধারণ বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে একই হল।"

"আপনার কাছে তো সব ব্যাপারই এক।"

"তক্কো কোরো না। নাও এখন, গাত্র উত্থান করো।"

ফার্স্ট অফিসার আর সেকেন্ড অফিসার গাত্রোত্থান করে দেখলেন তাঁদের দলবলের কেউ কোথাও নেই। কারও টিকির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

ফার্স্ট বললেন, "এ কী, ব্যাপারটা কী! প্রভুরা সব গেলেন কোথায়?"

সেকেন্ড বললেন, "আপনি কি বলেছিলেন, কোম্পানি ডিসমিস। মনে করে দেখুন তো।"

"মনে আবার করব কী? আমার সেই সিপাহি বিদ্রোহের সময়ের কথা মনে আছে, আর পনেরো মিনিট আগের কথা মনে থাকবে না। আমি ডিসমিস বলিনি। বলতে পারি না।"

"তা হলে কি আমি বলেছি। আমার নামে দোষ দিচ্ছেন!"

"বাঁশি বাজাও। তিনবার বাঁশি বাজিয়ে দেখো, যদি আসে ভাল, না আসে চিরকালের জন্যে ডিসমিস করে দাও। অমন পুলিশ ফোর্সের চেয়ে দেশ চোর-ডাকাতে ভরে যাওয়াই ভাল।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "একটা বাঁশি পেলে একবার কেন একশোবার বাজাতে পারি।"

"তোমার বাঁশি কোথায় গেল। উইদাউট বাঁশি তুমি অফিসারি করছ।"

"কী করব বলুন, তাড়াহুড়োয় বাঁশিটা আমি খাটের মশারি টাঙাবার কাঠে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।"

"বাঃ, বাঃ, চমৎকার। সুন্দর এক্সপ্ল্যানেশান।"

"আপনার বাঁশিটা বাজান না স্যার। আজকের মতো আপনি বাজান।"

"আরে আমার বাঁশিটাও তো আমি দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি। আমার না হয় বয়েস হয়েছে। ভুলো মন। তোমরা ইয়াং ম্যান, তোমাদের ভুল হবে কেন? যাক গে, তোমারও বাঁশি নেই, আমারও বাঁশি নেই খুঁজে পেতে দেখি নবাবরা সব গেলেন কোথায়। দেশ স্বাধীন হবার পর এরা এত স্বাধীন হয়েছে যে, সব অচল হয়ে আসছে।"

॥ ৩২ ॥

দুই অফিসার খুঁজতে বেরোলেন। ত্রিসীমানায় কেউ নেই। হঠাৎ দেখা গেল ঝোপের ভেতর থেকে বুটপরা একজোড়া পা বেরিয়ে আছে।

দু'জনে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, "মার্ডার, মার্ডার।"

ফার্স্ট অফিসার সেকেন্ডকে বললেন, "যাও। গিয়ে দেখো।"

"সেটা কি ঠিক হবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট! ফুট মার্ক!"

"মুর্খ। আরে তুমি কি আসামি! তুমি তো পুলিশ। মার্ডার হলে পুলিশই তো যাবে। থেকে থেকে নিজের ভূমিকা ভুলে যাও কেন? ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। যাও ঠ্যাং ধরে টেনে বের করো।"

সেকেন্ড অফিসার গজগজ করতে লাগলেন, "এমন বরাত করে জন্মেছি, যত থার্ড ক্লাস কাজ আমাকে দিয়ে। ওই গোদা গোদা পা দুটো ধরে আমাকেই টানতে হবে। আমাকেই টানতে হবে, আর বাবুরা সব ভোরের হাওয়া খেতে চলে গেলেন।"

"শোনো, শোনো, আমি তোমার সিনিয়ার গুরুজন। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, কাজের বড় নেই, কাজের ছোট নেই। কাজ ইজ কাজ। কর্মযোগ। রোজ সকালে উঠে দু'পাতা করে গীতা পড়ো না কেন! মনটা বেশ পরিষ্কার থাকবে। হাসিমুখে কাজ করার অভ্যাস এসে যায়। জানো, একদিন কমিশনার আমাকে দিয়ে দুধ দুইয়ে ছিলেন। হাঁটু গেড়ে বসে চাঁইচুঁই করে এক বালতি দুধ দুইলাম। মনের ভেতর গজগজানি, কিন্তু মুখে আমার এই এতখানি হাসি। তবে হ্যাঁ, কর্মযোগের এখনও একটু বাকি আছে। মন আর মুখ যেদিন এক হয়ে যাবে, সেইদিন আমার ট্রেনিং কমপ্লিট হবে। নাও, ধরে টানো।"

সেকেন্ড অফিসার ঝোপের দিকে তাকালেন। পা দুটো অদৃশ্য হয়ে গেছে। চমকে উঠে বললেন, "স্যার, পা! পা কোথায়? নেই তো।"

ফার্স্ট অফিসার তাকালেন। ভাল করে তাকালেন, "আরে, সত্যিই তো। পা দুটো গেল কোথায়!"

"ওরে বাবা রে, ভূত স্যার। শিয়োর ভূত।"

সেকেন্ড অফিসার ছুটে পালাতে চাইছিলেন। ফার্স্ট অফিসার খপ করে হাত চেপে ধরলেন।

"আমাকে ভূতের মুখে ফেলে রেখে পালাতে চাইছ! তোমার লজ্জা করছে না। পালাতে হলে দু'জনে পালাব। নয়তো দু'জনেই ফেস করব। ডোন্ট ফরগেট, আমরা পুলিশ। এনি ডে আমি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়ে যেতে পারি।"

"ডোন্ট ফরগেট, পুলিশের কাজ চোর ধরা ভূত ধরা নয়।"

হঠাৎ ঝোপটা ভীষণ দুলে উঠল। আর দুই অফিসারই দৌড়োবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় ব্লপ ব্লপ করে গোটাকতক মাথা উঠে পড়ল। দু'জনে ভয়ে ভয়ে সেইদিকে তাকালেন। তাকিয়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"আরে, তোমরা সব ওখানে? ফায়ার। সব ক'টাকে মেরে শুইয়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে মাথার ওপর দু'হাত তুলে দিল। এক ডিভিশান কনস্টেবল, প্রত্যেকে মাথার ওপর দু'হাত তুলে, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "তোমরা ওখানে কী করছিলে। কী, করছিলে কী ওখানে?" বজ্র-গর্জনের মতো গলা।

"আমরা এই তুলসীবনে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম স্যার। স্লাইট ঘুম্মে পড়েছিলুম।"

"তোমরা আমার কলঙ্ক। আমার মুখে চুনকালি মাখাবার জন্যে তোমরা জন্মেছ। বুঝেছ। তোমাদের নিয়ে, তোমাদের নিয়ে, তোমাদের নিয়ে...।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "মরেছে। সেই এক কেস। রেগে গেলে কথা আটকে যাওয়া। বলুন, তোমাদের নিয়ে পাগল হয়ে যাব।"

"না না, ও-কথা আমি বলতে চাই না। আমি বলতে চাই, তোমাদের নিয়ে কী করব!"

"কী আর করবেন? চাকরি করবেন। চোর-ডাকাত ধরবেন। এস পি হবেন।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "সব বেরিয়ে এসো। কাম আউট। তোমাদের টানা ছ'ঘণ্টা আমি পি টি করাব।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "না স্যার। আমাদের ধোবিটোলায় যেতে হবে।"

* * *

চাঁদপাল, অত খাবার দেখে বললে, "মাতাজি, এই এত রাতে এসব নিয়ে আমি কোথায় যাব! আমি বরং এই বারান্দায় একটু শুয়ে পড়ি। একটু পরেই তো ভোর হয়ে যাবে। তখন আমি গাড়িও পাব। আর আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "সে তো বেশ কথা। তুমি তা হলে আমাদের সঙ্গে কিছু খাও। খেয়ে ওই ডিভানে শুয়ে পড়ো।"

"ডিভানে আমার ঘুম হবে না মাতাজি। আমার মাটিতে শুয়েই অভ্যাস। আমাকে আপনি চট টট, যা হয় একটা কিছু দেবেন, তা হলেই হবে।"

কমল ভৌমিক এর মধ্যে আরও কিছুটা ফুলেছেন। চেয়ারে বসে বসেই ফুলে উঠছেন। আর হাসছেন। রুকু আর সুকু কিছু দূরে বসে অবাক হয়ে দেখছে। কমল ভৌমিক হাসতে হাসতে বললেন, "কী মজা বলো তো। অক্লেশে কীরকম ব্যাঙের মতো ফুলছি। আর কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা লোকটাকেও ছাড়িয়ে যাব।"

সুকু জিজ্ঞেস করলে, "আপনার এখন কেমন লাগছে কাকু?"

"নট ব্যাড। একটা কুমড়ো কুমড়ো ভাব। ভেতরটা একটু হাঁসফাঁস করছে। আর খুব জলতেষ্টা পাচ্ছে।"

ডক্টর মুখার্জি ঘরে এলেন। কমল ভৌমিকের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। এখন তাঁর ভাবভঙ্গি ডাক্তারের মতো। কমল ভৌমিকের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "শরীরে কোনও জ্বালা আছে? চুলকোচ্ছে?"

কানের ভেতর আর চোখ দুটো চুলকোচ্ছে।"

"এবার আপনাকে একটা ইঞ্জেকশান দেব। খুব ঘুম হবে। এমনও হতে পারে, আপনি হয়তো দু'-তিন দিন পড়ে পড়ে ঘুমোবেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাল হয়ে যাবেন।"

"তা দিন। দিয়ে দিন। তবে কিছু একটু খেতে পারলে ভাল হত।"

"কী খেতে চান?"

"আমার শিষ্য চৌবে অনেক ভাল-মন্দ খাবার দিয়ে গেছে। ভাবছিলুম...।"

"ভেবে লাভ নেই। ঘিয়ে-ভাজা কোনও কিছু চলবে না। অল্প একটু মিষ্টি টিস্টি খেতে পারেন। খেয়ে আপনি আপনার বিছানায় চলে আসুন।"

"গোটাদশেক সন্দেশ খাই। এমন খিদে আগে আমার কখনও পায়নি।"

"পাবে। পেতেই পারে। সেই কখন খেয়েছেন।"

"আসলে কী জানেন, জঙ্গলে গেলে মনে হয় খুব খিদে পায়। আচ্ছা, আমি তা হলে গপাগপ খাই। তারপর যা হয় হবে।"

রাত অনেক। কেউই তেমন বেশি খেতে সাহস পেল না। ডক্টর মুখার্জি তো বলতে গেলে কিছুই খেলেন না। নিতু কিছুতেই খাবার টেবিলে বসল না। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "ছেলেটাকে যত কাছে টানতে চাইছি, ততই দূরে সরে যাচ্ছে।"

চাঁদপাল বললে, "ওর দেহের বয়সের চেয়ে মনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। ভাবছি কী, ওকে আমি মানুষ করব। আমি যে-স্কুলটা চালাই, সেই স্কুলে ওকে ভরতি করে নেব। আমার আখড়ায় ওকে কুস্তি শেখাব। শরীরটা একটু দুর্বল আছে। শরীর ঠিক না হলে, মন ঠিক হবে না।"

"ও কি রাজি হবে?"

"হবে। ওর মনে একটা কুসংস্কার ঢুকে আছে। সে হল, ওর ওই ডোরাকাটা জামা। ওই কুসংস্কারটা কাটাবার জন্যে, ওকে নানা কাজের মধ্যে ফেলে ঘুরপাক খাইয়ে দিতে হবে। একটা লক্ষ্য ওর সামনে রাখতে হবে। সে কাজটা আমি পারব। আমারও তো কেউ কোথাও নেই। ওই বয়েস থেকে আমিও একা। আমি মোটামুটি জানি, কী করলে কী হয়।"

"দেখো চেষ্টা করে। ছেলেটা ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছে। আমরা থাকতে ভেসে না যায়!"

"ওরা বরাত ভাল যে এখানে এসে পড়েছে।"

সবাই শুয়ে পড়ল। একে একে সব আলো নিভে গেল। শুধু জ্বলছে ডক্টর মুখার্জির টেবিলে টেবলল্যাম্প। অনেক চিন্তা। এই জায়গাটা একসময় ছিল কত শান্তির। চারপাশ থেকে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজন এসে কী শুরু করেছে! অতিষ্ঠ করে মেরেছে। রুখে দাঁড়াবার উপায় নেই। দেহের অসুখের অনেক ওষুধ আছে। সমাজের অসুখের একটাই ওষুধ। আদর্শ। সেই ওষুধটাই হারিয়ে গেছে। ছেলে দুটো বড় হচ্ছে, নিজের বয়েস বাড়ছে, কী করা যায়! কিছু গবেষণার কাজ করার ইচ্ছে ছিল, তাও হল না। এখানকার মিশনারি প্রতিষ্ঠানটিও দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছে। আগের উৎসাহ আর নেই।

রাজ্যেশ্বরী ধীরে ধীরে এসে টেবলল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে বললেন, "সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছ, এখন ঘণ্টা দুয়েক অন্তত ঘুমিয়ে নাও। তা না হলে সকালে খুব শরীর খারাপ হবে।"

"কমলবাবুর খবর কী।"

"অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। অদ্ভুত এক মানুষ। আমার রুকু-সুকুর চেয়েও ছেলেমানুষ।"

"আবার ওই নিতুকে দেখো বয়েসের চেয়েও বুড়ো।"

"আহা হবে না কেন, এই বয়েসেই কত ঘা খেয়েছে। আমাদের বাড়িটা দিন দিন যেন আশ্রমের মতো হয়ে উঠছে।"

"তাই হোক। তাই হোক। অন্যের জন্যে বাঁচায় অনেক সুখ।"

মুখার্জিবাড়ির সব আলো একে একে নিভে গেল। শুধু গেটের পাশে কাচের ঘেরাটোপে একটী আলো জ্বলতে লাগল। তার তলায় নেমপ্লেট। আলো-আঁধারিতে বাড়ির নামটা কোনওরকমে পড়া যায়। ইংরেজি নাম 'ফ্লাওয়ার'। তার তলায় ডক্টর মুখার্জির নাম। সেই নির্জন গেটের সামনে উইলিয়ামসনের সেই কুকুরটা এসে বসল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে আপনমনে। অতীতের কথা মনে পড়ছে। বিশাল বাংলো। বড় বড় ঘর। বাগান। বাইরে খানসামাদের থাকার কোয়ার্টার। রসুইখানা। কাটলেট ভাজার গন্ধ। বসার ঘরে ফায়ার প্লেস। কার্পেট। সোফা। আলোর ঝাড়। ডিনার টেবিল। দেওয়ালে বাঘের মাথা। হরিণের মাথা। দুটো বন্দুক। টুপি, কোট, ছড়ি রাখার স্ট্যান্ড। বড়দিনে সারারাত বল-নাচ। কুকুরটার সব মনে পড়ছে, চোখে জল এসে যাচ্ছে।

উইলিয়ামসন সাহেব প্রথম যেদিন তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, তার তিনদিন পরেই বড়দিন। সে তখন এতটুকু বাচ্চা। মুখে দুধ-দুধ গন্ধ। তখনও সব দাঁত বেরোয়নি। মাংসের হাড় চিবোতে পারে না। সাহেবের কোল থেকে সোজা মেমের কোলে। মেমসাহেবকে কী সুন্দর দেখতে ছিল। কী মিষ্টি গলা। তাঁর আবার ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে ছিল। মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার নাম রাখলেন, 'গোলা'। বেশ সুন্দর একটা বাক্সে তার জন্যে নরম বিছানা পেতে দিয়েছিলেন নিজের হাতে। তবু রাতে তার খুব শীত করছিল। সে কুঁইকুঁই করে কাঁদতেই মেমসাহেব বিছানা থেকে নেমে এলেন। পাশে বসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'গোলা, তোমার কী হয়েছে? শীত করছে?'

সে তার ভাষায় বলেছিল, 'হ্যাঁ আমার খুব শীত করছে। আমি আমার মায়ের কাছে যাব।'

মেমসাহেব তাকে বুকে তুলে নিতে নিতে বলেছিলেন, 'তুমি আজ থেকে আমার কোলের কাছে শোবে।'

তারপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। রোজ সকালে সে চুকচুক করে এক বাটি দুধ খেত। দুধ খেয়ে বারান্দার রোদে ঘুমিয়ে পড়ত। রোদ যখন খুব চড়ে উঠত তখন বাগান থেকে মেমসাহেব চিৎকার করে ডাকতেন, 'গোলা, গোলা, কাম হিয়ার।'

সে তখন ধড়মড় করে উঠে বাগানে ছুটত। সবুজ সবুজ ঘাসের ওপর বাগান-চেয়ারে মেমসাহেব বসে আছেন। সুন্দর নীল রঙের ফুল ফুল ছাপ

গাউন। কোলের ওপর উলের গোলা। দু'হাতে দুটো কাঁটা কুটকুট ঘুরছে। মেমসাহেবের মেয়ে চারপাশে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা সাদা বল মাঝে মাঝে ছুড়ে দিচ্ছে। আর সে খেলার লোভ সামলাতে না পেরে ছুটছে। সে যখন আর একটু বড় হল, তখন বলটা যেখানেই গিয়ে পড়ুক সে মুখে করে তুলে নিয়ে আসত। এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করতে করতে সে হাঁপিয়ে পড়ত। তার ভীষণ খিদে পেত। তখন বাগান থেকে উঠে গিয়ে তারা সবাই খেতে বসত। খাবার জন্যে তার একটা সুন্দর বাটি ছিল। সেই বাটিতে থাকত হলদে রঙের ভাত আর বড় বড় মাংসের টুকরো। মোটা মোটা হাড়।

সাহেব রোজ সকালে তাকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যেতেন। যেতে যেতে কত গল্প বলতেন। সাহেব মাঝে মাঝে শিকারে যেতেন। এক কাঁধে বন্দুক আর এক কাঁধে একটা ব্যাগ। তখন সে বেশ বড় হয়ে গেছে। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সব বুঝতে শিখেছে। তার গম্ভীর গলার শব্দে মানুষ ভয় পেতে শুরু করেছে। সে আর রাতে বাক্স-বিছানায় শুতে পারে না। শরীর ধরে না। মেমসাহেবের বিছানাতেও শোয় না। সারারাত বাংলো পাহারা দেয়। আর মাঝে মাঝে সামনের দুটো থাবায় মুখ রেখে ঘুমিয়ে নেয় একটু। সাহেব, মেমসাহেব, মেমসাহেবের মেয়ে সবাই তাকে ভালবাসে। সকলেই বলে, গোলার মতো কুকুর হয় না। রোজ রাতে সাহেব তার গায়ে পাউডার দিয়ে দেন, বুরুশ করে দেন। মেমসাহেব কখনও বাইরে বেড়াতে চলে গেলে সে রাগে, দুঃখে, অভিমানে খাওয়া বন্ধ করে দিত। তাই দেখে সাহেব মেমকে বলতেন, এবার থেকে তুমি যেখানে যাবে গোলাকে নিয়ে যাবে, তা না হলে ও না খেয়ে মারা যাবে।

একে একে সব আলো নিভে গিয়ে যেমন বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়, সেইরকম সাহেবের বাংলোর একটি একটি করে আলো নিভতে লাগল। সাহেবের ফুটফুটে সেই পরির মতো মেয়ে একদিন স্কুল থেকে ফিরে এল জ্বর নিয়ে। কাঁপতে কাঁপতে। সে কাউকে বলেনি যে, পুরনো টিনের কৌটোয় তার আগের দিন হাত কেটে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, ম্যালেরিয়া। ওই ডাক্তারবাবুকে তার মোটেও পছন্দ হয়নি। চেহারাটাই যেন কেমন। ময়লা কোট-প্যান্ট। মানুষের গা দিয়ে এক-একজনের এক-একরকম গন্ধ বেরোয়, সেই গন্ধে সে লোক চিনতে পারে। ডাক্তারকে সে দেখেই ভীষণ জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। একবার মাত্র। ডেকে উঠেই তার মনে হয়েছিল উচিত কাজ হয়নি। কিন্তু ডাকটা সে অনেক চেষ্টা করেও চাপতে পারেনি। সে ডেকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, লোকটা ভাল না। ডাক্তারি জানে না। লোভী, বোকা, অসৎ। মেয়ের অসুখ, তাই সাহেব মেম দু'জনের মনই খুব খারাপ। মেমসাহেব

তাকে ধমকে বলেছিলেন, 'গোলা, গোলা, ডোন্ট শাউট।' তারও যে ভীষণ মন খারাপ সে-কথা কেউ বোঝেনি। তারও যে চোখ দিয়ে জল ঝরছিল, সেই জল কেউ দেখেনি।

মেয়েটির মাথার সামনে সারা রাত সে জেগে বসে ছিল। মানুষ দেখতে পায়নি, সে কুকুর, তাই অনেক আগেই দেখেছিল মৃত্যু আসছে। মৃত্যুকে তো আর ঘেউ ঘেউ করে তাড়ানো যায় না। সে এসে ফায়ার প্লেসের কাছে একটা খালি সোফায় গালে হাত রেখে বসেছিল। কেউ দেখতে পায়নি, সে দেখেছিল, তার হাতে একটা গোল গোল পাথরের মালা ছিল। সে একটা-একটা করে পাথর গুনছিল। খুব ধীরে, খুব ধীরে।

শেষ রাতের দিকে মেয়েটির শরীর টানটান হয়ে গেল। তখন সাহেব ছুটে গিয়ে আর এক ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি এই বাড়ির ডাক্তারবাবু। তার সব মনে আছে। ডাক্তারবাবু এসে ভীষণ রাগারাগি করে বললেন, "আর কোনও উপায় নেই। টিটেনাস হয়ে গেছে।"

ভোরবেলা মেয়েটি মারা গেল। সে কেঁদেছিল। তিনদিন না খেয়ে খাটের তলায় পড়ে ছিল। কেউ লক্ষ করেনি। তার মনে আছে, সুন্দর ফ্রক পরিয়ে, মেয়েটিকে সুন্দর একটি কফিনে শুইয়ে এই বাংলোরই বাগানে কবর দেওয়া হল। সে মেমসাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। খানসামা ইশাক তার সহকারী বাবুলালকে বলছিল, 'দেখ, দেখ, সাহেবের কুকুরটা কীরকম কাঁদছে।'

সেই কবরের ধারে ধারে ফুলগাছ বড় হল। সেই ঘাসে-ঢাকা লন, বড় বড় ঘর, বারান্দায় কেউ আর ছুটে ছুটে বেড়ায় না। আমি কুকুর, মানুষের কিছু জানি না। তবে চোখের সামনে দেখলুম, মেয়েটি চলে যাবার পর, সাহেবের আর কিছু রইল না। একে একে সবই চলে গেল। মেমসাহেবের শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে, একদিন তিনি দেশে চলে গেলেন। সাহেব আর সে। সাহেবও কেমন যেন হয়ে গেলেন। সারারাত জেগে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে তাকে বলতেন, 'গোলা, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। গো টু স্লিপ।' ইজিচেয়ারে বসে সাহেব শুধু বইয়ের পর বই পড়ে যেতেন। আর মোটা মোটা চুরুট খেতেন। শেষ রাতে ঘরে ধোঁয়ার কুয়াশা তৈরি হত। আলো হলদে হয়ে যেত।

একদিন সকালে সাহেব প্রচুর মাংস খাওয়ালেন। গলা জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। তখন বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী। ঠিক সন্ধেবেলা সে দুম করে একটা বন্দুকের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। তারপর! সে ছুটে গেল ভেতরের বারান্দায়। সেখানে সাহেব মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে আছেন। পাশে একটা রিভলভার। খানসামা ইশাক মিঞা, তার বউ, ছোট ছেলে সব ছুটে এল। ইশাক মিঞা পাশে বসে মাথা চাপড়াতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'এ আপনি কী করলেন

সাহেব! আমরা তো সবাই ছিলুম আপনার পাশে।' আমি কুকুর, মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি না; কিন্তু মানুষের কথা সব বুঝতে পারি। আমিও মনে মনে বলেছিলুম, 'সাহেব, মানুষ না থাক, আমি তো ছিলুম।'

দেখতে দেখতে কত লোক এসে গেল। চার্চের ফাদাররা এলেন। তাঁরা বললেন, "কাওয়ার্ড।" তারপর মেয়ের কবরের পাশে সাহেবের কবর তৈরি হল। সেই কবরের পাশে কেউ আর রইল না। রইল শুধু ফুলগাছ, আর রইল সে। সব শেষ হয়ে গেল।

উইলিয়ামসন সাহেবের কুকুর তার জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোথায় কোন পেটা-ঘড়িতে তিনটে বাজল। বুকের কাছে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ কষ্ট। একবার ওঠার চেষ্টা করল। খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। পা কাঁপছে। আবার শুয়ে পড়ল। দম আটকে আসছে। সত্যিই দম বন্ধ হয়ে গেল। কে যেন মিষ্টি গলায় বললে, "গোলা, গোলা, চলে আয়। আবার আমরা নতুন জায়গায়, নতুন করে শুরু করব।"

খুব ভোরে সুকু উঠে দেখলে, গেটের কাছে উইলিয়ামসন সাহেবের কুকুর ঘুমিয়ে পড়েছে, যে ঘুম আর কোনওদিন ভাঙবে না। মুখে লেগে আছে মিষ্টি একটা হাসি।

॥ ৩৩ ॥

ফার্স্ট অফিসার সেকেন্ড অফিসারের কথায় হাবিলদারদের হয়তো ক্ষমা করে দিয়ে ধোবিটোলার দিকেই মার্চ করে এগিয়ে যেতেন, হঠাৎ তাঁর নজর চলে গেল একজনের কোমরের দিকে। সর্বনাশ! বেল্ট নেই। তখন সকলের কোমরের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকটা কোমর বেল্ট-শূন্য।

আকাশের দিকে তাকালেন। আলো ফুটছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। গুরু ভগবানদাস বলেছেন, যেখানে, যে অবস্থাই থাকো, এইসময় স্নান করে রামচন্দ্রজিকে স্মরণ করবে। তাঁর নামগান করবে। কোথায় নদী! অনেক দূরে। জঙ্গল ফুঁড়ে যেতে হবে, কমপক্ষে এক ক্রোশ। মনে মনে বললেন, 'রামচন্দ্রজি, আজও হল না।' তারপর বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ব্যাটন ঠুকে অ্যায়সা এক চিৎকার ছাড়লেন, "বেল্ট কাঁহা?" ফটফট করে গোটাচারেক ভোরের পাখি ভয়ে বাসা ছেড়ে উড়ে গেল। গিয়ে যে যার এক-একটা ডালে বসে পড়ল। একটা পাখি আবার ঘুমভাঙা চোখে ডাল থেকে মাথা ঝুলিয়ে গুলিগুলি চোখে তাকাচ্ছে, আর ভাবছে বিদঘুটে লোকটা কে?

"বেল্টুল কাঁহা গইল বা?" ফার্স্ট অফিসার আর একবার বজ্র হুংকার ছাড়লেন। আরও চারটে পাখি ফটফট করে বাসা ছেড়ে উড়ে গেল। একটা দাঁড়কাক খাঁখাঁ দুপুরে যেরকম ক-ক করে ডাকে, সেইভাবে অসময়ে ডেকে উঠল।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "বাবা রে! প্রাণীজগতে আপনি একেবারে আলোড়ন তুলে দিলেন।" ফার্স্ট অফিসার বললেন, "আপনি বহুদিনের পুলিশ অফিসার, আপনার জানা উচিত, অন ডিউটি কোমরে বেল্ট না থাকা সাংঘাতিক এক অপরাধ। আর্মি হলে এতক্ষণে সব ক'টাকে গুলি করে শুইয়ে দেওয়া হত।"

হাবিলদারদের দিকে তাকিয়ে আবার তিনি হুংকার ছাড়লেন, "বেল্ট কাঁহা?"

সবাই তখন নিজেদের কোমরের দিকে তাকাচ্ছে।

ফার্স্ট অফিসার ব্যঙ্গ করে বললেন, "ওখানে ফুটবলের মতো সব একটা করে ভুঁড়ি আছে। বেল্ট নেই। বেল্ট কাঁহা?"

ওরই মধ্যে একজন সাহসী বললে, "উঁহাঁ।" সে ঝোপটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। এতক্ষণ সব ঘুমিয়ে ছিল। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের ওপর। কিছুক্ষণ পরেই সব বেরিয়ে এল কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "সেকেন্ড, আর তো এদের ক্ষমা করা যায় না। হেভি একটা পানিশমেন্ট দিতেই হচ্ছে। ভেরি হেভি। কী সেটা? পানিশমেন্টের ব্যাপারে আপনি তো এক্সপার্ট।"

"আপনি তো এতকাল আমাকে তুমি বলে এসেছেন, হঠাৎ আবার আপনিতে ফিরে গেলেন?"

"সকাল সাতটা পর্যন্ত আমি আপনি বলি। আমার নিয়ম। ওসব তুচ্ছ জিনিস ছেড়ে শাস্তিটা কী হবে বলুন?"

"দু'কাপ চা!"

"তার মানে?"

"ওরা যেখান থেকে পারে, যেভাবে পারে আমাদের দু'জনের জন্যে ফার্স্টক্লাস দু'কাপ চা নিয়ে আসুক। নো মারসি। নো ক্ষমা।"

"হাত মেলাও ঈশ্বর দাস। তোমার কোনও তুলনা নেই।"

"কিন্তু আমার নাম তো ঈশ্বর দাস নয়!"

"সকাল সাতটা পর্যন্ত আমরা সকলে ঈশ্বরের দাস। অস্বীকার করতে পারো?"

"উঃ, এই সময়টা তো খুব সাংঘাতিক। যাক।"

সেকেন্ড অফিসার হাবিলদারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুরন্ত যাও, তুরন্ত আও, দু'কাপ চা লেকে আও।" হাবিলদাররা সব, ঘাস-বিচালি ঘাস-বিচালি করতে করতে ছুটল। কোথায় চা পাবে তারাই জানে। চা তো আর অপরাধী নয় যে, কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসবে, ওরা সব দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতেই সেকেন্ড অফিসার, ফার্স্ট অফিসারকে বললেন, "একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়েছিলেন সার।"

"কেন? কেন?"

"আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার বেল্ট কোথায়?'

"আমার বেল্ট আমার কোমরে।"

সেকেন্ড অফিসার গান গেয়ে বললেন, "শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।"

"স্ট্রেঞ্জ! হোয়্যার ইজ মাই বেল্ট?"

"ইয়োর বেল্ট ইজ ইন দি ডিপ জাঙ্গল সার। ডাংলিং ফ্রম দি ব্র্যাঞ্চ অফ এ ট্রি। পেড় সে ঝুলতা হ্যায়। প্রেমসে ঝুলতি হ্যায়। মনে পড়ে! একটা কাঠপিঁপড়ে ইন বিটুইন ইয়োর কোমর অ্যান্ড বেল্ট এনট্রি নিয়েছিল। আপনি বললেন, ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড। বলে, বেল্টটা খুলে গাছের ডালে ঝোলালেন। তারপর। তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা। এইরকম ভুলো মন নিয়ে আপনি ক্রিমিনালদের সঙ্গে লড়বেন?''

"তুমি কী করছিলে?"

"আমিও তো ভুলে গেছি। হোয়্যার ইজ মাই টোপি?"

"তোমার টুপি?"

"ইয়েস, ডিপ ইন দি জাঙ্গল। মনে পড়ছে? ইন বিটুইন টুপি অ্যান্ড মাই হেড এ স্মল মাকড়সা এন্টার্ড।"

"আমরা, তার মানে, বেল্টলেস অ্যান্ড ক্যাপলেস!"

"ট্রুথ ইজ় ট্রুথ। সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল।"

"আমরা তা হলে কী করব?"

"ভেরি সিম্পল! আমরা সব খুলে ফেলব।"

"সব খুলে ফেলব?"

"ইয়েস সার। শুধু শর্টস আর ভেস্ট।"

"আমরা কি সমুদ্রের ধারে ছুটি কাটাতে এসেছি? তোমার মাথাটা গেছে। নিজেও সেকেন্ড, মাথাটাও সেকেন্ড হ্যান্ড।"

''আমার মাথাটা মাথাতেই আছে। ভেরি মাচ অন দি হেড। প্লেন ক্লোদস পুলিশম্যান শুনেছেন? শুনেছেন কি না? হ্যাঁ, কি না?"

"হ্যাঁ"

"আমরা বিশেষ কারণে সেই সাদা পোশাকের পুলিশ। কেমন?"

"কারণটা কী?"

"কারণ, আমরা এখন এমন একজনকে ধরতে চলেছি, যে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। যে আপনাকে ন্যাজে খেলাচ্ছে।"

"একা, আমাকে! হোয়াই নট ইউ? তুমি বাদ চলে যাচ্ছ কেন ঠাকুর?"

"আমাকে একমাত্র খেলাতে পারেন আপনি; কারণ আপনিই আমার সব। আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমার ঈশ্বর।"

"যা, এতদিনে বুঝেছ। বেটার লেট দ্যান নেভার। শুনে খুব ভাল লাগল। পাঁচ মিনিট পরে আবার নিজ মূর্তি ধারণ কোরো না যেন! তোমার আবার সেই রোগটা খুব আছে।"

"যতদিন না প্রোমোশান হচ্ছে, ততদিন আমার এই মূর্তি দেখবেন, তারপর আমি যখন আপনি হব, তখন আমি আপনি হব।"

"বাবা! এ যে দেখি বাইবেল হয়ে গেল। সেইরকম বাংলা।"

"ইংরাজিতে অনুবাদ করব?"

"থাক, এখন থাক। দেখছ আমরা এখন বিশ্রী একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছি। হ্যাঁ, কী যেন হচ্ছিল! আমাকে ন্যাজে খেলাচ্ছে। বেশ খেলাক। তাতে তোমার কী?"

"অ্যায়, এইবার আপনি নিজ মূর্তি ধারণ করে ফেলুন। যা আপনার চিরকালের রোগ। আমার সাহায্য চাই না তো?"

"আমাকে সাহায্য করাটাই তোমার ডিউটি। না করলে প্রমোশান? ডিমোশান। অফিসার থেকে হাবিলদার।"

"তা হলে আপনাকে আর একটা সুখবর দিই। শুধু বেল্ট নয়, আপনার রিভলভারটাও বেল্টের সঙ্গে গেছে। সে খেয়ালটা কি আছে?"

ফার্স্ট অফিসার ধপ করে একটা পাথরে বসে পড়লেন। বেল্টের বদলে বেল্ট পাওয়া যাবে। সার্ভিস রিভলভার চোর ছ্যাঁচোড়ের হাতে পড়লে, পড়লেই তো হয়ে গেল। লোডেড রিভলভার। ছ'টা চেম্বারে ছ'টা গুলি ভরা। ফার্স্ট অফিসারের মাথায় হাত। চলে না, এসব চলে না। এ-কাজ ধাতে সয় না। ছেলেবেলায় ইচ্ছে ছিল কবি হবার। কোথায় কবিতা! হয়ে গেলেন পুলিশ-অফিসার। কোনও মানে হয়! ভাগ্য একটা থার্ড ক্লাস জিনিস!

সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললেন, "তুমি আমাকে কীভাবে বাঁচাতে পারো?"

"আমি একটা সাইকেল চেপে এস পি-র অফিসে সোজা গিয়ে বলতে

পারি, 'সার, ফার্স্ট অফিসারের রিভলভার আর বেল্ট আর গুলি হারিয়ে গেছে, স্পেশাল ফোর্স দিন খুঁজতে হবে।' তারপর কী হয় দেখা যাক। আগে তো এইরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি।"

"তার মানে তুমি আমাকে শেষ করে দিতে চাও? ওরে, এই ছিল তোর মনে?"

ফার্স্ট অফিসার কাত হয়ে পড়ে যাবার মতো হলেন। আর ঠিক সেইসময় দেখা গেল, বিশটা হাবিলদার দূর থেকে মার্চ করতে করতে আসছে। ডবল মার্চ। আর তাদের পেছন পেছন তিনজন গুড়গুড়ে লোক নেচে নেচে আসছে। একজনের মাথায় তোলা উনুন, আর একজনের মাথায় একটা ঝুড়ি। সেই ঝুড়িতে অ্যালুমিনিয়মের কেটলি, কাপ-ডিশ, চা-চিনি, বিস্কুট, তোয়ালে, খাবার জলের পট। আর-একজনের বুকে একটা সাইনবোর্ড। বোর্ডে লেখা মহাবীর টি স্টল।

হেড হাবিলদার খটাস করে জুতো ঠুকে স্যালুট করে বললে, "পুরো টি স্টলটাকে তুলে এনেছি সার।"

"তুমি কি একশো জন্ম আগে হনুমান ছিলে যে, বিশল্যকরণীর বদলে গন্ধমাদন তুলে আনলে?" সেকেন্ড অফিসার বললেন, কারণ ফার্স্ট অফিসার কাত হয়ে আছেন, কথা বলতে পারছেন না।

হাবিলদার বললে, "আমার সার ভীষণ বুদ্ধি। আমার বাবার পয়সা থাকলে কলেজে পড়তুম। পড়লে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতুম।"

ফার্স্ট অফিসার ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "মুন্ডু হতে!"

এদিকে কথা চলেছে, ওদিকে তখন সেই তিনটে গুড়গুড়ে লোক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একজন সাইনবোর্ডটা গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর একজন উনুনে আগুন দিয়েছে। ভসভস ধোঁয়া। আর একজন গাছতলায় একটা তোয়ালে পেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে ফেলেছে। গুড়গুড়ে তিনজনের মধ্যে যে সবচেয়ে মোটা, সে এগিয়ে এসে বললে, "নমস্কার বড় সার, মেজ সার, হাবিলদার প্রভু। ডিম হাফ বয়েল, পোচ না মামলেট?"

প্রশ্ন করার সময় মুখটা হাসিহাসি করেছিল। হাসিটা গুটিয়ে নিতে ভুলে গেছে। সামনের সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে আছে চিরুনির মতো। সেকেন্ড অফিসার বললেন, "ডিম! ডিমের ব্যবস্থাও আছে? বলো কী। তা কোনটার কী দাম?"

"সে সব পরে হবে।"

"অ, বুঝতে পেরেছি।" ফার্স্ট অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী খাবেন সার?"

"ডবল ডিমের মামলেট। পেঁয়াজ আর কুচো কুচো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে।"

"সাত সকালেই পেঁয়াজ সার?"

"হ্যাঁ, সার। খাব তো আমি, তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে?"

সেকেন্ড অফিসার হেসে বললেন, "পরে বুঝবেন।"

হেড হাবিলদার তখনও স্যালুট করে দাঁড়িয়ে আছে। ফার্স্ট অফিসার দেখে বললেন, "এ আবার কী।"

হাবিলদার বললে, "স্যালুট আটকে আছে সার।"

"কপালে আঠা আছে বুঝি?"

"না, সার, আপনি এখনও স্যালুট রিটার্ন করেননি সার। যা নিয়ম, রিটার্ন না পেলে যাই কী করে!"

ফার্স্ট অফিসার কপালে হাত ঠেকালেন। হাবিলদার খটাস করে জুতোর শব্দ তুলে হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, "আমার বুদ্ধিটা শুনবেন সার। অত দূর থেকে দু'কাপ চা নিয়ে মার্চ করে এলে শুধু কাপ দুটোই এসে পৌঁছোত। তাই দোকানটাই তুলে নিয়ে এলুম। ঠিক করিনি?"

"আমি তোমাদের বাবা। ঠিক কি না?"

ফার্স্ট অফিসারের অদ্ভুত কথা শুনে হাবিলদার থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। অতি সত্যি কথা। আপনার দয়াতেই তো বেঁচে আছি।"

"দয়া নয় বাবা, দয়া নয়, বলো স্নেহ। এখন যাও তো বাবা, সবাই মিলে জঙ্গলে যাও। লক্ষ্মী ছেলে, আমার সোনা ছেলেরা সব। জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে বের করো তো, কোন গাছের কোন ডালে আমার বেল্ট আর রিভলভার ঝুলছে। ততক্ষণ আমরা একটু নাস্তা করি। মিনিট পনেরো ঘাসের ওপর একটু গড়িয়ে নিই।"

হেড হাবিলদারের মুখের চেহারা পালটে গেল। দারুণ ছবি। মাথা চুলকে বললে, "আমরা কিছু খাব না সার? এত কষ্ট করে দোকানটা তুলে আনলুম!"

"ছিঃ, পরের জিনিসে লোভ করতে নেই বাবা। তোমরা আমার সন্তান। আমার ছেলেরা লোভী হতে পারে! জঙ্গলে যাচ্ছ। অনেক ফল পাবে। কিছু না পাও বেল পাবে। একটা করে বেল খেয়ে নিয়ো। সকালে ফল খেলে ফল ভাল হয়। যাও, যাও, আনন্দে নেচে নেচে যাও।"

॥ ৩৪ ॥

হাবিলদাররা নিজেদের মধ্যে গজগজ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকল। "কোথা থেকে দুটো পাগল অফিসার এল এই জেলায়। আগে মুঙ্গেরে ছিল, বেশ ছিল। এই সকালে আবার যাও জঙ্গলে।"

মহাবীর টি-স্টলের তিন গুড়গুড়ে ডিমের ওমলেট ভাজছে। সেই সুন্দর গন্ধ হাবিলদারদের পেছনে পেছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকছে। সারারাত উপোস। জিভে জল এসে যাচ্ছে। একজন বললে, "চাকরি ছেড়ে দেব।" আর-একজন বললে, "খাবি কী?" সে বললে, "ধার করব।" আর-একজন বললে, "শুধবি কীসে?" সে বললে, "লবডঙ্কা।" আর-একজন বললে, "কোমড়ে দড়ি। আবার সেই ফাঁড়ি। আবার ওই দুই পাগল।"

সব মনের দুঃখে বকবক করতে করতে, পাতার ওপর জুতোর মচমচ শব্দ তুলে সেই হাবিলদারের বিশাল দল ক্রমশই গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। ওদিকে তিন গুড়গুড়ে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা দুই অফিসারকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, ডবল ডিমের ওমলেট, থাক থাক টোস্ট, ভুরভুরে গন্ধঅলা চা, একটা বেশ বড় পাথরকে টেবিল মতো করে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে। একজন গুড়গুড়ে দু'জনের সামনে এসে হাতজোড় করে বলছে, "আসুন সার, আসুন সার। খানা তৈয়ার।"

আর ঠিক সেইসময় রিভলভারের আওয়াজ। একটা গুলি গুড়গুড়ের কান ঘেঁষে চলে গেল। সে ভয়ে তিরবেগে দৌড়োতে শুরু করেছে। আর-একটা গুলি। আবার একটা গুলি। পাথরের ওপর রাখা জলের পাত্রটা ছিটকে চলে গেল। ফার্স্ট আর সেকেন্ড অফিসার ট্রেনিং অনুসারে মাটিতে ফ্ল্যাট। তিনটে গুড়গুড়ে পড়ি কি মরি করে তিনদিকে ছুটেছে। তোলা উনুনে গুলি লেগে ফেটে চৌচির হয়ে চারপাশে আগুন ছড়িয়ে টুকরো টুকরো। বাতাসে আগুনের ফুলকি উড়ছে।

অনেকক্ষণ আর গোলাগুলির আওয়াজ নেই। অফিসার দু'জন ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিকে তাকালেন। কেউ কোথাও নেই। ফার্স্ট অফিসার বললেন, "গোরিলা অ্যাটাক। আমরা খুব শক্ত শত্রুর পাল্লায় পড়েছি। ঝট করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে পোড়ো না। একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবে। ক্রল! হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলো ওই মোটা শিশুগাছটার আড়ালে। কুইক। তাড়াতাড়ি! তোমার আবার দেহের চেয়ে ভুঁড়িটা হয়ে গেছে মস্ত বড়।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "ওমলেট, টোস্ট আর চা ঠান্ডা হয়ে গেল সার।"

"তুমি এখনও খাওয়ার কথা ভাবছ। এক্ষুনি গুলি খেয়ে মরছিলে।"

দু'জনে শিশুগাছের আড়ালে গিয়ে দু'পাশে উঠে দাঁড়ালেন। একজন এদিকে তাকাচ্ছেন। একজন ওদিকে। কোথায় কী! যতদূর দৃষ্টি যায়, কিছুই নেই। চড়া রোদে চারপাশ ঝলমল করছে। হঠাৎ সেকেন্ড অফিসারের নজরে পড়ল, "ওই দেখুন সার। গাছের ডালে।"

কিছু দূরের গাছের একটা ডাল থেকে লম্বামতো কী একটা ঝুলছে।

ফার্স্ট অফিসার ভাল করে দেখে বললেন, "সর্বনাশ, ওই তো আমার বেল্ট?"

সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড অফিসার বললেন, "সর্বনাশ, ওই দেখুন সার।"

সার দেখলেন, একটা বীর হনুমান, সারের রিভলভারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বেল্টের খাপ থেকে কীভাবে বোতাম খুলে বের করে এনেছে। গুলি ওই হনুমানই ছুড়েছে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "ব্যাটা হনুমান।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "ছিঃ সার, অমন বলতে নেই। বলুন মহাবীর জি কি জয়।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন; "এখন কী হবে?"

"কী আবার হবে। আমাদের আর কিছু করার নেই। এখন ফায়ার ব্রিগেডের হাতে।"

"কেন? ফায়ার ব্রিগেডের হাতে কেন?"

"গাছের ডালে, ব্রিজের মাথায় কেউ উঠে পড়লে, আগুন লাগলে, উঁচু বাড়ির উঁচু তলা থেকে বন্দি কাউকে নামিয়ে আনার পবিত্র কর্তব্য ফায়ার সার্ভিসের। আপনি ডিরেক্টরকে ফোন করুন।"

ফার্স্ট অফিসার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, "ফোন করুন। এখানে ফোন কোথায়? বোকার মতো কথা বলো বলে মাথায় খুন চেপে যায়। ওই বেল্ট আর রিভলভারটা তোমার হলে, তুমি এইরকম দায়িত্বহীন কথা বলতে পারতে! যাও কলা নিয়ে এসো।"

"কলা! কলা কোথায় পাব সার।"

"তা তো জানি না সার! অর্ডার ইজ অর্ডার। আই ওয়ান্ট কলা। যাও, একছড়া কলা নিয়ে এসো।"

"ওমলেট আর টোস্টে হবে না সার। এখন আবার এই দুর্যোগে, এই সংকটকালে কলার বায়না ধরলেন!"

"হ্যাঁ, ধরলাম। কলা আমি খাব না। কলার লোভ দেখিয়ে হনুমানটাকে নামাতে হবে। কলা নাও, রিভলভার দাও। বুঝলে মাথামোটা!"

"অ, এই ব্যাপার। তা আমি টোস্ট আর ওমলেট দেখিয়ে নামিয়ে আনছি।"

"আবার ভুল করছ। মহাবীর ভেজিটারিয়ান। মহাবীরের ধর্ম, অভ্যাস, আচার-আচরণ, সবই ভুলে বসে আছ।"

"মহাবীর ফুডহ্যাবিট চেঞ্জ করেছেন।"

"কে বলেছে? রাম রাজত্বের পর থেকে সবই পালটেছে একমাত্র ঠিক আছেন আমাদের মহাবীর। জানো তো আমি জন্মেছিলাম কাশীতে।"

"তাই তো আপনি বিশ্বনাথ।"

"থাক অয়েলিং-এর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বনাথ নই ভোলানাথ, তা না হলে কোমর থেকে বেল্ট খুলতে ভুলে যাই। বেল্ট একটা ভাইটাল জিনিস। সেই কাশীতে, তুমি বড় বিরক্ত করো, দেখছ অতীতের একটা স্টোরি বলছি, কোথায় কানখাড়া করে শুনবে। পরে যখন আমার জীবনী লেখা হবে তখন তো সবাই তোমার কাছেই আসবে, আমার সম্পর্কে নানা খবর নিতে। বইয়ের শুরুতে তোমার নামে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। যা করবে ভবিষ্যৎ ভেবে করবে। আমার মতো তোমার ভবিষ্যৎ হয়তো তেমন উজ্জ্বল হবে না, তবু আমি সূর্য তুমি চন্দ্র। আমার আলোয় তুমি আলোকিত হবে।"

"আপনি মশাই কে যে, আপনার জীবনী লেখা হবে?"

"আমি যেই-ই হই, একদিন দেখবে। আমি পদ্মভূষণ উপাধি পাব, আর তখনই কাগজে কাগজে আমার ইন্টারভিউ ছাপা হবে। পত্র-পত্রিকায় আমাকে নিয়ে কভার স্টোরি হবে। চারদিকে একেবারে কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে। তখন তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। সেই কারণেই তোমার জেনে রাখা দরকার, কাশীতে, কাশী আমার বাল্যের লীলাভূমি।"

"আপনি কি শ্রীকৃষ্ণ?"

"সেকেন্ড, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, বড় বড় লোকের সঙ্গে রসিকতা করবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে না। যা বলছি শোনো, মনে রাখো, পরে তোমারই কাজে লাগবে। নিজের ছেলেমেয়েদের আমার জীবনকথা শোনাতে পারবে। তারা অনুপ্রাণিত হবে।"

"আমার ছেলেমেয়ে নেই।"

"আঃ, সবেতেই বাধা। তোমার তা হলে আছেটা কী? শুনি আছেটা কী? কেন ছেলেমেয়ে নেই?"

"কী মুশকিল! আমি যে ব্যাচেলর।"

"ব্যাচেলর!" ফার্স্ট অফিসার রেগে ভেংচি কাটলেন। "ঠিক আছে, ব্যাচেলর তো ব্যাচেলর, তোমার নাতি-নাতনিকে শুনিয়ো। না হয় কিছু বেশিদিন বেঁচে বয়েসটাকে বাড়িয়ে দাদু হয়ে যেয়ো।"

"কথাটা মনে হয় তেমন ভেবে বললেন না, রামের আগে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, ছেলের আগে নাতি হয় কী করে!"

"যাক কাউকে শোনাতে হবে না, তুমি নিজে শুনে রাখো। আমার তখন এক মাস বয়েস, বারান্দায় শুয়ে আছি; হঠাৎ একটা বাঁদর এসে, কোলে তুলে নিয়ে

সোজা গিয়ে উঠল একটা আমগাছের ডালে। আঃ, কী ঠান্ডা। আমপাতার অপূর্ব গন্ধ। নাকের কাছে পাকা ল্যাংড়া আম দুলছে। বাঁদরের কোলে আমি চিত হয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়ছি। কত উঁচু জানো! নীচের দিকে তাকালে মাথা একেবারে ঘুরে যায়। তারপর ছাদে উঠে মা একছড়া কলা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। আয় বাবা নিয়ে যা, ছেলে আমার দিয়ে যা। শেষে একেবারে হিন্দি ছবি। শ'খানেক মেয়ে একসঙ্গে এক সুরে গাইছে, আয় বাবা নিয়ে যা, ছেলে আমার দিয়ে যা। আমি গান শুনছি আর চুকচুক করে পাকা ল্যাংড়া আম খাচ্ছি। গাছের ডালে, বাঁদরের কোলে, পাকা ল্যাংড়া খাবার অভিজ্ঞতা ক'জনের হয়।"

"একটা প্রশ্ন সার। এক মাসের ছেলের এতসব মনে থাকে! এতসব মনে হয়। আমার বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে সার।"

"কোনও অসুবিধে নেই সার। যত বয়েস বাড়ে ততই মানুষের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। বোকা কোথাকার! কিচ্ছু জানে না।"

হঠাৎ সেকেন্ড অফিসার 'গেল, গেল', শব্দে পড়ি-কি-মরি করে ছুটলেন। ফার্স্ট অফিসার স্বগতোক্তি করলেন, 'পড়ে মরবে রে! পড়ে মরবে।" সেকেন্ড অফিসার চিৎকার করছেন, "যাঃ, সব খেয়ে গেল। যাঃ, সব খেয়ে গেল।"

হনুমানটা গাছের ডাল থেকে নেমে বেশ ভারিক্কি চালে বসেছে পাথরটার সামনে, আর মনের আনন্দে টোস্ট-অমলেট খেতে শুরু করেছে। কোলের ওপর রিভলভার। রিভলভার-টিভলভার আর মানছে কে! অমন ওমলেট-টোস্ট খেয়ে চলে গেলে সহ্য হয়! যেমন করেই হোক ছিনিয়ে আনতে হবে। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

সেকেন্ড অফিসার কাছাকাছি যেতে মহাবীর রিভলভার তুললেন। ফার্স্ট অফিসার দূর থেকে সাবধান করলেন, "পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো। একটা ওমলেটের জন্যে জীবন দিয়ো না।"

সেকেন্ড অফিসার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হনুমানের রিভলভার বুকের দিকে তাক করা। এগোবার উপায় নেই। পেছোবার উপায় নেই। মনে মনে হিসেব করছেন, হনুমান এর আগে ক'বার ফায়ার করেছে। একবার মনে হচ্ছে পাঁচ, একবার মনে হচ্ছে ছয়। ছ'বার ফায়ার করে থাকলে রিভলভারে আর গুলি নেই। পাঁচবার করে থাকলে, এখনও একটা আছে। শেষ গুলি যা তার বুকে ঢুকবে।

হনুমান এক হাতে রিভলভার উঁচিয়ে আছে, অন্য হাতে অবিরত খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আবার মানুষের মতো চায়ে চুমুক দিচ্ছে। হনুমান যখন তাকাচ্ছে, সেকেন্ড অফিসার তখন হাসবার চেষ্টা করছেন। হেসে যদি হনুমানের মন ভেজাতে পারেন।

হঠাৎ হনুমান তিন লাফে উঠে গেল বিরাট একটা গাছের মগডালে। দুই অফিসার গাছের তলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। অনেক উঁচুতে ঝুলছে বেল্ট। আরও উঁচুতে একটা লেজ। সেই লেজের মালিক হল এখন রিভলভারের মালিক।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "এই মুহূর্তে আমার একছড়া কলা চাই। কলা ছাড়া একে কাবু করা যাবে না।"

"ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন সার। ছ'জোড়া ডিম, দু'পাউন্ড রুটি, এক কেটলি চা খেয়েছে এই সবে। হজম না হলে কলাই দেখান, আর মুলোই দেখান নামবে না।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "জানো, আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, ওটা আসল হনুমান না নকল হনুমান।"

"তার মানে?"

"আরে ওর চাল-চলনটা দেখলে না! অবিকল মানুষের মতো। আমার মনে হচ্ছে মানুষ। হনুমান সেজে আমাদের সঙ্গে ছলনা করছে।"

"মানুষ কেন হনুমান হবে। মাঝে মাঝে এমন বলেন! পাগল ভাববে লোকে।"

"পাগল ভাববে তোমাকে। রামযাত্রায় মানুষ হনুমান সাজে না? সাজে কি না, বলো সাজে কি না?"

সেকেন্ড অফিসার ভীষণ চিৎকার করে বললেন, "সাজে।"

"চেল্লাচ্ছ কেন?"

"রেগে গেছি। সেই লেজের কোয়ালিটি আর এই লেজের কোয়ালিটি এক হল? আসল, নকল চিনবেন লেজ দেখে। যখনই দেখবেন লেজ লতপত করছে, ইচ্ছেমতো লেজ নড়ছে চড়ছে, আছড়াচ্ছে, তখনই বুঝবেন ব্যাটা আসল। এই সামান্য বিচারবোধটা আপনার মতো একজন প্রবীণ অফিসারের কাছ থেকে আমি আশা করেছিলুম।"

"আমি দুঃখিত।"

হঠাৎ গাছের মগডাল নড়ে উঠল। ছ্যাটাস করে ছিটকে পড়ল ফার্স্ট অফিসারের বেল্ট। তিনি ছুটে গিয়ে বেল্টটা তুলে নিলেন। সেকেন্ড অফিসার বললেন, "হনুমান পালাচ্ছে সার।"

"অ্যাঁ, পালাচ্ছে কী গো। আমার রিভলভার! ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে।"

দুই অফিসার ছুটলেন। হনুমান যে-গাছে, ওঁরা দু'জন সেই গাছের তলায়, এমনি করে অনুসরণ করতে করতে দু'জনে কোথায় এলেন, কী করলেন,

কোনও খেয়ালই নেই। শেষে অনেক হনুমানের মধ্যে সেই রিভলভারধারী হনুমান গুলিয়ে গেল।

নদীর ধার। অনেক গাছ। বড় ছোট অজস্র পাথর। আর দঙ্গল দঙ্গল হনুমান। বীর আছে, শিশু আছে। যুবক আছে, বৃদ্ধ আছে। সে যেন এক হনুমানটুলি। প্রথম অফিসার দ্বিতীয়কে বললেন, "এইবার কী হবে। মানুষ হলে মুখ দেখে চেনা যায়, পোশাক দেখে চেনা যায়, সব হনুমানই একরকম। সেই একটা কালো মুখ, ইয়া বড় একটা লেজ। নাও এখন বোঝো ঠ্যালা।"

দু'জনে একটা পাথরে বসলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিভ্রান্ত। কুলকুল করে নদী বইছে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। পরিষ্কার কাচের মতো জল। ওদিকে হনুমান কলোনি। শ'য়ে শয়ে হনুমান হুপহাপ, কিচিরমিচির করছে।

হঠাৎ একটা ফায়ারিং-এর শব্দ। ফার্স্ট অফিসার চমকে উঠে বললেন, "ওই তো, ওই তো...।" আর শোনা গেল না কথা। ঝপাত করে একটা বীর হনুমান জলে পড়ল। সেকেন্ড অফিসার বললেন, "ইস, আত্মহত্যা করল সার?"

ব্যস, আর না। ওই শ'দুয়েক হনুমান একসঙ্গে তেড়ে এল। দৌড়, দৌড়, দৌড়। কোথায় লাগে ওলিম্পিক।

॥ ৩৫ ॥

বড় অফিসার, ছোট অফিসার ঝোপঝাড় ভেঙে, খানাখন্দ টপকে ছুটছেন। ছুটছেন। আর ছুটছেন। দু'জনেরই ভুঁড়ি হয়েছে। যেমন হয় পুলিশে চাকরি করলে। ছুটবেন কী, থলকবলক করে ভুঁড়ি নাচছে। ভেতরটা হাঁসফাঁস করছে। নাক দিয়ে গন্ডারের মতো ঘোঁতঘোঁত নিশ্বাস পড়ছে। পায়ের ধাক্কায় বড়-ছোট পাথর ঢালু বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ করে। একটা পাথরের ধাক্কায় আরও অনেক পাথর খসে পড়ছে। বন্যপ্রাণীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে আর ভাবছে, এই বিশাল প্রাণী দুটো কী! কী জাতের প্রাণী! আগে তো দেখিনি কখনও। সেই কথায় আছে না, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। অফিসার দু'জন ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটছেন, আর হনুমানের দল আসছে ডালে ডালে। সারা জঙ্গলে যেন প্রলয়ের ঝড় বইছে। কে হারে, কে জেতে! পুলিশ হারে, না হনুমান হারে। ভাবা যায় না, অফিসার দু'জন জিতে গেলেন। হনুমানচন্দ্ররা রামের বাহন হয়েও হেরে গেলেন। কারণ দৌড়োতে দৌড়োতে অফিসার দু'জন এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছেন, যে-জায়গাটা একেবারে ফাঁকা, চারপাশে কাছাকাছি কোনও গাছপালা নেই। সামনে একটা গোরস্থান।

পাঁচিল-ঘেরা। ভেতরে সার সার পাথরের ঢিবি। একটা-দুটো যত্নের অভাবে উলটে পড়েছে। সেই গোরস্থানের ভেতর একটা ঢ্যাঙা গাছ খাড়া উঠে মাথার উপর ছাতার শিকের মতো ডালপালা ছড়িয়েছে। গাছটার তেমন পাতাটাতা নেই। এদিকে-ওদিকে গোটাকতক দাঁড়কাক বসে ক, ক-অ করে ডাকছে। বিশ্রী লাগছে। সারারাত ঘুম নেই। খাওয়া নেই। সকালে এক কাপ চা জোটেনি। তার ওপর বেল্টটা যদিও বা পাওয়া গেল, সার্ভিস রিভলভারটা তলিয়ে গেছে বাদার জলে। উদ্ধার করার আশা আছে বলে মনে হয় না।

ক্লান্ত, শ্রান্ত সেই অফিসার দু'জন হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই গোরস্থানে ঢুকে গাছের তলায়, ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসলেন। আর বসার সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড অফিসারের মাথার ব্রহ্মতালুতে ডালে-বসা কাক তার অকৃপণ কর্মটি করে দিল। বেশ গরমাগরম। টাটকা। সেকেন্ড অফিসারের মাথার মাঝখানে টাক। অত উঁচু থেকে পড়েছে তো, চাঁট করে আওয়াজ হল। অফিসার ভয়ে মাথা নিচু করে সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "ছি, ছি! অত সহজে ভেঙে পড়লে চলে। জীবনের কত উত্থান-পতন! জীবন হল তুফানের দরিয়ায় নৌকো। এই উঠবে, এই পড়বে। শক্ত হাতে হাল ধরাটাই হল বেঁচে থাকা। তা না, তুমি হুড়মি খেয়ে পড়ে যাচ্ছ!"

সেকেন্ড অফিসার ওই অবস্থায় থেকেই বললেন, "আমি ভেঙে পড়িনি সার। আমি সামনে ঝুঁকে পড়েছি। আমার টাকটা এগজামিন করুন তো!"

সেকেন্ড অফিসারের টাক উঁকি মেরে দেখেই ফার্স্ট অফিসার, হো-হো করে হেসে উঠলেন, "আরে, আরে, কী বিউটিফুল ডেকরেশান। তোমার টাক পুরো হোয়াইশ ওয়াট হয়ে গেছে। দাঁড় কাক কী জিনিস একবার দেখো!"

সেকেন্ড অফিসার সোজা হয়ে বসে বললেন, "কী বললেন? ইংরেজিটা শুনি! হোয়াইশ ওয়াটটা কী?"

"অ্যাঁ, তুমি তো দেখছি ইংরেজিতে খুব কাঁচা! এই যে রাজমিস্ত্রিরা দেওয়ালে চুন লাগায় না! তার ইংরেজি কী?"

"সে তো হোয়াইট ওয়াশ!"

"হোয়াইট ওয়াশ না হোয়াইশ ওয়াট। ভাল করে ভেবে দেখো।"

"আমার ভাবার কিছু নেই। হোয়াইট মানে সাদা, ওয়াশ মানে ধোওয়া। এর আগেও আপনি একটা উলটো কথা বলেছেন। হুড়মি। হুড়মি না হুমড়ি?"

"শোনো, শোনো, আমি উলটেই বলি আর পালটেই বলি, তোমার কি বুঝতে কোনও অসুবিধে হল? এখন আমার প্রশ্ন, তোমার টাক বেরোল কী করে?"

"আশ্চর্য! চুল কেন পড়ে, আমি কী করে বলব? আমার বাবার টাক ছিল। আমার ঠাকুরদার টাক ছিল, আমার দাদুর টাক ছিল। আমাদের হল গিয়ে টাকের ফ্যামিলি।?"

"আমি তোমার টাকের ইতিহাস শুনতে চাই না। তোমার টুপি কোথায়, টুপি? হোয়ার ইজ ইয়োর সার্ভিস ক্যাপ? মাই ডিয়ার স্যার!"

সেকেন্ড অফিসার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মাঝখানে হাত রেখেই, "অ্যা" করে উঠলেন, "আরে ছিঃ, ছিঃ। কোথায় এখন একটা কাঁচা শালপাতা পাই?"

"শালপাতা পরে হবে। রোদে শুকিয়ে গেলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। তোমার টুপি কোথায়? নাইনটিন সেভেনটিন থ্রি-তে ঘনশ্যাম বড়ুয়ার অশোকস্তম্ভ-লাগানো টুপি ইঁদারার জল দেখতে গিয়ে খুলে শুধু পড়ল না, তুলতে তুলতেই তলিয়ে গেল। ব্যস, ঘনশ্যাম বড়ুয়ার চাকরি নট হয়ে গেল। বলা হয়েছিল, ঠিক আছে ঘনশ্যাম, টুপি গেছে যাক, তুমি অশোকস্তম্ভটা তুলে নিয়ে এসো। তা সেই অশোকস্তম্ভটা তোলার জন্যে ঘনশ্যাম ইঁদারার জলে একবার ডোবে, একবার ওঠে। একবার ডোবে, একবার ওঠে। শেষে, বুকে জল জমে ঘনশ্যাম ভবসাগরের পারে চলে যায়। গেল। টুপি ইজ নট ইমপর্ট্যান্ট, আসল হল স্তম্ভ। স্তম্ভ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।"

এইবার সেকেন্ড অফিসার ভয় পেয়ে গেলেন। হনুমানের তাড়া খেয়ে ছোটার সময় টুপির কথা মনেই ছিল না। ফার্স্ট অফিসারের ডান হাতটা নিজের দু'হাতে ধরে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমরা দু'জনেই এই চাকরির অনুপযুক্ত।"

"অ্যায়, ধরেছ ঠিক। পথে এসো। তুমি কোন পরিবারের ছেলে?"

"আমার বাবা ছিলেন গাইয়ে। উচ্চাঙ্গ সংগীত করতেন।"

"আমার বাবা ছিলেন শিক্ষক। আমার মা ছিলেন সেতার বাজিয়ে। ভাল বুঝতেন রাগ-রাগিণী। তবেই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। আমরা হলুম গিয়ে মানিকজোড়। আমরা এখন বসে আছি কোথায়?"

"প্রাচীন এক গোরস্থানে।"

"এসো, আজ আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিই। আমরা আমাদের মতো জীবিকায় ফিরে যাই। তুমি গলাটলা সেধে গাইয়ে হয়ে যাও, আর আমি একটা সেতার কিনি। দশ বছর পরে কোনও জলসায় তোমাতে-আমাতে আবার দেখা হবে। আমি তোমাকে ভালবাসি প্রকাশ।"

"আমিও আপনাকে ভালবাসি দাদা। আমার একটু তবলা জানা আছে। আমি সেইটাকেই ঝালাই। তা হলে সব আসরেই আপনার সঙ্গে বাজাতে পারব।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। তা হলে চলো উঠে পড়ি। আজই কমিশনারকে রেজিগনেশানটা ধরিয়ে দিই।"

"চলুন, চলুন। নেচে নেচে যাই। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ছুটি, ছুটি। গরম গরম রুটি।"

"চলো তা হলে, আমরা আগে যাই আমাদের আগের জায়গায়। সেখানে কী সব পড়ে আছে দেখি। চাকরিটা তো এখনও ছাড়িনি। যতক্ষণ ওরা আমাদের না ছাড়ছে, ততক্ষণ আমাদের কাজ করতে হবে।"

বনের পথ ধরে দুই অফিসার চলেছেন। আজ আনন্দে একেবারে ভরপুর। চাকরি ছাড়ার আনন্দ। আর চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমাশের পেছনে ছুটতে হবে না। একজন বাজাবেন সেতার, আর একজন তবলা। বুনো একটা পেয়ারাগাছে অনেক পেয়ারা ধরেছে। সেকেন্ড অফিসার গোটা-ছয় পেয়ারা পেড়ে এনে বললেন, "নিন স্যার, ভক্ষণ করুন, ভক্ষণ। দেখুন কত ভালবাসি। সমান সমান ভাগ করেছি, আপনি তিন, আমি তিন। পেড়ে এনেছি বলে কমিশান নিইনি।"

"খুউব ভাল, খুউব ভাল। তবে তোমার তিনটে মনে হচ্ছে একটু বড়।"

"মনে হচ্ছে?" বেশ পালটাপালটি। আপনি এই তিনটে নিন।"

দু'জনে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে, বনের শোভা দেখতে দেখতে, আগের জায়গায় ফিরে এলেন। পুরো ব্যাটেলিয়ান সেখানে বসে। ওঁরা যেতেই বড় হাবিলদার বললেন, "স্যার, উঠে দাঁড়িয়ে আর স্যালুট করার শক্তি নেই। এই বসেই আমরা করলুম। চাকরি খেতে হয় খান স্যার; তা হলে আমাদের কষ্ট করে আর ছাড়ার দরখাস্ত লিখতে হয় না।"

ফার্স্ট অফিসার, সেকেন্ড অফিসার পাশাপাশি পাথরে বসলেন। ফার্স্ট অফিসার বললেন, "তোমরাও চাকরি ছাড়ছ নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার, কাল রাত থেকে আমাদের যা হচ্ছে। আমরা ঠিক করেছি চাকরি আর করব না।"

ফার্স্ট অফিসার হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা, বন-কাঁপানো হাসি। হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তা হলে কী করবে?"

"আমরা ব্যান্ডপার্টি করব স্যার। মহল্লায় মহল্লায় বিয়েশাদির বাজনা বাজিয়ে বেড়াব। ঝলমলে জামা-প্যান্ট। মাথায় পাগড়ি। ভাল ভাল খাব, আর ব্যান্ড বাজাব। আমাদের জবাব দিয়ে দিন স্যার। এই দু'দিনে আমাদের বহুত শিক্ষা হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের বেল্ট, রিভলভার পাইনি স্যার। আর আমরা খোঁজার জন্যে যেতেও পারব না স্যার। আমাদের এক্ষুনি বরখাশ করুন।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "সবাই দেখছি, গানের লাইনে যেতে চাইছে। এরপর শোনার লোক থাকবে তো!" দূরে গাছতলায় মহাবীর টি-স্টলের

ফেলে যাওয়া একটা বড় কৌটো পড়ে আছে। ফার্স্ট অফিসার সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, "নিয়ে এসো তো।"

দেখা গেল এক কৌটো বড়দানার চিনি। সেই চিনি একমুঠো মুখে ফেলে ফার্স্ট অফিসার বললেন, "খাও, খাও, সুগার এনার্জি। সুগার হল ক্যালোরি।"

চিনি খেতে খেতে কী যেন ভাবলেন; তারপর বললেন, "নাঃ, চাকরি ছাড়া যাবে না হে।"

সেকেন্ড অফিসার সবে একমুঠো চিনি মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন, "কেন দাদা? ছাড়া যাবে না কেন? কী আবার হল?"

"চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ড্রেস, টুপি, বেল্ট, রিভলভার সব জমা দিয়ে দিতে হবে।''

"তা হলে?"

"তা হলে, তোমার টুপি আর আমার রিভলভার উদ্ধার করতেই হবে। আর ও দুটো উদ্ধারই যদি হল, তা হলে আর চাকরি ছেড়ে কী হবে?"

"তা অবশ্য ঠিক। মাইনে খুব একটা খারাপ নয়। অন্য সুযোগ-সুবিধেও যথেষ্ট। আর এই ক্ষমতা আর দাপট?" ফার্স্ট অফিসার বড় হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাও হে। উঠে পড়ো চাঁদেরা। পুরনো গোরস্থান পেরিয়ে সোজা চলে যাও উত্তরে। মাইল-তিনেক হাঁটলে পাবে পুঁটিয়ার জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর পাবে মানুষমারি জলা, চাঁদেরা আমার। সবাই মিলে ডুবে ডুবে আমার রিভলভারটা তুলে আনো।"

''আমরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছি স্যার।"

''দিতে পারো, তবে চাকরি তোমাদের ছাড়েনি। যা বলব তাই শুনবে, নয়তো সব ক'টার জেল হয়ে যাবে। ব্যান্ড বাজানোর বদলে দশ বছর ঘানি ঘোরাতে হবে। যাও বাছা, বুঝেসুঝে কাজ করো।"

ওরা সব উঠে পড়ল। বড় হাবিলদার বললে, "লে চল।"

সবাই মার্চ করে চলল পুরনো গোরস্থানের দিকে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "সেকেন্ড, আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলুম, সেইখান থেকেই শুরু করি। সেই জামা। ধোবিখানা। অ্যারেস্ট।"

"দাঁড়ান। আমার মাথায় আইডিয়া এসে গেছে। কুকুর।"

"কোথায় কুকুর? কার কুকুর?"

"সদর থেকে আমরা পুলিশ-কুকুর আনাব। কুকুর জামাটা শুঁকবে, তারপর আমাদের টানতে টানতে যাবে জামার মালিকের কাছে; তারপর ক্যাচ, কট, কট।"

'বাঃ, বাঃ, তোফা বুদ্ধি। এই বুদ্ধিটা আগেই তোমার মাথায় এল না কেন?

শোনো তা হলে, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এইমাত্র এল, একেবারে টাটকা গরম। এমনি সাধারণ মানুষ দরকারি কিছু হারালে বা চুরি গেলে, আমাদের কাছে এসে কী করে?”

“কান্নাকাটি করে।”

“তারপর কী করে!”

“চলে যায়।”

“তোমার মুন্ডু। তারপর একটা ডায়েরি করে। আমি প্রথমে সাধারণ মানুষ, তারপর পুলিশ। মানুষ না হলে পুলিশ হলুম কী করে। আজ আমি আমার কাছে রিভলভার হারিয়ে গেছে বলে একটা ডায়েরি করব। বুঝলে!”

“তা হলে আমারও একটা ডায়েরি নেবেন, টুপির।”

“আ, কাম টু দা পয়েন্ট।”

॥ ৩৬ ॥

সবার আগে ঘুম ভাঙে সুকুর। যত রাতেই ঘুমোতে যাক, সবার আগে তার চোখ খুলে যায়। ভোরের প্রথম পাখিটি তখন হয়তো সবে থেমে থেমে একটু একটু ডাকতে শুরু করেছে। সুকু বিছানায় উঠে বসল। নীল মশারির ঘেরাটোপে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। জানালার বাইরে আকাশে আলোর রং ধরছে। এই সময়টা সুকুর ভীষণ ভাল লাগে। নরম তুলতুলে একটা সময়। সুকু বিছানা থেকে নামতে পারছে না একটা কারণ, মায়ের মুখ না দেখে সে আর কারও মুখ দেখতে চায় না। মায়ের সঙ্গে তার চুক্তিই আছে, মা মশারির বাইরে এসে সুকুর সামনে দাঁড়াবেন। সুকু মায়ের মুখ ভাল করে দেখবে; তারপর নেমে এসে মাকে প্রণাম করবে। মা সুকুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন, শুরু হয়ে যাবে দিন।

হঠাৎ সুকু শুনতে পেল বাইরের বাগান থেকে মা ডাকছেন, “সুকু, আয়, শিগগির আয়।”

গলা শুনে বুঝল, একটা কিছু হয়েছে। সুকু চোখ বুজিয়ে মায়ের মুখটা ভেবে নিল একবার; তারপর মশারি তুলে নেমে এল বিছানা থেকে। ছুটল বাগানের দিকে। দাদার ঘর এখনও বন্ধ। তাকিয়ে দেখল বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। কাল বোধহয় সারারাতই জেগেছিলেন।

সুকু লাফিয়ে বাগানে নামল। মা দাঁড়িয়ে আছেন সেই গেটের সামনে। সুকু ডাকল, “মা, কী বলছ?”

"এদিকে আয়, এই দেখ।"

উইলিয়ামসন সাহেবের সেই বিখ্যাত কুকুর, গোলা, গেটের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সামনের থাবার ওপর তার বৃদ্ধ মুখ যেন ঘুমিয়ে আছে। দু'চোখ বেয়ে জল নেমেছে। এখনও ভিজে আছে দু'চোখের কোল। সুকু বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল কুকুরটার দিকে। কই শ্বাস পড়ছে না তো! পেটের কাছটা ওঠা-নামা করছে না। ভোরের বাতাসে তার লোম উড়ছে। সব শেষ। কত বড় জীবন একটা শেষ হয়ে গেল। গোলাকে মনে হত, মানুষের চেয়েও বড়। অনেকদিন থেকে সুকুর সঙ্গে গোলার ভাব। গোলাকে সুকু মনে মনে গুরু করেছিল। সন্ন্যাসী কুকুর। সন্ধের অন্ধকারে উইলিয়ামসনের বাংলোতে, কবরের পাশে মুখ তুলে যখন বসে থাকত স্থির হয়ে, তখন মনে হত গোলা ধ্যান করছে। কারও সঙ্গে মিশত না কোথাও যেত না। শেষ বছর ক'টা সুকু দিলে খেত, না দিলে খাওয়ার জন্যে কোনও চেষ্টাই ছিল না।

বাগানের কাছ থেকে সদ্য-ফোটা একমুঠো ফুল নিয়ে ছড়িয়ে দিল গোলার শরীরে। চাঁদপাল বাংলোর হাতায় ঘুমোচ্ছিল। সে উঠে পড়েছে। গেটের কাছে এসে এই দৃশ্য দেখে থমকে গেল। এমন সুন্দর ভোরে এত সুন্দর একটা জীবন চলে গেল! চাঁদপালও গোলাকে চেনে। কে না চেনে। সারা শহরের লোক গোলাকে জানে। চাঁদপাল এগিয়ে গিয়ে গোলার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একসময় কেঁদে ফেললে। সুকু এতক্ষণ কাঁদেনি, আর ধরে রাখতে পারল না চোখের জল। নিতুও উঠে এসেছে। সারা বাড়ি জেগে গেছে।

চাঁদপাল বললে, "এই সাধকের সমাধি হবে।"

সুকু বললে, "কোথায় হবে? সাহেবের বাংলো তো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।"

"ওই বাংলো আমরা কমলবাবুকে পাইয়ে দেব। আমাদের সে ক্ষমতা আছে। ওইখানেই আমরা সমাধি দেব। পিটার গোনজালেসকে নিয়ে পাথর কাটিয়ে ফলক বানাব। তোমরা জানো না, এই কুকুর প্রতি রবিবার সকালে চার্চে যেত। প্রার্থনার সময় চুপ করে বসে থাকত একপাশে। ফাদাররা কিচ্ছু বলতেন না। এই কুকুর একবার জেলাশাসকের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল এক হাজার এক টাকা। আরে ভাই, সে-সব দিন চলে গেছে। আর আসবে না।"

চাঁদপাল ছুটল ছোট্ট একটা কফিন আনতে। গোনজালেসের ডেরা, তা প্রায় তিন-চার মাইলের পথ। ডক্টর মুখার্জি এসেছেন। একপাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। বললেন, "আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। অনেক দূর। সে তো এই সাত-পাহাড়ির কাছে। কফিনটিকে গাড়ির মাথার ওপর কেরিয়ারে তুলে দিয়ো। রামধন ইঁদারার কাছে ডন-বৈঠক মারছে। ওকে বলো, গাড়ি বের করতে।

ডক্টর মুখার্জি একটা নতুন চাদর এনে গোলার গায়ে চাপা দিয়ে দিলেন। কী নিশ্চিন্ত আরামে কুকুরটা ঘুমোচ্ছে। তিনি শক্ত মানুষ। জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছেন। রোজই দেখেন। তবু তাঁর চোখে জল এসে গেল। মনে হল, একদিন সকলকেই এইভাবেই যেতে হবে। এত আলো, এত রং, এত বর্ণ, এত গন্ধ, এত শব্দ সব পড়ে থাকবে, পেছনে যারা আসছে তাদের জন্যে। জীবনের মিছিল তো থামবে না। ডক্টর মুখার্জি ছলছলে চোখে গেটের দিকে তাকালেন। ওপারে রাস্তা বহু দূরে চলে গেছে, নীল পাহাড়ের দিকে। ডোরাকাটা পাজামা আর ডোরাকাটা চাইনিজ কোট পরে কে একজন আসছেন। এইদিকেই আসছেন। চোখে চশমা নেই, ঠিক বুঝতে পারছেন না। তবে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আর-একটু কাছে আসতেই চমকে উঠলেন, এ কী, এ যে সুদর্শন! সুদর্শন তো হাসপাতালে। সে তো যমে-মানুষে টানাটানি।

সুদর্শন হাসি হাসি মুখে গেটের সামনে এসে বললেন, "আসতে পারি?"

"আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"আমি ভূত নই ডাক্তারবাবু, ওই দেখুন ছায়া পড়েছে আমার।"

সুদর্শন গেট খুলে ভেতরে এলেন। এসেই দেখলেন চাদর-চাপা কী একটা পড়ে আছে। থমকে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, "এটা আবার কী?"

"কুকুর। মারা গেছে।"

"যাঃ, মারা গেল! একটা জীবন গেল, আর একটা জীবন এল।"

"আপনার ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সোজা ব্যাপার। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। ও বাবা, এ আমি কোথায় পড়ে আছি! জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করলুম। হাসপাতাল। হাসপাতালে কেন? একজন সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলুম। বললে, আপনি গুরুতর অসুস্থ। ভাবলুম, তাই হয়তো হবে! ভোর হল। বিছানায় উঠে বসলুম। ধীরে ধীরে নামলুম। আমি অসুস্থ! আমার মাথা ঘুরছে না, পা টলছে না, শরীর খারাপ লাগছে না। আমি অসুস্থ! দেখলুম, কেউ কোথায় নেই, সিঁড়ি দিয়ে টকটক করে নেমে এলুম। হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে। গেট পেরিয়ে রাস্তা। হাঁটছি। হেঁটেই চলেছি। হেঁটেই চলেছি। দেখি কী, এইখানে চলে এসেছি। একেবারে আপনার কাছে।"

"কাজটা আপনি খুব খারাপ করেছেন। একে বলে পালিয়ে আসা।"

"আমি অতটা ভেবে দেখিনি। আমার এত আনন্দ হচ্ছিল।"

"আনন্দ আমারও হচ্ছে। আনন্দে আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে। আমি অসাধ্য-সাধন করতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। সাংঘাতিক একটা ভাইরাসকে বোধহয় মারতে পেরেছি। চলুন, চলুন, ভেতরে চলুন। হাসপাতালে ফোন করে জানিয়ে দিই।"

বড় অফিসার আর ছোট অফিসার দু'জনে প্রায় মার্চ করে থানায় ঢুকলেন। থানা আছে, ফোর্স নেই। চারজন হাবিলদার কাঠ হয়ে বসে আছে। বড় অফিসার ফোন তুলেই চিৎকার করতে লাগলেন, "হ্যাল্লো হেডকোয়ার্টার! হ্যাল্লো হেডকোয়ার্টার।"

ছোট অফিসার বললেন, "উঃ, চাপে পড়লে মানুষের কী অবস্থা হয়! আরে মশাই, ডায়াল করুন, তা না হলে শুধু হেডকোয়ার্টার, হেডকোয়ার্টার বলে চেল্লালেই হবে?"

"ডায়াল করিনি?"

"না, কোথায় করলেন?"

"বেশ, করিনি যখন, করছি। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, ম্যাকলিনস, ম্যাকলিনস। দিস ইজ টুমপা। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কুকুরটা পাঠাও। কুকুর, কুকুর, ডগ, ডি ও জি, ডগ। আরে সিরিয়াস কেস। আমার রিভলভার স্ন্যাচ করে নিয়েছে। ছোটটার টুপি উইথ অশোক স্তম্ভ— শুনতে পাচ্ছ না কেন? আই সে, শুনতে পাচ্ছ না কেন? কুকুর পাঠাও! আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। পুরো পাপচক্র আজ ভেঙে দেব। কুকুর পাঠাও। কুত্তা, কুত্তা!"

বড় অফিসার রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, "আমার এই চেয়ারটা হল জাজমেন্ট সিট অব বিক্রমাদিত্য। যেই বসলুম মাথাটা খুলে গেল। কীরকম বললুম, তোমার টুপি আর আমার রিভলভার ছিনতাই হয়ে গেছে।"

"খুব ভুল করলেন। এক্ষুনি সারা জেলা তোলপাড় হবে। নিরীহ কিছু লোককে ধরে পেটাতে হবে। আমার মনে হয় মিথ্যার ওপর কিছু দাঁড় না করানোই ভাল। তাতে সব গোলমাল হয়ে যায়। যা সত্য, তা সত্য।"

"ওমা, এ আবার কী, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। যাক, আমার মাথায় এখন আর কিছু আসছে না। আমি চা খাব, চান করব, পুজো করব। রিল্যাক্স করব, কিছুক্ষণ রিল্যাক্স করব। আমার মাথায় সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।"

ছোট অফিসার চিৎকার করলেন, "চা-আ।"

"ভুল করলে, ভুল করলে। চা মানুষ নয় যে, ডাকলেই কাপে চেপে চলে আসবে। আগে মানুষকে ডাকতে হবে। আমি দেখাচ্ছি। উদাহরণ ছাড়া তোমার মাথায় ঢুকবে না।"

বড় অফিসার চিৎকার ছাড়লেন, "ছোট, চা বোলাও, চা। এইবার তুমি উঠে পড়ো। ওই দেখো কোণের টেবিলে ইলেকট্রিক কেটলি। প্লাগ লাগাও, জল ঢালো, চা বানাও। যে কাজের যা নিয়ম।"

"আমি বানাব?"

"এখানে আর কোনও সেকেন্ড অফিসার আছে?"

"না।

"তা হলে? যে পোস্টের যা ওয়ার্ক। আমি যখন সেকেন্ড অফিসার ছিলুম, দশটা বছর আমি চা করে করে ফার্স্ট অফিসারকে খাইয়েছি। সে সব চা কী! যেমন লিকার তেমন ফ্লেভার আর তেমন পুরু, যেন রাবড়ি। এক-এক চুমুকে এক-এক ধাপ প্রমোশান। তোমারও তাই হবে। যাও বৎস, সেবা করো, সেবা। সেবাই পরম ধর্ম।"

সেকেন্ড অফিসার চা করতে গেলেন। গজগজ করছেন সমানে। ফার্স্ট অফিসার জুতো খুলে পা দুটো স্টান টেবিলে তুলে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "রেগে রেগে কোনও কাজ কোরো না। তাতে কাজের কোয়ালিটি খারাপ হয়। গুনগুন করে গান গাও, রাম নাম সুখদায়ী।"

ফার্স্ট অফিসার আর কথা বলতে পারলেন না। মাথা হেলে পড়ল পেছন দিকে। মুখটা হাঁ হয়ে গেল অল্প একটু। আর শুরু হয়ে গেল, মেঘগর্জনের মতো নাসিকাগর্জন। বেশিক্ষণ অবশ্য নাক ডাকাবার সুযোগ পাওয়া গেল না। ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। ঘুম-চোখে রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, "হ্যালো"। ও-মাথা থেকে কী ভেসে এল কে জানে! ধড়মড় করে উঠে বসলেন। পা নামাতে গিয়ে একটা মোটা খাতা টেবিলের ওপর থেকে দুম করে পড়ে গেল মাটিতে।

ফার্স্ট অফিসার যখন এইরকম বেসামাল অবস্থায়, সেই সময় সেকেন্ড অফিসার এলেন চা নিয়ে। আবার গান গাইছেন, "রাম ভজনুয়া, রাম ভজনুয়া।" কাপটা ঠকাস করে টেবিলে রেখে হেঁড়ে গলায় হাঁকলেন, "চায় গরম।"

ফার্স্ট অফিসারের তখন শোচনীয় অবস্থা। সেকেন্ড অফিসারকে এক দাবড়ানি দিলেন, "ডোন্ট শাউট!" খেয়াল ছিল না, লাইনের ও-মাথায় স্বয়ং কমিশনার। কমিশনার ভাবলেন, তাঁকেই বোধহয় বলা হল, কারণ তিনি চিৎকার করেই কথা বলছিলেন। কমিশনার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আরও জোরে বললেন, "হোয়াট? ডোন্ট শাউট। তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। হাসপাতাল থেকে তোমার আসামি পালাবে, আর তুমি তোমার সিনিয়র অফিসারকে ধমকাবে, 'ডোন্ট শাউট, আমি আজই তোমাকে জেলে ভরব। আমি আসছি আমার ফোর্স নিয়ে।"

ফার্স্ট অফিসার প্রায় কেঁদে ফেললেন, "বিশ্বাস করুন স্যার, আপনাকে বলিনি। আপনাকে বলিনি স্যার। আমার এই গাধাটাকে বলেছি।"

"কী বললে, গাধা? আমি গাধা?" বিশাল একটা গর্জন ছাড়লেন, বাঘের মতো।

"না স্যার, আপনি কেন গাধা হবেন। গাধা আমার এই সেকেন্ড অফিসার।"

"তুমি কি আমাকে সত্যিই গাধা ভেবেছ? কথা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার, সেখানে সেকেন্ড অফিসার এল কোথা থেকে। তুমি ইয়ারকি পেয়েছ? আমি দূরে আছি ভেবে ভাবছ কাছে যেতে পারব না? জিপে চাপলে ঠিক এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পরে তোমার অবস্থাটা কী হবে ভাবতে পারছ? তুমি জাতির কলঙ্ক। তুমি দেশের শত্রু। তুমি হিরোশিমা নাগাসাকি। তুমি কাজিরাঙ্গা। তুমি লাহুল স্পিতি।"

বেশ বোঝা যাচ্ছে, কশিনার ঠকঠক করে কাঁপছেন। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। রিসিভার টেবিলের কোনায় লেগে কাঠখত্তালের মতো খট-খটাখট শব্দ করছে।

ফার্স্ট অফিসারের মুখ দিয়ে ভয়ে আর কথাই সরছে না। কোনওক্রমে বললেন, "সেকেন্ড অফিসার আপনার-আমার কথার মধ্যে কীভাবে ঢুকলেন বলছি। আমি ওকে এক কাপ চা করতে বলেছিলুম। এমন পাজি ছেলে, স্যার, চা নিয়ে এল গান গাইতে গাইতে, রাম ভজনুয়া, রাম ভজনুয়া। সিনিয়ার অফিসারের কোনও রেসপেক্ট নেই। আপনার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, আমি বলে দাঁড়িয়ে উঠেছি আর ওই গাধাটা কিনা...

কমিশনার ও-প্রান্ত থেকে আবার হুংকার ছাড়লেন, "বাজে বোকো না। তুমি একটা অপরাধী। সেকেন্ড অফিসার তা হলে চোর-বদমাশ ধরার বদলে এখন তোমার চা তৈরির কাজে লেগেছে। বাঃ, বাঃ, এ-দেশের কী হবে! আর তাকে তুমি গাধা বলছ। আমি তো তোমাকে ইচ্ছে করলেই গাধা বলতে পারি, বলছি কি?" একটু থামলেন। দম নিলেন, তারপর ভীষণ চিৎকার করে বললেন, "ভুলে যেয়ো না, এটা তোমার অফিস। বাড়ি নয়। চোর ধরার জন্যে চাকরি তোমার। চা খাবার জন্যে নয়। বাবু সেকেন্ড অফিসারকে দিয়ে চা করিয়ে টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে আরাম করে খাচ্ছেন, চ্যাপরাও। ইআঃ। ঘিবুবু।"

ফার্স্ট অফিসার হঠাৎ রেগে গেলেন। গিয়ে বললেন, "বেশ করেছি। আবার করব। হাজারবার করব।"

ওপাশে কমিশনারের হাত থেকে রিসিভার পড়ে যাবার শব্দ হল। ফার্স্ট অফিসার রিসিভার নামিয়ে সেকেন্ডকে বললেন, "তুমি ইস্তফা দেবে? আমি দিচ্ছি। এক্ষুনি দিচ্ছি।"

সেকেন্ড উত্তর দিলেন না। চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছেন আর গান গাইছেন, "রাম ভজনুয়া, রাম ভজনুয়া।"

"তুমি আমার দলে আসবে?" ফার্স্ট বললেন।

সেকেন্ড বললেন, "আমি গাধা।"

আবার ফোন বাজল। ফার্স্ট অফিসার ধরলেন, "হ্যালো।"

ও-মাথায় মেঘগর্জন, কমিশনার। "শোনো, সেকেন্ড অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দাও। তোমাকে আমি আর এক ঘণ্টার মধ্যে সেকেন্ড করে দিচ্ছি।"

"সব করবেন যান। তার আগেই আমি পদত্যাগ করছি।"

রিসিভার নামিয়ে ফার্স্ট সেকেন্ডকে বললেন, "গুডবাই সেকেন্ড। নাও, চার্জ বুঝে নাও একে একে। এই নাও আমার ব্যাটন, টুপি, ড্রয়ারের চাবি। জামা, প্যান্ট বোতাম। এই হল গজরেজের চাবি। নাও, বোঝো।"

আধ ঘণ্টা পরে ফার্স্ট অফিসার পাজামা-পাঞ্জাবি পরে খুশমেজাজে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দেখলেন, একটা পুলিশ-কুকুর জিভ লকলকিয়ে থানায় ঢুকছে।

॥ ৩৭ ॥

"আমি সবার আগে আপনাকে পরীক্ষা করতে চাই।" ডা. মুখার্জি সুদর্শনকে শুইয়ে ফেললেন। ব্যাপারটা তো খুব সাংঘাতিক। সুদর্শনের যে অসুখ করেছিল, সে অসুখের তেমন কোনও ওষুধ আজও বেরোয়নি। যদি স্লিপিং সিকনেসের একটা ওষুধ সত্যিই বের করা যায়, আফ্রিকার বহু মানুষের ভীষণ উপকার হবে।

ডা. মুখার্জি বললেন, "প্রথমে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। সেই ঘোর কখন কীভাবে কাটল?"

সুদর্শন চোখ বুজে একটু ভাবলেন। কপালে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, "ঘড়ি দেখিনি, তবে গভীর রাত। হঠাৎ আমার চোখ দুটো খুলে গেল। কোথাও পুট পুট করে জল পড়ছে। সেই শব্দ আমার কানে আসছে। অনেক দূরে একটা ঘড়ি চলছে। তার টিক টিক শব্দ। আমি চিত হয়ে শুয়েছিলুম তো, তাই চোখে পড়ল সিলিং। নরম একটা আলো জ্বলছে। একটা টিকটিকি শুয়ে আছে। চোখে পড়ল, লোহার স্ট্যান্ডে একটা বোতল ঝুলছে। সেই বোতল থেকে একটা টিউব এসে আমার হাতে ঢুকছে। জল পড়ার পুট পুট শব্দটা আসছে বোতল থেকে। চোখ দুটো আবার বুজে এল। শব্দ হারিয়ে গেল। মনে হল, আমি ডুবে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি জলের অতলে। হঠাৎ মনে হল, মাথায় একটা

বোমা ফাটল। মনে হল মাথাটা খুলে বলের মতো গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। সারা শরীর ধনুকের মতো বেঁকে আবার সোজা হয়ে গেল। হাত থেকে টিউবটা খুলে চলে গেল। আর ঠিক সেই সময় একজন সিস্টার এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। তখনই বুঝলুম, আমি হাসপাতালে আছি।"

ডা. মুখার্জি নানাভাবে সুদর্শনকে পরীক্ষা করলেন। একটু লিখতে বললেন। এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে যেতে বললেন। চোখ দুটো দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল সুদর্শন একটু ট্যারা হয়ে গেছেন। কিছু জানালেন না। আর দেখলেন জিভের রংটা ঘোর বেগুনি হয়ে আছে। জাম খেলে যেমন হয়। একটা খাতায় সব লিখলেন ডাক্তারবাবু। তারপর ফোন তুলে নিলেন। হাসপাতাল। ফোন বাজছে। সুপার সাড়া দিলেন, বললেন, "আপনার রুগি পালিয়েছে। পুলিশ সারা শহর তোলপাড় করছে।"

"করতে দিন। সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত ওই রোগে কোনও রুগি বাঁচেনি। আপনি সাংবাদিকদের ডেকে পাঠান। প্রেস কনফারেন্স করুন। এ-একটা সাফল্য। একটা আবিষ্কার। মানুষের জানা উচিত।"

"ক'টার সময় ডাকব?"

"প্রেস ক্লাবে ডাকুন, সন্ধে ছ'টার সময়।"

"পুলিশ তো খুব জ্বালাচ্ছে! আমরাও লোক লাগিয়েছি। হাসপাতাল থেকে রুগি পালানো মানে আমার চাকরি চলে যাওয়া।"

"রুগি পালায়নি। রুগি আমার কাছে। সন্ধেবেলায় প্রেস কনফারেন্সে রুগিকে সগৌরবে হাজির করা হবে। পুলিশকে জানিয়ে দিন। আপনাদের লোককে ফিরে আসতে বলুন।"

"যাক বাঁচালেন। আমরা সেই ভোর থেকে পাগলের মতো হয়ে আছি।"

ডা. মুখার্জি ফোনটা সবে নামিয়েছেন কি নামাননি, বাইরে সাংঘাতিক শোরগোল। বাগানের গেটটাকে প্রায় ভেঙে ফেলার জোগাড়। কে রে বাবা! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন বাগানে। পুলিশবাহিনী। সঙ্গে একটা জার্মান শেফার্ড ডগ। মাটি শুঁকছে। গেট শুঁকছে। মাঝে মাঝে সামনে জিভ ঝুলিয়ে হ্যা-হ্যা করছে। পুলিশবাহিনীর পেছনে স্থানীয় লোকজন। মজা দেখার জন্যে ছুটে এসেছে।

টুপি মাথায় সবচেয়ে স্মার্ট চেহারার পুলিশ অফিসার, যাঁর হাতে কুকুরের চেন, তিনি চিৎকার করছেন, "ওপন দি গেট। ওপন দি গেট।"

রুকু, সুকু, চাঁদপাল, নিতু সবাই বাড়ি খালি করে চলে গেছে গোলাকে সমাহিত করতে। মনে মনে ভাবলেন, এমন ড্রেস, কোমরে রিভলভার, হাতে ধরা কুকুরের চেন, বিলিতি ব্যাপার; অথচ এই সাধারণ বুদ্ধিটাই নেই গেটটা

বাইরে থেকে সহজেই খোলা যায়। দুখিয়া গেটটা খোলার জন্যে এগোচ্ছিল, একসঙ্গে পুলিশ আর কুকুর দেখে ভয়ে থমকে গেল।

অফিসার খুব মেজাজ নিয়ে বললেন, ''ওপন আপ। ওপন আপ!"

পুলিশ দেখে ডা. মুখার্জি একদম ভয় পেলেন না। জানেনই তো, ওঁরা এসেছেন সুদর্শনের খোঁজে। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'দি গেট ইজ ওপন।" পুলিশ পুলিশি মেজাজে গেট খুলে কুকুর নিয়ে এগিয়ে এল। ঠিক ঠিক বলতে হলে, পুলিশ এগিয়ে এল না, মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে এল কুকুর। পুলিশ এল কুকুরের টানে। ডা. মুখার্জি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন কুকুর সেই অবধি এসেও থামল না। শুঁকতে শুঁকতে পাশ দিয়ে চলে গেল। পুলিশ পেছনে। ডা. মুখার্জি বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন, জুতো পায়ে বাড়ির ভেতরে! ভেতরে যাবার কী হল। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি এখানে। আর ওই তো সুদর্শন, যে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে।"

পুলিশ অফিসার গ্রাহ্যই করলেন না। কুকুর দালান পেরিয়ে, বসার ঘরের ভেতর দিয়ে সোজা শোবার ঘরে। কমল ভৌমিক যে খাটে শুয়ে ছিলেন, সেই খাটের মাথার দিকে দু'পা তুলে, এতখানি কুকুর খাড়া উঠে দাঁড়াল। লকলকে জিভ সামলে ঝুলছে। হ্যা-হ্যা করছে।

অফিসার বললেন, "আশ্চর্য এত বড় একটা আসামি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে।"

কমল ভৌমিককে একটা ধাক্কা মারতেই ডা. মুখার্জি ভীষণ রেগে ইংরেজিতেই বললেন, "হোয়াট আর ইউ ডুয়িং।"

"হি ইজ আন্ডার অ্যারেস্ট। ওকে আমরা গ্রেফতার করব।"

"কারণ?"

"কারণ? আমাদের কুকুর একেই অপরাধী বলে ধরেছে।"

"কী অপরাধ?"

"পুলিশবাহিনীকে আক্রমণ, গুলি চালনা, রিভলভার ছিনতাই, টুপি অপহরণ।"

"সে আবার কী?''

কমল ভৌমিক নিশ্চিন্ত আরামে ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে মাথার কাছে জিভ বের-করা বাঘের মতো বিশাল একটা কুকুর দেখে এতটুকু ঘাবড়ালেন না। বরং আদর করে বললেন, "হ্যাল্লো জিম। হাউ আর ইউ।" তারপর পাথরমুখো পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টা বাজল? ভোর কি হয়েছে?"

অফিসার বিশ্রী গলায় বললেন, "গেট আপ। গেট আপ। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।"

"ডগ স্কোয়াডের' অফিসাররা একটু সায়েবি। কুকুরের সঙ্গে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। কমল ভৌমিক আগের রাতে যতটা ফুলেছিলেন, আজ তার চেয়ে অনেক কমে গেছেন। তিনি উঠে বসে, এপাশ-ওপাশে তাকাতে লাগলেন। ডা. মুখার্জিকে বললেন, "স্বপ্ন দেখছি কি?"

"না স্বপ্ন নয়। সত্য। এঁরা কী বলছেন আমার মাথায় আসছে না।"

অফিসার তাঁর সহযোগীকে বলেন, "জামাটা বের করো।"

ঝোলা থেকে কমল ভৌমিকের জামা বেরিয়ে এল। অফিসার জামাটা তুলে ধরে বললেন, "এটা কার জামা?"

কমল ভৌমিক জামাটা হাতে নিয়ে বললেন, "আরে ভাই এই তো আমার জামা। পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস বাবা। হারালেই হল। আমার বেশ মনে আছে একটা গাছের নিচু ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ইস! জামাটা ছিঁড়ল কী করে!"

কমল ভৌমিক বিছানায় বসে বসেই জামাটা পরে উঠে দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা গড়ড় গড়ড় করে উঠল। কমল ভৌমিক বললেন, "চুপ কর। বেশি মেজাজ নিসনি। তোর মতো কলকাতায় আমারও একটা কুকুর ছিল। উই আর ফ্রেন্ডস। উই আর ফ্রেন্ডস।"

কুকুরের গর্জন কমে গেল। পুলিশ-কুকুর সত্যিই খুশি খুশি চোখে কমল ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। অফিসার বললেন, "জামাটা কি পরেই থাকবেন?"

"অফকোর্স! দিজ ইজ মাই শার্ট। আমার শার্ট আমি পরব না!"

"বেশ তা হলে হাত দুটো বাড়ান, হ্যান্ডকাফটা লাগাই।"

ডা. মুখার্জি বললেন, "অফিসার, কমল ভৌমিক আমার রুগি। আপনি জানেন না, আমি এই জেলার সিভিল সার্জেন। আমি আপনাকে বলছি, এই ভদ্রলোক কোনও অপরাধ করেননি। আমি তার সাক্ষী। আপনি আপনার কুকুর নিয়ে চলে যান।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—জামাটা কার?"

"কমলবাবুর।"

"জামাটা অপরাধের জায়গা থেকে পাওয়া গেছে। তার মানেটা কী?"

"মানে যাই হোক কমলবাবু অপরাধী নন। পুলিশ মাঝে মাঝে এইরকম ভুল লোককেই অপরাধী বলে ধরে নিয়ে যায়। আপনারা আসুন। হি ইজ সিরিয়াসলি ইল।"

"ইল! একে দেখে তো মনে হচ্ছে না। হি ইজ কোয়াইট ফিট অ্যান্ড ওকে।"

ডাক্তারবাবু অভাবনীয় জোর গলায় বললেন, "আই সে হি ইজ সিরিয়াসলি ইল।"

"কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করবেন। জামিনে ছাড়িয়ে আনবেন।" সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "অ্যায় হ্যান্ডকাফ লাগাও।"

সত্যি সত্যিই কমল ভৌমিকের হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানো হল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ-গাড়ি। "যাব্বাবা আমাকে শেষ পর্যন্ত হ্যান্ডকাফ পরালে। যাব্বাবা সত্যি সত্যিই আমাকে হ্যান্ডকাফ পরালে।" এই বলতে বলতে সদ্য ঘুম-ভাঙা অসহায় কমল ভৌমিক গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কুকুরটা পুলিশ হলেও কমল ভৌমিককে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। গাড়ির সামনের আসনে বসেছে কুকুর। গাড়ি ছেড়ে দিল।

রাগে, লজ্জায় ডাক্তারবাবুর চোখে জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে গাড়িতে উঠলেন। টেলিফোনে হবে না। সোজা যেতে হবে থানায়। থানায় না হলে যেতে হবে কমিশনারের কাছে। সিভিল সার্জেনের কথা শোনে না, এ কেমন পুলিশ।

গোলার মৃতদেহ নিয়ে এগিয়ে চলেছে শোকযাত্রা। সুন্দর একটা ঠেলাগাড়ি জোগাড় করে এনেছিল চাঁদপাল। সেই গাড়িতে গোলা শুয়ে আছে। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে তার দেহ। শুধু মুখটি তার জেগে আছে। চাঁদপাল চলেছে আগে আগে। নিতু, রুকু, সুকু গাড়ি ঠেলছে। তারা যত এগোচ্ছে, ততই দলে লোক বাড়ছে। গোলাকে সবাই ভীষণ ভালবাসত। কেন বাসবে না! গোলার যা গুণ ছিল মানুষের তা থাকে না। এবার বর্ষাকালে উইলিয়ামসন সাহেবের বাংলোর পাশ দিয়ে যে নদীটা চলে গেছে; যার নাম খোরো নদী, সেই নদী ভেসে গিয়ে সাহেবের বাংলো ডুবে গিয়েছিল। গোলা কিন্তু পালায়নি। একটা পাথরের ওপর উঠে বসে তিনটে দিন কীভাবে যে কাটিয়েছিল। গোলার ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল তার প্রভুভক্তির কথা বিরাট করে। ওরা ঠিক করেছে আগে যাবে চার্চে। ফাদারের অনুমতি নিয়ে, পেছন দিকে যেখানে বেরিয়াল গ্রাউন্ড, সেখানে নদীর ধারে পাইন গাছের তলায় গোলাকে শুইয়ে দেবে। নিয়মমতো, লাস্ট রাইটসও হবে। ফাদার শেফিল্ড জীব-জন্তুদের ভীষণ ভালবাসেন।

পেছন দিক থেকে পুলিশের গাড়ি ওঁয়া, ওঁয়া করে আসছে শুনে মিছিল রাস্তার পাশে সরে গেল। জিপটা চলে যাবার সময় সুকুর চোখে পড়ে গেল কমল ভৌমিক বসে আছেন। দু'পাশে পুলিশ পাহারা। বিশাল একটা অ্যালসেশিয়ানের মাথা দেখা যাচ্ছে। সুকু সব ভুলে চিৎকার করে উঠল, "ওই দেখুন চাঁদপালদা, পুলিশ কমলকাকুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার!"

রুকু আর নিতু বলে উঠল, "বাই বাই।"

জিপ ততক্ষণে ধুলো উড়িয়ে বহু দূরে চলে গেছে। চাঁদপাল বললে, "তুমি দেখলে? আমাদের তা হলে থানা ঘেরাও করতে হবে। এ জেলার সবকিছু দেখছি পাগলা হয়ে গেল।"

মিছিল যখন গির্জার দিকে বাঁক নিচ্ছে পেছন থেকে এসে পড়ল ডক্টর মুখার্জির গাড়ি। তিনি গাড়ি থামালেন। সুকু ছুটে এল, "কী হয়েছে বাবা?"

"কমলবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। জঙ্গলে জামা ফেলে এসেছিলেন। পুলিশ কুকুর সেই জামা শুঁকে সোজা আমাদের শোবার ঘরে।"

"কমলকাকু কী করেছেন?"

"পুলিশবাহিনীকে আক্রমণ। রিভলভার ছিনতাই। এমন কোনও অপরাধ নেই যা কমলকাকু তোমার করেননি। পুলিশের যেমন কাণ্ড!"

চাঁদপাল এগিয়ে এসেছে। "নমস্কার সায়েব, আপনি ভাববেন না। আমরা গোলার বেরিয়াল শেষ করে, থানায় যাচ্ছি, আমার ফুল পার্টি নিয়ে।"

"প্রথমে আমি থানায় যাচ্ছি। সেখান থেকে যাব কমিশনারের কাছে।" গাড়ি ধুলো উড়িয়ে সাঁ-সাঁ করে চলে গেল।

॥ ৩৮ ॥

থানায় তখন একটা হচপচ অবস্থা। ফার্স্ট অফিসার সেকেন্ড অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেছেন। সেকেন্ড অফিসারের প্রথমে খুব আনন্দ হয়েছিল। ঘরময় পায়চারি করতে করতে যাত্রার দলের অভিনেতার মতো ঘুসি পাকিয়ে আকাশের দিকে ছুড়তে ছুড়তে বলছিলেন, "এত দিনে, এত দিনে, হে জগদীশ্বর, তুমি মুখ তুলে চাইলে। আমি ফার্স্ট হয়েছি।" সারা ঘরে এঁকেবেঁকে খুব খানিকটা নেচে নিলেন। তারপর ফার্স্ট অফিসারের চেয়ারে বসে মুখ শুকিয়ে গেল। থানায় একজনও কনস্টেবল নেই। সবাই সেই জঙ্গল থেকে বহুদূরে, পাহাড়ের গায়ে একটা ডোবার ভেতরে ডুবছে আর উঠছে। রিভলভার খুঁজছে। কে তাদের ডেকে আনবে! নড়বড়ে তিনজন হাবিলদার থানা সামলাচ্ছে। তাদের এমন অভ্যাস, টুলে বসলেই ঘুমিয়ে পড়ে। টুল কেড়ে নেওয়া হল এস. পি.-র হুকুমে। এখন খাড়া দাঁড়িয়ে বন্দুকে ভর দিয়েও গভীর ঘুম। অদ্ভুত অভ্যাস করেছে। আবার নাক ডাকে। সেদিন একজন দুম করে বন্দুকটন্দুক নিয়ে উলটে পড়ে গিয়েছিল। ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতেই বললে, "কসুর হয়ে গেছে সায়েব। স্বপ্ন দেখছিলুম, একটা

চোরকে তাড়া করেছি। চোরটা একটা বেড়া টপকে গেল। আমিও মারলুম লাফ। একটুর জন্যে বেড়ায় পা আটকে গেল বলে পড়ে গেলুম। নেক্সট টাইম বেড়ায় আর পা আটকাবে না স্যার।”

সেকেন্ড অফিসার যখন এইসব ভাবছেন আর ক্রমশই শুকিয়ে ছোট হয়ে আসছেন, সেই সময় ফার্স্ট অফিসারের কী মজা। পরনে ফুরফুরে পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে ভারী বুট নেই। হালকা চটি। শিস দিতে দিতে পথে চলেছেন। লা লা লিটি লিটি। পথের পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। গড়িয়ে ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটি খালের দিকে। কুলকুল জল বয়ে চলেছে। হলুদ টিয়ার ঝাঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। গোল হয়ে উড়ছে। ছোঁ মেরে নেমে আসছে। জল ছুঁয়ে উঠে যাচ্ছে। ছোট ছোট নীল ঘাসফুল ফুটে আছে চারপাশে। ফার্স্ট অফিসার গড়ান বেয়ে গড়গড়িয়ে নেমে গেলেন মাঠে। মাঠের মাঝখানে দু’দিকে দু’হাত তুলে ছোট ছেলের মতো গোল হয়ে ঘুরলেন কিছুক্ষণ। ছুটে গেলেন জলের ধারে। টিয়াপাখির ঝাঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে তেড়ে এল। তিনি একছুটে আবার রাস্তায় উঠে গেলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এলেন গঞ্জের বাজারে। বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে বললেন, ‘হাম লাল লাল আপেল খায়েগা। এক নেহি, দো নেহি, আট, ন’,দশ।’ সোজা ফলপটিতে গিয়ে ঢুকলেন। এই ইউনিফর্ম পরে থাকলে কী কাণ্ডই না হত! সব ছুটে আসত। আপেল নিয়ে, আঙুর নিয়ে, বেদানা নিয়ে, পিচফল, সবেদা নিয়ে। দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। আইয়ে সাব। আইয়ে বড়েবাবু। আজ আর কেউ চিনতেই পারছে না। বরং একজনের একটা আপেল একটু গড়িয়ে পড়ে যাবার মতো হয়েছিল বলে, সে ধমকে উঠল, “আরে মশাই, নিতে হয় নিন। ঘাঁটবেন না।” প্রথমে ভেবেছিলেন, এক ধমক লাগাবেন, শেষে সামলে গেলেন। মনে মনে বললেন, “এখন আমি এদেরই একজন।” আপেলের তো বেশ দাম। অনেক দরদস্তুর করে দুটো আপেল কিনলেন। একটা আপেল হাতে। আর-একটা দাঁতে। আপেল কামড়াবার কচাক কচাক শব্দ হচ্ছে। মুখ ভরে যাচ্ছে রসে। বেশ আরাম লাগছে। সেই কখন খিদে পেয়েছিল। তেমনি জলতেষ্টা। পকেটে অনেক টাকা। পুরো মাসের মাইনে মজুত। খরচই হয়নি। খরচ করার সুযোগই হয় না। সকলেই বিনা পয়সায় সব কিছু দিয়ে দেয়।

আপেল খেতে খেতে চলেছেন। উলটোদিক থেকে আসছে সুকুদের শবযাত্রা। খোলা হ্যান্ডকার্টে শুয়ে আছে গোলা। তার গলায় সাদা ফুলের মালা। ফুলে ফুলে দেহটি ঢাকা। গোলার ঘুমন্ত মুখটি বেরিয়ে আছে। যে পেরেছে সেই ফুল দিয়েছে। জরির তবক দিয়েছে। গোলা চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে— এই সংবাদে অনেকেই ছুটে এসে মিছিলে যোগ দিয়েছে। মেহবুব

খবর পেয়েই চলে এসেছে তার ব্যান্ডপার্টি নিয়ে। বাদকরা রংচঙে পোশাক পরার সময় পায়নি। যে যে পোশাকে ছিল সে সেই পোশাকেই চলে এসেছে। বাজনায় সুর বাজছে, ধনধান্য পুষ্প ভরা। সবাই বলছে, এত বড় শবযাত্রা শিল্পপতি জয়সুখলাল মারা যাবার পরও হয়নি। গোলার কী ভাগ্য।

ফার্স্ট অফিসার রাস্তার একপাশে সরে গেলেন। বাঁ হাতে গোটা আপেল। ডান হাতে আধখাওয়া আপেল। পুলিশের অভ্যাস যাবে কোথায়। সট করে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করলেন। তারপর উঁকি মেরে দেখলেন, কে যায়? আরে কুকুর। কুকুরের এত বড় শবযাত্রা! বেশ মজা তো। তিনিও পেছন পেছন চললেন। এখন তো তাঁর বিরাট ছুটি। কোনও কাজ নেই কর্ম নেই। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় যেমন গ্রীষ্মের ছুটি হত। খুব চাপা সুরে বাজনা বাজছে। শবযাত্রা চলেছে চার্চের দিকে।

ডগ স্কোয়াডের অফিসার ডিকির জিপ জুমরাওগঞ্জ থানায় ঢুকল। সে এক হইহই ব্যাপার। সামনে বসে আছে কুকুর লকলকে জিভ বের করে। ডিকি তড়াক করে লাফিয়ে পড়লেন সিমেন্ট বাঁধানো পথে। কমল ভৌমিক লাফানোর দিকে নজর রেখেছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আরও প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যাঙ্গেলে গোলমাল আছে। 'হাউ টু জামপ' বলে ডন গ্রিফিথের একটা বই আছে। পড়েছেন?"

ডিকি অবাক হয়ে কমল ভৌমিকের মুখের দিকে তাকালেন, "আপনি কী করে জানলেন?"

কমল ভৌমিক হেসে বললেন, "জ্ঞান তো আর বেবিফুড নয় যে গুদামে আটকে রাখবেন?"

ডিকি বললেন, "কীভাবে লাফালে ঠিক হত? আপনি দেখাতে পারেন?"

"এই হ্যান্ডকাফ লাগানো অবস্থায়?"

"ও, তাও তো বটে। তা হলে থাক।"

"না, থাকবে কেন? হাত বাঁধা অবস্থাতে যদি দেখাতে না পারি তা হলে আমার নাম কমল ভৌমিক কেন?"

কমল ভৌমিক খরগোশের মতো তুড়ুক করে লাফ মারলেন। মাটিতে একেবারে বর্শার ফলার মতো গেঁথে গেলেন। সামনে পেছনে শরীর সামান্যও টলল না।

ডিকি বললেন, "অসাধারণ। আমার হ্যান্ডশেক করতে ইচ্ছে করছে। তা হ্যান্ডই নেই তো শেক করব কী?"

"হ্যান্ডকাফ শেক করুন।"

"আমার দুঃখ হচ্ছে, আপনার মতো একজন গুণীর শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয়ে যাবে। স্যাড। ভেরি স্যাড।"

"ফাঁসি হবে মানে? এটা কি মগের মুল্লুক? দেশে কি আইনকানুন নেই? আমার অপরাধটা কী সায়েব?"

"আমিই কি ঠিক জানি? আমাকে একটা জামা দেওয়া হল। আমার কুকুর শুঁকল। আপনি হাতে বালা পরলেন।"

"হবুরাজার দেশে এইরকমই হয়।"

ডিকি বিশাল একটা হাঁক পাড়লেন, "অফিসার? হোয়্যার ইজ অফিসার?"

সেকেন্ড অফিসার তখন একপাশে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকাল থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া হয়নি। এখন খুব পেয়েছে। সেই অবস্থায় কোনওরকমে বললেন, "ইয়েস স্যার।"

"আসামি হাজির। হাজতে ভরে ফেলুন। আপনি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন? ফার্স্ট অফিসার কোথায়?"

"আমিই এখন ফার্স্ট। যিনি ফার্স্ট ছিলেন, তিনি চলে গেছেন।"

"সে কী! তিনিই তো আমায় মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। জামা পাঠিয়েছিলেন।"

"তার একটু পরেই কেস ঘুরে গেছে।"

"আপনাদের এই ঘোরাঘুরির ঠেলায় জীবন যায়। যাক, এখন আসামিকে ভরুন।"

সেকেন্ড অফিসার হারিয়ে যাবার ভয়ে সমস্ত চাবি পইতেতে বেঁধে তার ওপর ইউনিফর্ম পরেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি জামা খুলতে শুরু করলেন।

ডিকি বললেন, "এ কী? এ কী?"

"চাবি স্যার। চাবি।"

সেকেন্ড অফিসার গেঞ্জি খুলে আদুড় গা। পইতেতে বাঁধা দশ-বিশটা বড়-ছোট চাবি।

ডিকি বললেন, "কী করেছেন মশাই? চাবির ভারে নুয়ে পড়েছেন যে!"

"হারাবার ভয় নেই।"

"তা যতবার চাবির দরকার হবে ততবার জামা খুলবেন?"

"কী আর করা যায়!"

সেকেন্ড অফিসার আর দাঁড়াতে পারছেন না প্রকৃতির ডাকে। হনহন করে এগিয়ে গেলেন হাজতের দিকে। কমল ভৌমিক হাসতে হাসতে ঢুকে গেলেন। সেকেন্ড অফিসার ডিকিকে বললেন, "এক্সকিউজ মি স্যার। আমাকে ডাকছে।"

"কে ডাকছে?"

"প্রকৃতি।"

তিনি দুদ্দাড় করে ছুটলেন পাগলা হাতির মতো।

ডা. মুখার্জির গাড়ি সোজা একেবারে এস. পি.র ডাকবাংলোয়। বাংলোটা ভারী মনোরম জায়গায়। পেছনের আকাশে নীল পাহাড়। হরিৎ বনানী। পাহাড় থেকে সবসময় একটা শীতল বাতাস গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে। পাহাড়ের কোনও একটা গুহায় একটা বৃদ্ধ ভল্লুক বাস করে। তার যে কত বয়েস হল কেউ জানে না। অনেকে সন্দেহ করে ভল্লুকটা ভল্লুক নয়। ছদ্মবেশী কোনও সাধু। ভল্লুকের বালতি থাকে? এই ভল্লুকের একটা বালতি আছে। সেই বালতিটা নিয়ে মাঝে মাঝে টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে আসে। একদিন কে একজন তার চলার পথের পাশে পড়ে গিয়েছিল। সে স্পষ্ট শুনেছে ভল্লুক গুনগুন করে গান গাইছে। তার মনে হয়েছিল সংস্কৃত স্তোত্রের মতো। যে শুনেছিল সে সংস্কৃত জানে না; একজন কাঠুরে; কিন্তু সে ওঁ শব্দটা তো জানে। সবাই জানে। একটা শিশুও জানে। বালতি হাতে ভল্লুক গভীর জঙ্গলে চলে যায়। গাছ থেকে মৌচাক ভেঙে ভেঙে বালতিতে রাখে। একজন দেখেছে, ভল্লুক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে উঠছে হাতে তার বালতি। ভরতি চাক ভাঙা মধু। চাক ডুবে আছে টাটকা ঝাঁজালো মধুতে। ভনভন করে মৌমাছি উড়ছে। বালতির মুখে। এই শহরের মানুষ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা বলে। কোনওটাই অবশ্য মিলিয়ে দেখা হয়নি।

এস. পি. সাদা জিনের শর্টস আর তোয়ালে গেঞ্জি পরে বাগানে গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছিলেন। ডান হাতে একটা খুরপি। পায়ে সাদা মোজা আর কেডস। একটু আগে টেনিস প্র্যাকটিস করছিলেন। সায়েব সাত দিন ছুটি নিয়েছেন। আজ ছুটির প্রথম দিন। গেট দিয়ে ডাক্তারবাবুকে ঢুকতে দেখে মহানন্দে বললেন, "হ্যাল্লো ডক। আমি মনে মনে আপনাকেই ডাকছিলুম। অ্যান্ড হিয়ার ইউ আর। আমার কিছু পাওয়ার হয়েছে। আজ থেকে আমার সাতদিন ছুটির শুরু। সকালে উঠে বললুম, লেট দেয়ার বি সানসাইন। দেখুন কেমন রোদ উঠেছে।"

এস. পি. হাহা করে হাসলেন। একটা কাঠবেড়ালি এগিয়ে আসছিল, ভয়ে লেজ তুলে একটা ইউক্যালিপটাস গাছে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে লেজ নেড়ে নেড়ে আর পিড়িক পিড়িক শব্দ করে সায়েবকে খুব বকতে শুরু করেছে।

ডা. মুখার্জি বললেন, "আমাকে মনে মনে ডাকছিলেন কেন?"

"চলুন, আমরা আগে ওই গার্ডেন চেয়ারে বসি। আজ একেবারে পালিশ করা দিন। হ্যাঁ, আপনাকে কেন খুঁজছিলুম জানেন, ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইন দিস টাউন। আমি ভাবছিলুম কী, আপনিও সাতদিন ছুটি নিন আমার সঙ্গে। দু'জনে মিলে যা খুশি তাই করব। টেনিস খেলব। মাছ ধরব। বনভোজন করব। সাতটা দিন একেবারে রাজার মতো, জাস্ট লাইক কিংস, খরচ করব।"

ফ্লাস্কে কফি ছিল। ট্রে-তে গোটা চারেক ঝকঝকে কাপ। দু'কাপ কফি ঢেলে নিজে এক কাপ নিলেন, এক কাপ এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুর দিকে। ডা. মুখার্জি বললেন, "থ্যাঙ্কস। আমার আপত্তি নেই। বহুদিন ছুটি নেওয়া হয়নি। আমি কিন্তু আপনার কাছে একটা কমপ্লেন নিয়ে এসেছি। আপনার ডগ স্কোয়াডের অফিসার আমাকে ইনসাল্ট করেছে। বেআইনি কাজ করেছে। পুলিশ আইনের তিনি কিছুই জানেন না।"

"ও, আপনি ডিকি-র কথা বলছেন? ও নো নো, হি ইজ এ নাইস চ্যাপ। কী করেছে ডিকি?"

ডাক্তারবাবু পুরো ঘটনাটা বললেন, কমল ভৌমিকের অ্যারেস্ট পর্যন্ত। এস. পি.-কে এও জানালেন, কমল ভৌমিককে অ্যারেস্ট করার কোনও মানেই হয় না। কারণ কমল ভৌমিক জামাটা খুলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

এস. পি. বললেন, "কোন কমল ভৌমিক? নামটা খুব চেনা। ফিজিক্যাল এক্সপার্ট? ক্যারাটে, কুংফু স্পেশ্যালিস্ট!"

"আপনি চেনেন?"

"চিনব না? আই পি এস হবার পর মাউন্ট আবুতে কমল স্যারই তো আমাদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন।"

শহর সেদিন দুটি অসাধারণ মিছিলের সাক্ষী হল। কুকুরের শবযাত্রা। গোলা প্রায় পৌঁছে গেছে চার্চের গেটে। দ্বিতীয় মিছিলটি আরও অসাধারণ। বারো-চোদ্দোজন পুলিশ কনস্টেবল কাদা মাখা, জলে ভেজা সপসপে ইউনিফর্ম পরে জুজুবুড়োর মতো শহরের রাজপথ দিয়ে চলেছে। কারও মাথায় লেগে আছে জলজ উদ্ভিদের পাতা, ডালপালা। বুকপকেট থেকে ব্যাঙাচি লাফিয়ে পড়ছে। বুটে ঢুকে গেছে জলকাদা। মার্চ করার তালে তালে শব্দ করছে। সারা শহর ঝুঁকে পড়েছে এই বিচিত্র বাহিনী দেখার জন্যে। লেফট রাইট লেফট রাইট। লেফট রাইট বুজবুজ বুজবুজ। বুট নয় তো ডিসকো রেকর্ড।

॥ ৩৯ ॥

টুকটুকে লাল একটা গাড়ি, তার পেছনে ধপধপে সাদা একটা গাড়ি। সাদা গাড়িটার পেছনের কাচে ক্রস। লাল গাড়িটার ডানদিকের বনেটের পাশ দিয়ে লিকলিকিয়ে উঠেছে একটা অ্যান্টেনা। সামনের আসনের কাছে ওপর থেকে ঝুলছে একটা টেলিফোন ওয়্যারলেস।

লাল গাড়িতে এস. পি.। নিজেই চালাচ্ছেন। সাদা গাড়িতে ডা. মুখার্জি। যেখানে এই শহরের জলের পাম্প আর বিশাল সেই শিশুগাছ, মুখোমুখি সেইখানে দেখা হয়ে গেল অপূর্ব সেই পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে। কাদা মেখে ভূত। একজনের মাথার ওপর ডোবার পানা চলার তালে তালে দুলছে। কাদা ভরতি বুট বুজুর বুজুর শব্দ ছাড়ছে।

এস. পি. প্রথমে ভেবেছিলেন, 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' হচ্ছে। একটু চিন্তার পর ধারণাটা ঝেড়ে ফেললেন। এরা পুলিশ। তাঁরই বিখ্যাত পুলিশবাহিনী। রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালেন। দরজা খুলে নেমে, গলা উঁচিয়ে হাঁকলেন, "হল্ট।"

বাহিনী থামল না। এগিয়েই চলল। থামবে কী! সবাই তো ঘুমোচ্ছে। গত দু'রাত্রি ঘুম নেই। পাঁক জলে ভেজা ইউনিফর্ম। যত বাতাস লাগছে শরীর তত জুড়োচ্ছে। প্যারেড করা অভ্যাস। সেই অভ্যাসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেঁটে চলেছে। সোজা রাস্তা। পিচ ঢালা, মসৃণ।

এস. পি. আবার হাঁকলেন, "হল্ট।"

তখন তাঁর সামনে শেষ হাবিলদারটি। বেচারার ঘুম খুব পাতলা। আচমকা 'হল্ট' শুনে তার চটকা ভেঙে গেল। সে ভয়ে উলটোদিকে দৌড় মারল। তালের ঠিক ছিল না। সোজা গিয়ে শিশুগাছে ধাক্কা মেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "কাদের হল্ট বলছেন? সবাই তো ঘুমোচ্ছে। সারির প্রথম তিনজনের নাক ডাকছে।"

"এদের এই অবস্থা করলে কে? এমন পাঁকে পড়া মোষের অবস্থা?"

তিনি গটমট করে এগিয়ে গিয়ে সারির বিশালবপু প্রথম পুলিশটিকে হাতের আঙুল দিয়ে ভুঁড়িতে একটা খোঁচা মারলেন। আঙুলে জলকাদা লেগে গেল। মুখটা বাঁকালেন। বিরাট চিৎকার করে বললেন, "অ্যায়।"

সে কোনওরকমে চোখ খুলে বললে, "ক্যায়?"

এস. পি.-র খুব অপমান-ভাব জাগল। এস. পি.-কে বলছে, ক্যায়। স্যালুট ফ্যালুট নেই, কিচ্ছু নেই!

আবার বললেন, "অ্যাই।"

পুলিশ বললে, "ক্যাই?"

কেউ থেমে নেই। পুলিশের মিছিল চলেছে। এস. পি. পার্শে মার্চ করছেন। ডাক্তারবাবুও হাঁটছেন। ডাক্তারবাবু বলছেন, "ব্যর্থ চেষ্টা। এরা ফেটিডগ। ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে চলে গেছে। রাগ করবেন না।"

এস. পি. তখন দু'হাত দিয়ে পুলিশটিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তার ঘুম ছুটে গেল। চিনতে পারলে এস. পি.-কে। সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যাটেনশান'-এর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পেল্লায় এক স্যালুট ঠুকল।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম স্যার।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাওয়া হয়েছিল কোথায়? যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

"স্যার, থানায় যাচ্ছি।"

"থানা কোন দিকে বাবু?"

লোকটি হকচকিয়ে গেল। অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে তাকাল, "থানা তো এইদিকেই ছিল স্যার।"

এস. পি. এবার ভীষণ রেগে বললেন, "অ্যাবাউট টার্ন। ফরোয়ার্ড মার্চ।"

হয়েছিল কী! ঘুম-চোখে চার মোহনায় বাঁক নিতে ভুল করেছিল। তারপরে তো গভীর ঘুম। আগে চলেছে পাঁক-মাখা পুলিশের সার। তার পেছনে ধীরে চলেছে দু'খানা গাড়ি।

ডিকি কুকুরের চেনটা গারদের লোহার সঙ্গে বেঁধে, প্যান্টের পকেট থেকে একটা রবারের টুকরো বের করে তাঁর কুকুরকে চিবোতে দিলেন। রবারের টুকরোটা ঠিক একটা হাড়ের মতো দেখতে। ডিকির শেফার্ড ডগ মনের আনন্দে কাঁউ কাঁউ করে চিবোতে লাগল। গন্ধ শুঁকে চোর-বদমাশ ধরার বুদ্ধি আছে; কিন্তু গন্ধ শুঁকে হাড় কি রবার, বোঝার ক্ষমতা নেই। হায় ভগবান! কুকুরের কাণ্ড দেখো!

ডিকি মনে মনে এইসব ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরালেন। সকাল থেকে যা ঝামেলা গেল, এখন একটা সিগারেট পাওনা হয়েছে। চেয়ারে বসতে-না-বসতেই ঝনঝনিয়ে ফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো।"

"ডুমারাওগঞ্জ পি এস?"

"ইয়েস।"

"আর ইঞ্জিরি বলতে হবে না। খুব হয়েছে। জল ট্যাঙ্কির কাছে শিশুগাছের তলায় তোমাদের একজন পুলিশ চোখ উলটে পড়ে আছে যে গো।"

"সে আবার কী? মরে গেছে না বেঁচে আছে?"

"নাক দিয়ে কীরকম একটা শব্দ বেরোচ্ছে।"

"বুকটা ওঠানামা করছে কি?"

"অতশত বলতে পারব না। কাছে গিয়ে কে দেখবে? তারপর হঠাৎ উঠে যদি পেটাতে শুরু করে?"

"তুমি কে?"

"তা তো বলব না। আমি কি অত বোকা ছেলে! নাম বলে জেলে যাই আর কী?"

ফোন কেটে গেল। ডিকি সিগারেটে এক টান মেরে সক্‌লে শুনতে পায়, সেইরকম গলায় বললেন, "শহরটাকে দেখছি ভূতে ধরেছে। শিশুগাছের তলায় শুয়ে আছে বুড়ো পুলিশ।"

কমল ভৌমিক গারদের ভেতর থেকে বললেন, "একটা আয়না আছে ভাই। আয়না?"

ডিকি বললেন, "আয়না কী হবে? আয়নার বায়না করতে নেই, ছিঃ, এটা যে থানা!"

সেকেন্ড অফিসার করুণ মুখে ঘরে ঢুকলেন। বেশ বোঝাই যায়, কিছু একটা হয়েছে। চেয়ারে আধ-বসা হয়ে বললেন, "আপনার কাছে পেট-খারাপের দাওয়াই আছে?"

"আমার কাছে সিগারেট ছাড়া কিছুই নেই।"

"থানার মাঠে একটা বেলগাছ ছিল। গত বছর দুম করে কেটে দিলে।"

"কেটে দিলে কেন?? বেলগাছ শুনেছি কাটতে নেই।"

"আরে, সেই কাটার পর থেকেই তো যত গোলমাল হয়েছে।"

"এইমাত্র ফোন এসেছিল।"

সেকেন্ড অফিসারের চোখ বড় বড় হল, "কার? কার ফোন?"

"নাম বললে না; শুধু একটা সুসংবাদ দিলে।"

"পেয়েছে? পেয়ে গেছে?"

"কী পাবে?"

সেকেন্ড অফিসার সামলে গেলেন, "না, মানে, অনেকে অনেক সময় অনেক কিছু পায় তো!"

"পেয়েছে। গাছতলায় একটা পুলিশ কুড়িয়ে পেয়েছে।"

চার্চের সামনে গোলার শব মিছিল পৌঁছে গেছে। ফাদার টাইসন বেরিয়ে এলেন। ছোট একটা তামার পাত্র থেকে একটা তামার দণ্ড দিয়ে গোলার গায়ে

ছিটিয়ে দিলেন জর্ডন নদীর জল। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "In the Lord put I my trust; how say ye to my soul. Flee as a bird to your mountain?" আবার জল ছিটিয়ে দিলেন তিনবার।

খোলা কফিনে গোলা শুয়ে আছে ফুলের বিছানায়। মুখটুকু জেগে আছে। এবার যেন হাসি ফুটেছে মুখে। একটু পরে গোলাকে আর দেখা যাবে না। চলে যাবে মাটির তলায়। উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোর শেষ প্রহরী চলে গেল। বারো বছরের সুন্দর একটা জীবন শেষ হয়ে গেল।

সুকু চার্চের অফিসঘরে ঢুকে একটা কাগজে লিখল, 'গোলা, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসতুম। তুমি চলে গেলে, আমি রইলুম। তোমার সঙ্গে আবার যেন দেখা হয়।'

ফ্লোরিস্টের মেয়ে মেরী ফুলের মতো জামা পরে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুলের মতো সুকুর বয়সি একটি মেয়ে। কাঁধের পাশ দিয়ে মুখটা ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী লিখলে সুকুদা?"

সুকু ইংরেজি করে শোনাল। শোনাতে শোনাতে সুকুর চোখে জল এসে গেল। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে, উইলিয়ামসনের মেয়ের সমাধির পাশে বসে আছে গোলা। সে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার এনেছে। মা সব গুছিয়ে দিয়েছেন। ভাত, ভাল মাংস। গরমে গোলা এক বাটি দই খেত। গোলার কোনও লোভ ছিল না। সুকুকে সে ভীষণ ভালবাসত। গোলা লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসত। সামনের দুটো পা বুকের ওপর রেখে সুকুর সামনে উঠে দাঁড়াত। গোলার মুখ তখন চলে আসত সুকুর মুখের কাছে। সুকুল গাল দুটো চেটে দিয়ে নেমে দাঁড়াত। টিফিন ক্যারিয়ারটা নামিয়ে রেখে সুকু ঘাসের ওপর বসে পড়ত। গোলার মাথায়, গলায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিত। গোলা ছিল মানুষের চেয়েও পরিষ্কার। সে নিজে নিজেই চান করত। পেয়ারাপাতা চিবিয়ে দাঁত পরিষ্কার রাখত। সুকুর একবার জ্বর হয়েছিল, তখন খাবার আনতেন সুকুর মা। গোলাকে বলতেন, "ছেলেটা জ্বরে পড়ে আছে বাবা।" গোলা সেইসময় নিজে নিজেই সুকুকে দেখতে এসেছিল। সকলে অবাক। এমনও হয়। আরও অবাক কাণ্ড, উইলিয়ামসনের বাগানে তখনও গোলাপ ফুটত। গোলা মুখে করে বড় একটা সাদা গোলাপ এনেছিল। কাঁটার খোঁচায় নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সে দৃশ্য ভোলার নয়। সেই গোলাপটা এখনও আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের কৌটোয়। শুকিয়ে গেলেও গোলাপের আকৃতি গোলাপের মতোই আছে।

পুরনো সেইসব কথা চিন্তা করতে করতে সুকু আর-একবার কেঁদে ফেলল। সুকুর চোখে জল দেখে মেরিও কেঁদে ফেলেছে। মেরি সুকুকে ভীষণ ভালবাসে।

মনে মনে বলে, "আমার পাগলা দাদা।" মুখটা ঠিক যেন যিশুখ্রিস্টের মতো। চোখ দুটোয় সবসময় কেমন যেন একটা দুঃখ লেগে আছে। মেরি সুকুর গালে গাল ঠেকিয়ে বললে, "তুমি কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।"

ফাদার আমহার্স্ট ওপাশে বসে লিখছিলেন, তিনি শোকার্ত এই ছেলেমেয়ে দুটির ভালবাসা দেখে, আপন মনে বলে উঠলেন, "হেভন, হেভন।"

মেরি তার হাত থেকে টেনে টেনে ছোট্ট ছোট্ট চুড়ি দুটো খুলে ফেলল, তারপর সুকুর হাতে দিয়ে বললে, "তোমার ওই লেখাটার সঙ্গে এই চুড়ি দুটোও দিয়ে দাও দাদা। এই চুড়ি দুটো আমার খুব প্রিয়। গোলার সঙ্গে থাক।"

সুকু মেরির মুখের দিকে তাকাল। ফুলের মতো সুন্দর। দু'চোখে টলটল করছে জল। সুকু বললে, বাবা বকবেন।"

"না না, বাবা বকবে না। বাবা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। তোমাকেও খুব ভালবাসে।"

"আমি তা হলে আমার এই গলার লকেটটাও দিয়ে দিই?"

"না না, ওটা তো তোমার ঠাকুর।"

"তাতে কিছু হবে না। আমার ঠাকুর গোলারও ঠাকুর, তোমারও ঠাকুর।"

সুকু আর মেরি চার্চের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। শব মিছিল আবার চলতে শুরু করল। উইলিয়ামসনের বাংলো অনেকটা ভেঙে ফেলেছে, তবে বেশ কিছুটা আছে। বাড়িটাকে মাঝামাঝি জায়গা থেকে ফাটিয়ে দিয়েছে। আধখানা আছে, আধখানা মাটিতে। গেট দুটো আছে। মিছিল ঢুকে পড়ল বাগানে। সাহেবের মেয়ের সমাধিটা এখনও ঠিক আছে। সুকু অবাক হয়ে দেখল, মা দাঁড়িয়ে আছেন অনেক ফুল হাতে।

॥ ৪০ ॥

সেকেন্ড অফিসার আর একবার বাথরুমে যাবার চেষ্টা করছেন। ভিকি গজগজ করছেন, ''আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থানা পাহারা দাও।" কমল ভৌমিক আপন মনে গান ধরেছেন, "যত দিন যায় তত রাত বাড়ে।" যা মনে আসছে ভুলভাল তাই গেয়ে যাচ্ছেন। কী করবেন, এইভাবে ছোট্ট এক চিলতে একটা ঘরে আটকে থাকা যায়! অকারণে। তিনি ঠিক করেছেন চিল্লে থানা ফাটিয়ে দেবেন।

এমন সময় পরপর দু'খানা গাড়ি থানার কম্পাউন্ডে ঢুকল। সেকেন্ড

অফিসার এস. পি.'র গাড়ি চেনেন। গাড়িটা দেখেই তাঁর পেট ব্যথা কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা ভয় এল মনে। ইউনিফর্ম তো পরা নেই। পরে আছেন একটা তোয়ালে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে এছে মোটা পইতে। পইতেতে বাঁধা এক থোলা চাবি। হাতে একটা মাঝারি মাপের পেতলের ঘটি। পায়ে খড়ম। অসাধারণ পোশাক। ছুটে পালাবেন সে সময়ও আর নেই। এস. পি. নেমে পড়েছেন। গটমট করে এগিয়ে আসছেন। সেকেন্ড অফিসার সেই অবস্থায় স্যালুট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যা থাকে বরাতে।

এস. পি. সামনে এসে দাঁড়ালেন। আপাদমস্তক দেখে নিলেন একবার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হু আর ইউ। তুমি কে?"

সেকেন্ড অফিসার চোখ বুজিয়ে গড়গড় করে বলতে লাগলেন, "আমি সেকেন্ড অফিসার, একটু আগে ফার্স্ট অফিসার হয়েছি। আমি অন ডিউটিতে না অফ ডিউটিতে বলতে পারব না। আমার পেটের অবস্থা ভাল নয়। তাই আমি আপনার সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

এস. পি. এমন একটা ভাব করলেন, যেন মাথা ঘুরে গেল। ভিকি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এস. পি. বললেন, "ভিকি, তুমি এই পাগলকে চেনো?"

"আপনিও চেনেন স্যার, ওকে ইউনিফর্ম পরে আসতে বলুন। তখন চিনতে পারবেন। এ পাগল নয়, গোটা পুলিশ দফতর পাগল হয়ে গেছে।"

ডক্টর মুখার্জি এসে গেছেন। তিনিও এই অপরূপ দৃশ্য দেখে অবাক। এস. পি.-কে বললেন, "সেকেন্ড অফিসারকে কি কোনও সাজা দিয়েছেন?"

"না ডাক্তার, আমি কিছুই করিনি। এ সবই হচ্ছে ওর নিজের প্রতিভায়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওর স্যালুট যে আটকে গেছে। খোলার ব্যবস্থা করুন।"

এস. পি. বললেন, "যাও, খুব হয়েছে। ভেতরে গিয়ে একটু ভদ্র-সভ্য হয়ে এসো।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "আমি স্যার আর একবার যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"এই যে ঘটি হাতে মানুষ যেখানে যায়।"

এস. পি. বললেন, "গো।" এত জোরে বললেন যে, সেকেন্ড অফিসার প্রায় উড়তে উড়তে চলে গেলেন মাঠ পেরিয়ে সোজা সার সার ঘরের দিকে।

কমল ভৌমিক তখনও তারস্বরে গান গেয়ে চলেছেন, "ভেবে দেখ মন কেউ কারও নয়।" দেয়ালে পিঠ রেখে চোখ বুজিয়ে আপন মনে চিৎকার, "যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে...।"

এস. পি. গারদের সামনে দাঁড়িয়ে কমল ভৌমিককে খুব ভাল করে দেখলেন। কমল ভৌমিক কিছুই দেখছেন না। চোখ তো খোলা নেই, তা ছাড়া গান শুরু করলেই তাঁর ভাব এসে যায়। এস. পি. একটা ফাঁক খুঁজছেন। গানে একটা ফাঁক আসে তো! কমল ভৌমিকের গানে কোনও ফাঁকফোকর নেই। সলিড দেওয়ালের মতো চলেছে। বিশাল মালগাড়ির মতো। কমল ভৌমিকের দম তো সাংঘাতিক। একসময় কমল ভৌমিক ঢোঁক গেলার জন্যে একটু থামতেই এস. পি. চিৎকার করে বললেন, "কমল স্যার।"

কমল ভৌমিক তাকালেন। প্রথমে এস. পি.-কে ঠিক চিনতে পারলেন না, কবে সেই মাউন্ট আবুতে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। তা ছাড়া পেছনে চড়া আকাশ। চোখে আলো লাগায় এস. পি.-র মুখটা তেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। কালোমতো একটা কী?

এস. পি. বললেন, "চিনতে পারছেন না। আপনি আমাদের মাউন্ট আবুতে ট্রেনিং দিয়েছিলেন স্যার। আমি আপনার খুব প্রিয় ছিলুম। প্রিয় ছাত্র। আপনি আমাকে ফাস্টফুট বলে ডাকতেন।"

কমল ভৌমিক উঠে এলেন। এস. পি. আর ডাক্তারবাবুকে ভাল করে দেখলেন।

এস. পি. বললেন, "কী আশ্চর্য! আপনাকে ধরে এনেছে? কী করেছিলেন?"

"তার আগে বলুন, আপনি এখানে?"

"আপনার সঙ্গে তো আমার আপনির সম্পর্ক নয়। আপনি তো আমাকে তুমি বলতেন। আমি এখন এই ডিস্ট্রিক্টের এস. পি.।"

"বাবা, সে তো বিরাট পোস্ট। আর তো তুমি বলা যায় না। এক্ষুনি আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যে প্রশ্ন করেছিলেন, জ্ঞানত আমি কোনও অপরাধ করিনি। আমি কাল থেকে সাংঘাতিক অসুস্থ। ডাক্তারদাদার ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি বাঘের মতো ওই কুকুরটা এসে আমার গাল চাটছে। তারপর সব ছবির মতো হয়ে গেল। বিছানা থেকে হিড়হিড় করে টেনে তুললে, হাতে হাতকড়া পরালে, ভরে দিলে এই খাঁচায়।"

এস. পি. ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিকিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভিকি ব্যাপারটা কী?"

"আমি জানি না স্যার। আমি হুকুমের দাস। আমাকে একটা জামা ধরিয়ে দিয়ে বললে, আসামিকে ধরো।"

"কে বললে?"

"ফার্স্ট অফিসার।"

"কোথায় সেই ফার্স্ট অফিসার?"

"শুনেছি, সেকেন্ড অফিসারকে চার্জ হ্যান্ডওভার করে শিস দিতে দিতে বাড়ি চলে গেছে।"

"বাঃ, বহোত আচ্ছা। ডাকো সেকেন্ড অফিসারকে।"

সেকেন্ড অফিসার ইউনিফর্ম পরে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বাথরুমে যাবার সময় কানে পইতে তুলেছিলেন, নামাতে ভুলে গেছেন। এস. পি. বললেন, "হোয়াট ইজ দিস! এ আবার কী সাজ! সব ক'টাকে এবার আমি জামুরিয়ায় ট্রান্সফার করব।"

সেকেন্ড অফিসার তাঁর অপরাধ কী, বুঝতে পারছেন না। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, "প্রকৃতির ডাক। পেয়ে গেলে কী করব স্যার?"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "কান থেকে ওই কেলে পইতেটা নামান।"

সেকেন্ড অফিসার তাড়াতাড়ি পইতে নামালেন। সেটা জামার বাইরে বুকের কাছে দুলতে লাগল।

এস. পি. বললেন, "কার হুকুমে এঁকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?"

"আমি জানি না স্যার। ফার্স্ট অফিসার করিয়েছেন।"

খুব চালাক। জানেন সব। কিছুই বললেন না।

এস. পি. বললেন, "অ্যারেস্ট ফার্স্ট অফিসার।"

"কাকে দিয়ে করাব স্যার? আমার ফোর্স যে বাইরে।"

বলতে বলতেই সে বিচিত্র কাদা-মাখা, ঘুমন্ত পুলিশবাহিনী লাইন দিয়ে থানার কম্পাউন্ডে ঢুকল। সে এক দৃশ্য। চিফ হাবিলদার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলছেন, "লেফট রাইট, রাইট লেফট।" থামার আর নাম নেই। থানার উঁচু রকে ঠোক্কর খেয়ে উলটে পড়তে পড়তে থেমে পড়ল। পেছনে যারা ছিল, তারা একজন আর একজনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এস. পি. বললেন, "ব্যাপারটা কী? এরা পাঁক ফাঁক মেখে কোথা থেকে উঠে এল?"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "ওরা জঙ্গল ডিউটিতে ছিল স্যার।"

"আর তোমরা কোথায় ছিলে?"

"আমরাও ছিলুম স্যার।"

"এদের ফেলে পালিয়ে এসেছিলে?"

"নো স্যার। নেভার স্যার।"

সেকেন্ড অফিসারের গলা শুকিয়ে আসছে। সত্য ঘটনা, এইবার বুঝি বেরিয়ে পড়ে।

এস. পি. চিফ হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যায়, তোমরা ছিলে কোথায়? এই অবস্থা হল কী করে?"

হাবিলদার অতি কষ্টে, ঘুম-জড়ানো গলায় বললে, "ওই বড়বাবু আর ছোটবাবুকে জিজ্ঞেস করুন স্যার। আমাদের একেবারে মেরে ফেলেছে স্যার।"

ভিকি বললেন, "এইমাত্র ফোন এসেছিল স্যার, একজন পুলিশ জলট্যাঙ্কির কাছে, কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় পড়ে আছে।"

"বাঃ বাঃ, খুব সুন্দর! আমি আই জি-কে ফোনে সব জানাই।"

সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, "গারদ খুলে, ওঁকে বের করে দাও।"

সেকেন্ড অফিসার চমকে উঠলেন, মরেছে। চাবি! চাবি কোথায়। চাবির গোছা বাথরুমে পড়ে আছে।

"আই অ্যাম কামিং স্যার।" তিনি ছুটলেন। বাথরুমের দিকে।

চাঁদপাল গর্ত খুঁড়ছে। গোলা এইবার চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে। একপাশে সুকু, একপাশে চাঁদপাল। কোমর পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। গর্তের তলায় ফুল আর দেবদারু পাতা বিছানো হল। তার ওপর ধীরে ধীরে নেমে এল গোলার কফিন। প্রথমে প্রত্যেকেই এক মুঠো করে মাটি ফেলল। তারপর সুকু আর চাঁদপাল হুড়হুড় করে মাটি ফেলে গর্ত ভরাট করল। তার ওপর পোঁতা হল একটি গোলাপের চারা। রাজ্যেশ্বরী দেবী একে একে সব ফুল সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। মনে মনে বললেন, "মে হিজ সোল রেস্ট ইন পিস।"

এইসব যখন হচ্ছে, তখন একপাশে মোটা একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি লোক দেখছে আর আপন মনে গোটা একটা আপেলে কষকষ কামড় বসাচ্ছে। ভোলেভালে সাদাসিধে একজন ভদ্রলোক। চমৎকার মুগুর-ভাজা চেহারা। লম্বা-চওড়া। লোকটির মুখে বিচিত্র একটা হাসি। একজন ডেকে জিজ্ঞেস করল, "সমাধির ওপর একটা কিছু হবে তো ভাই?"

"সে তো আমি জানি না। ওই খোকাবাবু জানে।"

সে সুকুকে দেখিয়ে দিল।

আপেল চিবোতে চিবোতে লোকটি বললে, "ও, ওই ছেলেটিকে আমি চিনি। ডাক্তারবাবুর ছেলে। তা হলে দেখবে খুব ভাল একটা সমাধি-মন্দির তৈরি হবে। সাংঘাতিক ভাল ছেলে।" এই বলে লোকটি এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে গোটা একটি আপেল বের করে সমাধির ওপর রাখল।

আপেলটা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর দুটি সাংঘাতিক চেহারার লোক ছুটে এসে দু'জনে দু'দিক থেকে চেপে ধরল। যে লোকটি আপেল খাচ্ছিল, সে বলল, "এটা কী নকশা হচ্ছে বাবা। তোমাদের তো চিনলুম না ভাই!"

"আমরা বড়াবাঙ্কি পুলিশ স্টেশনের স্পেশাল পুলিশ।"

লোকটি হাহা করে হেসে বললে, "দেশের কী অবস্থা রে ভাই! পুলিশ পুলিশ ধরছে। জানতে পারি, আমার অপরাধটা কী?"

"এস. পি. সাহেবের হুকুম, পাকাড়কে লে আও।"

"জানতুম রে ভাই, আমাকে ছাড়া ডুমরাওগঞ্জে পুলিশ স্টেশন অচল।"

লোকটি ছিল, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সেই ফার্স্ট অফিসার। তিনি হুঁ হুঁ করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললেন, অনেক দূরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা জিপের দিকে। ঢালু বেয়ে রাস্তায় ওঠার সময় ফার্স্ট অফিসার বললেন, "আমি যদি এখন পাগলের মতো ছুটতে শুরু করি, তা হলে কেমন হয়?"

"খুব ভাল হয়, কারণ আমাদের কোমরের রিভলভার বহুদিন অকেজো হয়ে আছে। আমরা পা তাক করে ঠাঁই ঠাঁই দু'-তিন রাউন্ড গুলি চালাব।"

"তা হলে তাই চালাও," বলে ফার্স্ট অফিসার তিরবেগে ছুটে গেলেন বাঁ পাশের জঙ্গলের দিকে। বড়াবাঙ্কি পুলিশ স্টেশনের অফিসার দু'জন খাপ থেকে রিভলভার টেনে বের করতে করতেই ফার্স্ট অফিসার খরগোশের মতো ছুটে, পাথর, ঝোপঝাড় টপকে গভীর জঙ্গলে। সেখানে একটা শিশুগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে কংসের মতো প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হাসলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস বড়াবাঙ্কিই হোক আর ডুমরাওগঞ্জেই হোক কারও ক্ষমতা নেই তাঁকে ধরে। এই ডিস্ট্রিক্টের পুলিশের যা অবস্থা। কোথাও যাব বলে বেরোননি; তাই তিনি মনের আনন্দে হাঁটতে লাগলেন। কখনও গাছের ডাল ভাঙছেন। কখনও আগাছা সরাচ্ছেন। কখনও পাথর তুলে ঝোপেঝাড়ে মারছেন। উঃ, কী আনন্দ! একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক গিরগিটি। গায়ে কুমিরের মতো কাঁটা। খাড়া খাড়া হয়ে আছে। ফার্স্ট অফিসার যেই 'হুই' করলেন, গিরিগিটির রং সবুজ থেকে লাল হয়ে গেল। কান দুটো খাড়া খাড়া হয়ে গেল। মুখের দুটো পাশ ফুলছে। গিরগিটিটা পালাল না। বরং তার লেজটা শক্ত হল। ফার্স্ট অফিসার এতটা আশা করেননি, গিরগিটি তাঁর চোখ লক্ষ্য করে মারল এক লাফ। ফার্স্ট অফিসারের পুলিশি ট্রেনিং। টপ করে ঠিক সময়ে বসে পড়লেন। জন্তুটা মাথার ওপর দিয়ে পেছনের ঝোপে গিয়ে পড়ল। ফার্স্ট অফিসার উঠে দাঁড়ালেন। গিরগিটিটা আর ফিরে এল না। ঝোপের কাছে গিয়ে বারকতক, "আ যাও, আ যাও" বললেন। কিছুই হল না। তখন হতাশ হয়ে বললেন, "যাঃ, হারিয়ে গেল।"

ওদিকে বড়াবাঙ্কি পুলিশ স্টেশনের অফিসার দু'জন রিভলভার হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। জঙ্গলে ঢোকার সাহস হল না। দুই অফিসারে খানিক তর্কাতর্কি হল। ঢোকা উচিত কি উচিত নয়। একজন

বললেন, "জলের যেমন আলাদা পুলিশ আছে, জঙ্গলেরও সেইরকম আলাদা পুলিশ আছে।" তখন দু'জনে জিপে ফিরে এসে ওয়্যারলেসে খবর পাঠাতে লাগলেন, "হ্যালো, হ্যালো, জিরো ওয়ান নাইন টেন, গ্লাস, ব্রিটল গ্লাস, বেঞ্জামিন এসকেপড। ব্রিটল গ্লাস, ব্রিটল গ্লাস।"

॥ ৪১ ॥

ফার্স্ট অফিসার ডুমরাওগঞ্জের অনেক কিছুই জানেন। জানেন না জঙ্গলের খবর। কোথায় কী আছে, কোন দিক থেকে কোন দিকে গেছে। ভেতরে কোথায় কী নদীনালা আছে! পরিত্যক্ত কোনও মন্দির আছে কি না! কোনও আদ্যিকালের ভাঙা জমিদারবাড়ি আছে কি না। ফার্স্ট অফিসার কিছুই জানেন না। তিনি প্রথমে খুব খানিকটা ছুটলেন, তারপর জঙ্গল যেই গভীর হয়ে এল ছোটা বন্ধ করে ধীরে ধীরে হাঁটা ধরলেন। গাছের ডালপালা বাঁচিয়ে। খোঁচাখুঁচি এড়িয়ে। বেশ কিছুটা হাঁটার পর মনে হল, এরপর কোথায় যাব। সেই নদীটা যদি পাই তা হলে সাঁতার কেটে চলে যাব নদীর ওপারে। ওপারটা হল ডুমরাওগঞ্জ থানার বাইরে। জঙ্গল মহল। কোনও আইনকানুন নেই। নীল পাহাড় পেরিয়ে চলে যাব আরও দূরে। পালামৌ জেলায়। তখন আর আমাকে পায় কে। এত বড় বড় দাড়ি রাখব। আঃ, আমি স্বাধীন। আমি স্বাধীন।

আরে, জঙ্গলের মধ্যে কতকালের একটা ভাঙা মন্দির। ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। আষ্টেপৃষ্ঠে গাছপালা জড়িয়ে আছে। কটর কটর করে কী একটা ডাকছে। টিকুস টিকুস করে ডাকছে একটা পাখি। এটা মনে হয় সেই বিখ্যাত ডাকাত কালীর মন্দির। যেখানে নরবলি হত। এই মন্দিরের কথা বহুবার শুনেছেন। সেটা এইখানে।

একবার উঁকি মেরে দেখার ইচ্ছে হল। মা-কালীর মূর্তি যদি থেকেই থাকে, তা হলে ভাল করে প্রণাম করবেন। ভাঙা সিঁড়ির ধাপগুলো কেউ পরিষ্কার করেছে। নিশ্চয় এখানে মানুষ আসে। একপাশে পড়ে আছে ডালপাতা-পোড়ানো ছাই। কাঠকয়লা। অবশ্যই এখানে মানুষ আসে; আর সে-মানুষ হল ডাকাত। বেশ ভয় ভয় করছে। এখন তো আর পুলিশ নয়। সাধারণ মানুষ। ইউনিফর্ম নেই। রিভলভার নেই। ভয় তো করবেই। ভেতরে যদি নরমুণ্ড গড়াগড়ি খায় তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ফার্স্ট অফিসার সাহস করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেন। সে একেবারে ভেঙেচুরে কেমন হয়ে গেছে। অন্ধকার মতো। বাইরের আলো থেকে এসে

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এইটুকু বোঝা গেল, মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। বেদির ওপর বেঁটে মতো দাড়িওয়ালা কে একজন বসে মনের সুখে সিগারেট টানছে।

ফার্স্ট অফিসার প্রশ্ন করলেন, "কে বটে?"

লোকটি ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পালটা প্রশ্ন করল, "তুমি কে বটে?"

"আমি ডুমরাওগঞ্জ থানার ফার্স্ট অফিসার।"

উত্তর শুনেই বেঁটে মতো লোকটি ঝপাত করে একটা রিভলভার তুলে তাক করল।

ফার্স্ট অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমি একসময় ফার্স্ট অফিসার ছিলুম। এখন নিজেই পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তোমার ওই মানুষ-মারা যন্ত্রটা নামাও। আমার বিচ্ছিরি লাগছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, পলাতক এক আসামি। পরিচয়টা শুনি।"

লোকটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। হাসতে হাসতে বললে, "দুনিয়ার কী অবস্থা রে ভাই, একসময় পুলিশের ভয়ে চোর পালাত; এখন পুলিশের ভয়ে পুলিশ পালায়। কী করেছিলে চাঁদ?" লোকটির চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় রাগ হচ্ছে। কিছু করার নেই। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেদির ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। রাগ চেপে ফার্স্ট অফিসার বললেন, "আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি একটু অন্যায় করে ফেলেছিলুম। হনুমানে আমার রিভলভার নিয়ে পালিয়েছে। বেল্ট আর রিভলভার একসঙ্গে ছিনতাই। তা হনুমানকে তো আর অ্যারেস্ট করা যায় না। সব হনুমানই একরকম দেখতে। বুঝলে, হনুমানদের এই একটা সুবিধে। সব একরকম দেখতে।"

লোকটি সিগারেটের শেষ অংশটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "তা যা বলেছ। তবে ভগবানের কী কৃপা দেখো, এই রিভলভারটা তোমার। আমার একটা রিভলভারের খুব দরকার ছিল। কেমন পাইয়ে দিলেন। এখন এইটে দিয়ে তোমার খুলিটা আমি উড়িয়ে দিতে পারি।"

"দেখি, দেখি, রিভলভারটা আমার কি না দেখি। দেখলেই আমি চিনতে পারব।"

"খুব চালাক, তাই না। আমার নাম বেঁটে কালু। লোকে আমায় বেঁটে বলে।"

"তুমি সেই বিখ্যাত বেঁটে? তোমাকে তো ধরে চিড়িয়াখানায় ভরা হয়েছিল!"

"ভরা হয়েছিল ঠিকই। তোমাদের কাজ তোমরা করেছিলে, আমার কাজ আমি করলুম। এই আর কী।"

"তা দেখো, তুমিও অপরাধী, আমিও অপরাধী। আমরা দু'জনে বন্ধু। তোমার তো ভাই খুব নাম! আমার চেয়েও বেশি নাম। তা এসো, আমরা দু'জনে মিলে একটা দল করি।"

"কী দল? চুরি-ডাকাতির দল!"

"আরে না। আমরা দু'জনে গোয়েন্দা হয়ে যাব। বিশাল বড় গোয়েন্দা। তোমার তো দাড়ি হয়েই গেছে। এক মাসের মধ্যে আমারও হয়ে যাবে। আমরা দু'জনে কলকাতা চলে যাব। সেখানে গিয়ে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলব। বড় বড় কেস হাতে নেব। আমি শার্লক হোমস, তুমি ওয়াটসন। ইতিহাসে আমাদের নাম থেকে যাবে।"

"তোমার ক্যারাটে, কুংফু জানা আছে?"

"থোড়া থোড়া।"

"তা হলে হয়ে যাক এক হাত।"

"হয়ে যাক।"

দু'জনে বেরিয়ে এলেন জঙ্গলে ফাঁকা জায়গায়। ফার্স্ট অফিসার বললেন, "গোয়েন্দা হতে গেলে কি ক্যারাটে, কুংফু জানা দরকার?"

"অবশ্যই দরকার। আমার মতো অপরাধীকে ধরবে কী করে? নাও স্টার্ট।"

"অনেক দিন অভ্যাস নেই। আজ থাক না ভাই।"

ফার্স্ট অফিসারের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বেঁটে, 'ইয়াআ' বলে একটা চিৎকার ছেড়ে জমি থেকে পাঁচ-ছ' হাত ওপরে লাফিয়ে উঠল। ফার্স্ট অফিসার সুট করে তার পায়ের তলা দিয়ে গলে গেলেন। বেঁটে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল। নাকটা থেঁতো হয়ে গেছে। বেঁটে উঠে বসার আগেই ফার্স্ট অফিসার 'ইয়াহু' বলে একটা চিৎকার করে বেঁটের চোয়ালে এক লাথি। বেঁটে আঁক করে অজ্ঞান।

ফার্স্ট অফিসার বেঁটের কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নিলেন। তাঁর প্ল্যান পালটে গেল। বেঁটের জ্ঞান ফেরার আগেই তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললেন। গত দশটা বছর তুমি আমাকে বহুত ভুগিয়েছ। আজ তোমার একদিন কি আর আমার একদিন। বেঁটের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়েই দেখলে ফার্স্ট অফিসার তার দিকে রিভলভার তাক করে বসে আছে।

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "ওঠো শিশু মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ। উঠে পড়ো। অনেক জ্বালিয়েছ। আমি তোমার জন্যেই আবার পুলিশে ফিরে যাব বৎস। তুমি হবে আমার পুলিশ জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রফি। নাও ওঠো। দেখেছ, আমার হাতে কী! মাথায় পরপর ছ'টা ফুটো জমিয়ে দেব। আলো-বাতাস খেলার পক্ষে ভালই হবে।"

বেঁটে ধীরেসুস্থে উঠে বসল। গাছের গুঁড়িতে আয়েশ করে হেলান দিয়ে বললে, "বাবু, একটাই ভুল করলে, তোমার ওই রিভলভারে একটাও গুলি নেই। সব হনুমানে শেষ করে দিয়েছে। বাবু, এইবার যে আমার সঙ্গে লড়তে হবে। ওই যন্ত্রটা আমার চাই। প্রথমবার তুমি আমায় কাবু করেছ ঠিকই, ক্যারাটে আমি প্রথম শিখছি তাই। কুস্তি হল আমার লাইন। মারব আড়াই প্যাঁচ আর উঠতে হবে না। তারপর কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রেখে দেব। এ-জঙ্গলে রোজ রাতে গোটা দুই বাঘ নেমে আসে নীল পাহাড় থেকে। তারা খুব খুশি হবে। এমন টাটকা মানুষ তারা অনেক দিন খায়নি।"

ফার্স্ট অফিসার রিভলভারটা খুললেন। চেম্বারে একটাও গুলি নেই। রিভলভারটা জামার পকেটে রেখে এপাশে-ওপাশে খোঁজাখুঁজি করে একগাদা লতাপাতা নিয়ে এলেন টানাটানি করে। খুশির মেজাজে গান গাইছেন গুনগুন সুরে। বেঁটের হাত দুটো ভাগ্যিস পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিলেন আগেই।

বেঁটে হল দিশি গুন্ডা, তবে বিলিতি সিনেমা টিনেমা দেখেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বিলিতি গুন্ডারা পাথরে বা গাছের গুঁড়িতে হাত ঘষে ঘষে বাঁধন খুলে ফেলে। ফেলে এমনভাবে বসে থাকে যেন হাত বাঁধাই আছে। কত অসহায়। তারপর যেই না কাছে এল, মারল গদাম করে এক ঘুসি। বেঁটে সেই চেষ্টাই করতে লাগল। গাছের গুঁড়িতে হাত ঘষে যাচ্ছে। এমন তেলা গাছ, বিশেষ কোনও কাজ হচ্ছে বলে মনে হল না। বেঁটে ভাবছে, লোকটা দড়ি পেল কোথা থেকে! তারপর মনে পড়ল, ওই ভাঙা মন্দিরের ভেতরে নিজের ফাঁস নিজেই মজুত করে রেখেছিল। এই জঙ্গলে খুব খরগোশ আছে। ফাঁদ পেতে খরগোশ ধরবে বলে তিন মাইল হেঁটে গিয়ে দড়ি জোগাড় করেছিল। সেই দড়ি এখন ফাঁস হয়ে হাতে চেপে বসেছে। রাগে ইচ্ছে করছে নিজের গালে নিজেই চড় মারে। আর চড়! হাত দুটো মোক্ষম করে বেঁধেছে। পুলিশের বাঁধন।

ফার্স্ট অফিসার লতাপাতা দিয়ে বেঁটেকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেশ জমিয়ে বেঁধে ফেললেন। মানে এমন বাঁধা যে খুলতেই তিন-চার ঘণ্টা লেগে যাবে। বাঁধা শেষ করে দূর থেকে কিছুক্ষণ দেখলেন। দেখে নিজেই নিজের কাজের খুব তারিফ করলেন। বেশ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে। হাসতে হাসতে বললেন, "দেশলাইটা কোথায় রেখেছ কালুবাবু! একটু আগুনের ছোঁয়া দিয়ে দেখি, কেমন জ্বলতে পারো। বেশ একটু গরম লাগবে প্রথমটায় তারপর দেখবে বেশ আরাম লাগছে।"

ফার্স্ট অফিসার অনেক শুকনো পাতা জড়ো করে বেঁটের গায়ে চাপিয়ে দিলেন, "নাও, এবার একটু পাতা-চাপা হয়ে থাকো। আমি আমার ফোর্স নিয়ে আসি। ডুমরাওগঞ্জকে তুমি অনেক ভুগিয়েছ, অনেকবার কলা দেখিয়েছ। বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার আমি তব বধিব পরান।"

"মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা অপরাধ। তোমাকে পুলিশে ধরবে। ফাঁসি হয়ে যাবে।"

"আমি তো তোমাকে পুরো মারব না, একটু টোস্ট করে দেব। আমি আসছি। তুমি তোমার ভগবানকে স্মরণ করো।"

অফিসার যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন। আর ভয় কী! এইবার বুক ফুলিয়ে, এস. পি., আই. জি. কমিশনারের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ এসে গেছে। যার জন্য জঙ্গল ঘেরাও করা, সে এখন কচি পাঁঠার মতো গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। কারও বোঝারও উপায় নেই। পাতা দিয়ে চাপা দিয়ে এসেছেন। যে-রিভলভার হারিয়ে গিয়েছিল সেই রিভলভার এখন তাঁর জামার পকেটে। অফিসার গুনগুন গাইছেন, আর আমাকে পায় কে রে ভাই। আর আমাকে পায় কে।

এস. পি. সেকেন্ড অফিসারকে এক দাবড়ানি দিলেন, "সরকারি চাবি আজকাল বুঝি বাথরুমে রাখেন?"

"না স্যার, হারিয়ে ফেলার ভয়ে পইতেতে বাঁধা ছিল। তারপর আমাকে ওই যেতে হল, তখন।"

"নিন, চাবি খুলুন। চাবি খুলে আমার স্যারকে বের করে দিন।"

কমল স্যার হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে এস. পি-কে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সব ঠিকঠাক চলছে তো? প্র্যাকটিস হচ্ছে?"

"প্র্যাকটিস আর হবে কী করে। চাকরির জন্যেই তো ছিল সব। আর সময় পাই না স্যার!"

"এই তোমাদের দোষ! কষ্ট করে শেখো অভ্যাস রাখো না। সব নষ্ট হয়ে যায়। এইসব বিদ্যা কত কষ্ট করে মানুষকে শিখতে হয়।

আমি একেবারে ছাড়িনি। এখনও ঘণ্টাখানেক করি। শ্যাডো ফাইটিং আর বুল ফাইটিং।"

"বুল ফাইটিং তো শেখাইনি তোমাকে।"

"ওটা আমি স্পেনে গিয়ে শিখে এসেছি"—

"তা হলে তুমি আমার কাছে রাইনো ফাইটিংটা শেখো। সারা পৃথিবীতে ওটা একমাত্র আমিই জানি।"

"গন্ডারের সঙ্গে লড়াই অসম্ভব ব্যাপার, অসম্ভব!"

"পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কাজিরাঙা ফরেস্টে আমার গুরু বেঁচে আছেন। তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি।"

"অবশ্যই যাব, তবে গন্ডারের সঙ্গে লড়ে কী হবে? গন্ডারের সঙ্গে তো সহসা দেখা হয় না।"

"আহা, এ সবই তো মানুষ করে স্পোর্টস হিসাবে।" এস. পি. সেকেন্ড অফিসারকে ডেকে বললেন, "আমি সমস্ত ঘটনা জানতে চাই। এই সাতদিন কী হয়েছে, থানা কেন খালি পড়ে ছিল? কোথা থেকে এল এই এতগুলো কাদামাখা পুলিশ, কেন অ্যারেস্ট করা হল কমল স্যারকে? কাম আউট দ্য ট্রুথ।"

সেকেন্ড অফিসার গড়গড় করে সব বলে গেলেন। যা-যা হয়েছিল। হনুমানের রিভলভার নিয়ে পালানো পর্যন্ত। থানায় একটা জিপ এসে ঢুকল। দু'জন অফিসার নেমে এলেন। অফিসে ঢুকে তাঁরা এস. পি-কে স্যালুট করে বললেন, "স্যার, ফার্স্ট অফিসার পালিয়ে গেছে। গিয়ে ঢুকেছে গভীর জঙ্গলে।"

এস. পি. উঠে দাঁড়ালেন, "ওকে যেভাবেই হোক অ্যারেস্ট করতে হবে। ওই ভদ্রলোক আমাদের ডুমরাওগঞ্জ পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এনিমি নাম্বার ওয়ান। লেটস গো।"

পরপর দুটি গাড়ি হুহু করে বেরিয়ে এল থানা থেকে। ব্লু হিল রোড ধরে ছুটল জঙ্গলের দিকে। ওদিকে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যে পুলিশটি উলটে চিতপাত হয়ে জলট্যাঙ্কির উলটো দিকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল তাকে কুকুরে লাথি মেরে তুলে দিয়েছে। সে উঠেই গাছের একটা কচি ডাল ভেঙে দাঁতন করতে আরম্ভ করেছে। বেলা শেষের আলো দেখে তার মনে হয়েছে ভোর হল। দাঁতন আর থুতু একই সঙ্গে চলেছে। এস. পি. গাড়িতে বসে দৃশ্যটা দেখে বললেন, "ওটা আবার কে? থামাও, থামাও, গাড়ি থামাও।"

ঘ্যাঁস করে গাড়ি ব্রেক কষল। দু'জন অফিসার নেমে গিয়ে হাত ধরে তাকে তুললেন, "ওঠো, এখানে কী হচ্ছে?"

"কী আবার হবে। ভোর হল তাই দাঁতটাত মাজছি।"

"এইবার চলো এস. পি. সাহেব তোমাকে মাজবেন। বিকেলবেলা ডিউটি ছেড়ে দাঁতন। কার ট্রেনিং, কেমন ট্রেনিং বুঝবে এইবার।"

৪২

গোলাকে সমাধি দেওয়া হয়ে গেল। সুকুর মা রাজ্যেশ্বরী দেবী গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল সাজিয়ে দিলেন সমাধির ওপর। তারপর দুই ছেলেকে বললেন, "চলো, এবার আমরা বাড়ি যাই। ওদিকে তো আবার সব গোলমাল হয়ে গেছে। কমলবাবুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। সুদর্শনবাবু আবার কী করছেন কে জানে!"

চাঁদপাল বললে, "আমি তা হলে নিতুকে নিয়ে আমার ডেরায় চলে যাই।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "নিতু, তুই কেন বাবা অমন করছিস। চল না, আমাদের সঙ্গে। তোর মতো একটা ছেলে পেয়ে হারাব!"

নিতু অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে তার জল এসে গেছে। মাথা নিচু করে বললে, "আমি খুব অপয়া। আমি যেখানেই থাকব, সেইখানেই একটা কিছু হবে। আমি চাঁদপালদার সঙ্গেও যাব না।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "তা হলে তুমি কোথায় যাবে?".

নিতু জানে না কোথায় যাবে! সে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "তোমার মাথায় এইসব কে ঢুকিয়েছে, পয়া-অপয়া? মায়ের কাছে সব ছেলেই পয়া।"

চাঁদপাল বললেন, "ছেলেটাকে বেশ করে তেল মাখিয়ে নদীতে স্নান করাতে হবে। ওর পেট গরম হয়ে গেছে। ওকে দিনকতক আমার হাতেই ছেড়ে দিন।"

"আমি যে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চাই, চাঁদপাল।"

"আমিও তো তাই চাই মা। স্বাধীন দেশের সব ছেলেমেয়েকেই লেখাপড়া শিখতে হবে মা। আপনি জানেন আমি একটা স্কুল করেছি। সেই স্কুলে তিনশো ছেলেমেয়ে পড়ে।"

"আমি জানি চাঁদপাল। তোমার ওখানে সব আছে চাঁদপাল, কেবল নেই আমি। ছেলেটার একজন মা চাই।"

"হ্যাঁ সে আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আমি চাইছি মাসখানেক ওকে পিটিয়ে সোজা করে আপনার হাতে তুলে দিতে।"

চাঁদপালের কথা শুনে নিতু ছুটে এসে রাজ্যেশ্বরীর কোমর জড়িয়ে ধরে 'মা, মা' বলে কেঁদে ফেলল।

সবাই চুপ। চাঁদপাল অবাক। রাজ্যেশ্বরী নিতুকে দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখেও জল এসে গেছে। ছেলেটিকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছেন। ফুটফুটে এতটুকু ছেলে। নিষ্ঠুর মামা জোর করে মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দিয়েছেন। একটি মাত্র ডোরাকাটা জামা আর একটি মাত্র প্যান্ট যার সম্বল। ছেলেটা কী চমৎকার গান গায়। অনেকটা সুকুর মতো দেখতে।

সুকু এগিয়ে এসে নিতুর মাথায় হাত রেখে বলল, "নিতুভাই চলো, বাড়ি চলো।"

চাঁদপাল বললে, "এক কথায় মা ছেলেকে কেমন মিলিয়ে দিলুম বলো!"

সবাই চিৎকার করে বললে, "জয়, চাঁদপালের জয়।"

আবার ব্যান্ড বেজে উঠল, টিপপপুর, টিপ্‌পুর। চাঁদপালের দল এগিয়ে চলল। রাজ্যেশ্বরী তাঁর ছেলেদের নিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠলেন, আর ঠিক তখনই এস. পি. আর ডাক্তার মুখার্জির গাড়ি এগিয়ে এল। তাঁরা থানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেই ফার্স্ট অফিসারের খোঁজে। তাকে ধরতেই হবে। ছাড়া চলবে না। তার কাছে সার্ভিস রিভলভার। ডুমরাওগঞ্জের পুরো পুলিশবাহিনীকে সেই অপদার্থটা নাকানিচোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। তার জন্যে নিরীহ কমল ভৌমিককে হাজতবাস করতে হয়েছে। এস. পি. সাংঘাতিক রেগে গেছেন। হাতের কাছে সেই অফিসারকে একবার পেলে হয়।

ডাক্তারবাবু গাড়ি থামিয়ে রাজ্যেশ্বরী আর ছেলেদের তুলে নিলেন পেছনের আসনে। কমল ভৌমিক সামনে ডাক্তারবাবুর পাশে বসে আছেন। তিনি অনেকটা চুপসে গেছেন। সেই লাল-কালো রঙিন আর নেই। আবার তাঁর স্বাভাবিক রং ফিরে এসেছে। কমল ভৌমিক ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের চারজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মামার বাড়ি থেকে ঘুরে এলুম।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "কী কাণ্ড বলুন তো! আপনার কত কষ্ট হল। হঠাৎ পুলিশ কুকুর আপনাকে ধরল কেন? কুকুরটার কি কোনও বুদ্ধি নেই?"

"কুকুরের আর দোষ কী বউদি। কুকুর তো মানুষ নয়। দোষ আমার। নদীতে নামার আগে জঙ্গলে গাছের ডালে জামাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। সেই জামা শুঁকে কুকুর এসে আমাকে ধরেছে।"

এস. পি-র গাড়ি আগে আগে যাচ্ছে। তিনি হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, "ওই যে, ওই যে। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের কালপ্রিট। অ্যারেস্ট হিম। অ্যারেস্ট হিম।"

দু'দিকের দরজা খুলে দু'জন রক্ষী পথের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তাদের আবার অনেক কায়দা। দু'জনেই আকাশের দিকে বন্দুক তাগ করে দু'বার ফায়ার করল, ধাঁই, ধাঁই। ফার্স্ট অফিসার যেমন ছুটছিলেন সেইরকমই ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসতে লাগলেন। কিছুমাত্র ভয় পেলেন না। তিনি তো এইটাই চাইছিলেন। অত বড় একটা শিকার জঙ্গলে পাতা চাপা দিয়ে রেখে এসেছেন।

ফার্স্ট অফিসার প্রথমে চটি পায়ে ছুটছিলেন। বুট পরা অভ্যাস। আধমাইল দৌড়োতে না দৌড়োতে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। এখন চটি দু'পাটি বগলে। সেই অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে এস. পি-র গাড়ির সামনে এসে জবরদস্ত একটা স্যালুট ঠুকলেন।

স্যালুট করলে স্যালুট ফেরত দিতে হয়। ইংরেজি নিয়ম। এস. পি. হাঁকলেন, "অ্যারেস্ট হিম।"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "আমাকে পরে অ্যারেস্ট করবেন স্যার। আগে আপনি বেঁটে কালুকে অ্যারেস্ট করুন। আমি একা তাকে ওভারপাওয়ার করে জঙ্গলে বেঁধে রেখে এসেছি। সেই বেঁটে কালু আমাদের ডুমরাওগঞ্জের টেরার। গত তিন বছর আমরা যাকে চেজ করছি। ধরেও যাকে ধরা যাচ্ছিল না।"

"বেঁটে কালু! সেই ধূর্ত শয়তান! যে গত বছর ডুমরাওগঞ্জের নবাবের বাড়ির জহরত চুরি করেছিল!"

"ইয়েস স্যার, সেই বেঁটে কালু এখন আমার গ্রিপে। আমি একা সেই কাজ করেছি।"

"হোয়্যার ইজ ইয়োর রিভলভার? আপনার রিভলভার?"

"আ, হিয়ার ইজ মাই রিভলভার।"

ফার্স্ট রিভলভার বের করে দেখালেন। এস. পি. একটু দমে গেলেন। ব্যাপারটা তা হলে কী হল! এই যে একটু আগে সব বললে, হনুমানে রিভলভার নিয়ে গেছে। কথাটা তো মিলল না। এস. পি. তখন জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়ার ইজ ইয়োর ইউনিফর্ম?"

"দিস ইজ প্লেন ড্রেস স্যার। তেমন তেমন আসামিকে ধরতে হলে পুলিশকে নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। আমি এখন ওস্তাদজি। এই বেশে ছিলুম বলেই বেঁটে কালুকে ধরতে পেরেছি স্যার। আর দেরি না করে চলুন আমার সঙ্গে। তুলে নিয়ে আসি। আজ ডুমরাওগঞ্জের উৎসবের দিন। আজ বাজি পুড়বে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজবে। আজ চাঁদের আলোয় পাগলা নদীর ধারে নাচাগানা হবে। প্রতাপগড় থেকে নওটঙ্কির দল আসবে।"

ডাক্তারবাবুর গাড়িও থেমে পড়েছিল। এস. পি. বললেন, "আপনি বাড়ি যান। আমি এখন ছুটি ক্যানসেল করে আসামি ধরতে যাই।"

এস. পি-র গাড়ি আর পুলিশের জিপ শাঁ-শাঁ করে জঙ্গলের দিকে ছুটল। এস. পি. বললেন, "আমার কাছে কোনও ফায়ার আর্মস নেই। আপনার রিভলভারের সব কটা চেম্বার ভরতি আছে তো?"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "না, স্যার! তা ছাড়া রিভলভারের প্রয়োজনই হবে না। আমি বেঁধে টেঁধে একেবারে প্যাক করে রেখে এসেছি। ধরব আর তুলব। ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন। আমি একটা রিওয়ার্ড পাব নিশ্চয়!"

"রিওয়ার্ড আপনি পাবেন না, কারণ আপনি অনেক অপরাধ করে বসে আছেন। সেই অপরাধের শাস্তির সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে আপনার কিছুই হবে না।"

"আমি তো কোনও অপরাধ করিনি স্যার। আমি প্লেন ড্রেসে নিজের জীবন বিপন্ন করে অপরাধী ধরতে গিয়েছিলুম। সেইটাই কি আমার অপরাধ?"

"আপনি মিথ্যাবাদী। আপনি কী করেছেন না করেছেন সব আমার জানা হয়ে গেছে সেকেন্ড অফিসারের কাছ থেকে। অতএব আর অপরাধ না বাড়িয়ে চুপচাপ বসুন। সেইটাই মনে হয় ভাল হবে। আপনি আমার স্যার কমল ভৌমিককে কুকুর দিয়ে অ্যারেস্ট করিয়েছেন। কত বড় অপরাধ জানেন?"

"স্যার আমি গভীর জঙ্গলে একটা জামা পেয়েছিলুম। সেই জামার মালিককে অ্যারেস্ট করার কথা। এর বেশি তো আমি কিছু বলিনি।"

"জামা পেলেই জামার মালিককে অ্যারেস্ট করাতে হবে! জঙ্গলে কোনও অপরাধ হয়েছিল?"

"আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।"

"সে তো হনুমান। হনুমানকে অ্যারেস্ট করুন।"

"সেই রাত তো আমি আর ফিরিয়ে আনতে পারব না স্যার। পারলে, আর আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে বুঝতে পারতেন। আমি কান ধরে আমার অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, কান ধরতে হবে না। আমার নিজেরই লজ্জা করছে। শান্ত হয়ে বসুন। আপনি আবার কাঁদতে শুরু করলেন নাকি? এ তো দেখি মহা জ্বালা!"

"ছেলেবেলা থেকেই এই আমার এক রোগ, অবিচার হলেই কেঁদে ফেলি। তাও তো আমি এখন আস্তে আস্তে কাঁদছি। ছেলেবেলায় এত জোরে কাঁদতাম যে, রাস্তার সমস্ত কুকুর আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠত।"

এস. পি. অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর হঠাৎ মনে হল, লোকটি খুব সরল। ভুল করে পুলিশ বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে। দেখতে দেখতে গাড়ি জঙ্গলে ঢোকার মুখে এসে গেল। সেই বিশাল বটগাছ, চারপাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাছের তলায় যে যখন পেরেছে, একটা করে বড় ছোট নুড়ি সাজিয়ে গেছে। গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লেন। দুটো গাছ এমনভাবে দু'দিকে দাঁড়িয়ে আছে, যেন জঙ্গলের প্রহরী। গাড়ি থেকে নেমেই ফার্স্ট অফিসারের চোখে পড়ল, বটতলার নুড়ির ফাঁকে কী একটা জিনিস সাংঘাতিক চকচক করছে। কেউ দেখার আগেই টুক করে তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলে।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে দশ-বারোজন কাঠুরিয়া মেয়ে লাইন দিয়ে বেরিয়ে এল। মাথায় ঝুড়ি। পিঠে বস্তা। হাতে গাছের শুকনো ডালপালা। ওদের দেখেই ফার্স্ট অফিসার বলে উঠলেন, "মরেছে। সব ভন্ডুল করে দিয়ে এল না তো?"

এস. পি. বললেন, "ওরা আর কী ভন্ডুল করবে! শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এল।"

"আমি তো পাতাটাতা চাপা দিয়ে এসেছিলুম। সেই সব সরিয়ে বাঁধন খুলে দিলেই তো হয়ে গেল।"

ফার্স্ট অফিসার কথা বলছিলেন; কিন্তু নজর ছিল ওই দলটার দিকে। এর আগেও প্রমাণ পেয়েছেন, তাঁর মন যা বলে তাই হয়। একবার ট্রেনে যেতে যেতে মনে হয়েছিল, ট্রেনটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছিলেন। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হেসেছিলেন। পরের দিন কাগজ পড়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। বলা যেতে পারে পুনর্জন্ম হল। ট্রেনটা চাণ্ডিলের কাছে দুর্ঘটনায় লাইনচ্যুত। দশটা বগি ভেঙে চুরমার। হতাহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

ফার্স্ট অফিসার এস. পি-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাতাকুড়ুনি দলের মাঝের মহিলাটির ঘাড়ে। এস. পি. হইহই করে উঠলেন। দু'জন ধুলোর ওপর লটাপটি খাচ্ছেন। কিল চড় ঘুসি সবই চলেছে। দলের অন্য মেয়েরা পালাবার চেষ্টা করছে। লড়াই করতে করতেই ফার্স্ট অফিসার বললেন, "বেঁটে কালু। বেঁটে কালু।"

লোকটাকে পেড়ে ফেলে, তার বুকের ওপর চেপে বসেছেন। বেঁটে হল গিয়ে কত বড় একজন শিক্ষিত গুন্ডা। তার বুকের ওপর বেশিক্ষণ চেপে বসে থাকা যায়! তা ছাড়া কথা বলতে গিয়ে বেশ খানিকটা শক্তি বেরিয়ে গেছে। বেঁটে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, এস. পি. ভারী সুন্দর একটা ল্যাং মেরে দিলেন। দেখার মতো পায়ের কাজ। কমল ভৌমিকের ট্রেনিং। বেঁটে ছিটকে পড়ে গেল একটা পাথরের চাংড়ার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে বন্দি করে ফেলল।

এস. পি. বললেন, "কেমন মহিলা সাজার চেষ্টা করেছে দেখো। গাধা কোথাকার। থিয়েটারের মেকআপ-ম্যান ছাড়া মহিলা সাজা যায়!"

ফার্স্ট অফিসার বললেন, "তোমার অমন সুন্দর গোঁফ-দাড়ি কোথায় গেল বলো তো! এইটাই আমাকে অবাক করছে।"

বেঁটে কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "ওটা ফলস ছিল স্যার। উনি মেকআপের কথা বলছেন তো! আমি নিজেই ভাল মেকআপ নিতে পারি। আমার নিজের মেকআপ-সেট আছে। আসলে তাড়াতাড়িতে একটু গোলমাল করে ফেলেছি।"

"তোমাকে আমি কী দেখে ধরলুম বলো তো?"

বেঁটে ধরা পড়ে গিয়ে ভীষণ রেগে আছে। তার ওপর ধোলাই হয়েছে। তার

ওপর এস. পি-র ল্যাং খেয়ে পাথরে উলটে পড়ে মাথাটা গোল আলুর মতো ফুলে উঠেছে। বেঁটে বললে, "জানি না। আমার বরাত খারাপ, তাই ধরা পড়ে গেছি।"

এস. পি-রও কৌতূহল ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমারও জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি ধরলেন কী করে?"

"আজ্ঞে, চোখ আর অভিজ্ঞতা। আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মাথায় বিরাট বস্তা চাপিয়েছে। বস্তাটা দু'হাত দিয়ে ধরে আছে। প্রথমেই মনে খটকা লাগল, হাতে অত লোম কেন? মেয়েদের তো অত লোম থাকে না। তখন ওর হাঁটাটা ভাল করে লক্ষ করলুম। মেয়েরা তো ওইভাবে হাঁটে না। এর হাঁটায় কোনও ছন্দ নেই। মারলুম এক লাফ। যা থাকে বরাতে!"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড। নাঃ, আপনাকে একটা প্রোমোশান দিতেই হচ্ছে।"

"কিন্তু কমিশনার সায়েব যে আমাকে গেট-আউট করে দিয়েছেন!"

"আমি আবার গেট-ইন করে দিলুম। আপনার সাহস আমি স্বচক্ষে দেখলুম। আপনার বিচক্ষণতা আর পর্যবেক্ষণশক্তি দেখলুম। আপনার মাথার একটু গোলমাল আছে, তা থাক। ঢিলে মাথা না হলে সাহসের কাজ করা যায় না।"

গাড়ি থানায় ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যে এস. পি.-র তলব পেয়ে কমিশনার এসে পড়লেন। এসে পড়লেন ইনসপেক্টর জেনারেল। হইহই ব্যাপার। বেঁটে ধরা পড়েছে। বেঁটের পেটে অনেক খবর জমা আছে। একটু খোঁচাখুঁচি করলেই সব বেরিয়ে আসবে। ডুমরাওগঞ্জে বেঁটেকে রাখা হবে না। বেঁটেকে নিয়ে যাওয়া হবে তিলকগঞ্জে। সেখানে যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রে বেঁটের মাথা ফিট করে চাকা ঘোরানো হবে। আর বেঁটে সব বলে দেবে।

॥ ৪৩ ॥

আই. জি. ফার্স্ট অফিসারকে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার করে দিলেন। আর সেকেন্ড অফিসারকে করে দিলেন ফার্স্ট অফিসার। বড় কর্তারা চলে গেলেন। দুই বন্ধু তখন মুখোমুখি বসলেন চেয়ারে আরাম করে। ফার্স্ট অফিসার এখন এ. সি.। আই. জি. মুখে বলে গেছেন। সদর থেকে অর্ডার ঠিক সময়েই আসবে। ফার্স্ট অফিসার পকেট থেকে বটতলায় কুড়িয়ে-পাওয়া সেই চকচকে জিনিসটা বের করে টেবিলে রাখলেন। "এই নাও, তোমার হারানো জিনিস।"

"অ্যাঁ, এ কী! এ যে আমার সেই হারানো ব্যাজ। অশোকস্তম্ভ। কোথায় পেলেন?"

"রামজির কৃপা হলে সবই হয়। হনুমানজি আমাদের সব নিয়ে নিয়েছিলেন, আবার সব ফিরিয়ে দিলেন। শুধু দিলেন না, অনেক বেশি দিলেন। প্রোমোশানটা হল সেই সুদ। ভক্তি চাই সেকেন্ড, ভক্তি! বিশ্বাস চাই। আত্মসমর্পণ চাই।"

"এখন বলছেন! তখন বলেছিলেন গুলি চালিয়ে সব হনুমান শেষ করে দাও।"

"সে আমার মুখের কথা। মনের কথা ছিল, জয় রামজি কি জয়। যাক, তোমার প্রোমোশান হল, আমাকে খাওয়াও।"

"আপনারও তো প্রোমোশান হল, আমাকে খাওয়ান।"

"দুটো রাস্তা খোলা আছে, এক কাটাকাটি। তুমিও আমাকে খাওয়ালে না, আমিও তোমাকে খাওয়ালুম না। দুই, তুমি তোমার টাকা টেবিলে ফেলো। আমি আমার টাকা। দুটো টাকা এক করে চলো হাজির দোকানে। অসম্ভব খিদে পেয়েছে, অনেক দিন পরে আজ হয়ে যাক এক হাত।"

"দু'নম্বরটাই হোক। একটা কথা, আমি যা দেব আপনি তার ডবল দেবেন।"

"বেশ, তাই হবে; তবে তুমি এখন আমায় কিছু ধার দাও। আমার পকেট গড়ের মাঠ।"

"ধার! শোধ দেবেন তো?"

"মনে থাকলে। যদি মনে না থাকে তা হয়ে গেল। আমার আবার ভুলো মন। আর ভুলে গেলে তোমার উচিত হবে না একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে টাকার তাগাদা দেওয়া। নাও, উঠে পড়ো। তোমার সেই লুক্কায়িত জায়গা থেকে দুটো বড় নোট বের করে আনো।"

"আজ থাক। আজ আমার পেটটা খুব গোলমাল করছে।"

"আরে ধুর! ভীরু, কাপুরুষ! হাজির খাবার পেটে পড়লে পেট আপনি ঠিক হয়ে যাবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মোটরসাইকেল বেরিয়ে এল থানা থেকে। চালাচ্ছেন সেকেন্ড অফিসার, পেছনে ফার্স্ট।

ফার্স্ট বললেন, "ভয় পেয়ো না! আমার খেয়াল ছিল না, আমার জামার ভেতরের পকেটে অনেক টাকা আছে।"

সেকেন্ড অফিসার বললেন, "আমি তা হলে একটা গান ধরি, ফিলমের নায়কের মতো।"

আজ একটা পেল্লায় চাঁদ উঠেছে। গোল থালার মতো, পুব আকাশে। বনভূমি

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। নীল আকাশের গায়ে ধূসর পাহাড় যেন ধ্যানে বসেছে। ডক্টর মুখার্জির বাংলোর বাগানে জাপানি কায়দায় 'মুনলাইট পার্টি' হচ্ছে। এইসব ব্যাপার যাঁর মাথা থেকে আসা উচিত, তাঁর মাথা থেকেই এসেছে। তিনি হলেন সেই চিরযুবক, কমল ভৌমিক।

"এত এত সব ঘটনা ঘটে গেল, একটা অনুষ্ঠান হবে না! সে কী কথা। জেলে গেলুম, জেল থেকে বেরিয়ে এলুম। সুদর্শনবাবু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন। বেঁটে হাজতে। এরপর একটা সেলিব্রেশান না হলে চলে। আমরা আমাদের ডাক্তার দাদা আর বউদিকে সংবর্ধনা জানাব। কবে বিদেশ থেকে সম্মান আসবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকব না।" কমল ভৌমিকের উৎসাহে একেবারে নিখুঁত আয়োজন। গাছে গাছে আলোর মালা। জায়গায় জায়গায় চিনে লণ্ঠন ঝুলছে। ছোট ছোট টেবিল। চারপাশে চেয়ার। শহরের সবচেয়ে বড় বেকার পিটার গোমেজ, কেক, প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, কাটলেট সাপ্লাই করেছেন। 'জানেমন' সিনেমাহলের সামনে গোলকবিহারীর দোকান থেকে কফি তৈরির এসপ্রেসো মেশিন এসেছে। ফুল এসেছে নেলির দোকান থেকে। পাহাড়ের কোলে নেলিদের বিশাল গোলাপ বাগান। আর এইসবের খরচ জুগিয়েছেন সুদর্শন আর কমল ভৌমিক।

আর সে বেশ মজা, সুদর্শনের কাছে একটা বই আছে। আসলে সেটা বই নয়, 'ওয়ালেট'। ভেতরটা ফাঁপা। সেই শূন্য জায়গায় পাটে পাটে নোট সাজানো। কোথা থেকে পেলেন এত টাকা। বইয়ের রয়ালটি। সুদর্শনের লেখা তিরিশটা বইয়ের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সুদর্শন যে-সে লোক নন। তাঁর পরিচয় বেরিয়ে পড়েছে। সুদর্শন কেরলের মানুষ, কিন্তু জন্মেছেন পশ্চিমবাংলায়। তাঁকে বাঙালিই বলা চলে। সুদর্শনের বাবা বিশাল বড়লোক। কেরলে তাঁর রবার বাগান আছে। প্রাসাদের মতো বাড়ি। সেই বাড়িতে সুইমিং পুল আছে। বন্দুক ছোড়ার জায়গা আছে। দুটো হাতি আছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার। অত বড়লোকের ছেলে সব ছেড়ে একটা ছদ্মনাম নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুপুরবেলা খাবার টেবিলে বসে বলছিলেন, "নিজেকে নানা বিপদে ফেলে আমি ভীষণ আনন্দ পাই। যত বিপদে পড়ব, তত লেখা বেরোবে।" পরিচয় জানার পর থেকে কমল ভৌমিক ভীষণ শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন।

বাইরে সাতখানা ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। আই. জি., এস. পি., ডি. সি., বিখ্যাত সংগীত শিল্পী হাসান হাফিজ, নামকরা খেলোয়াড় সুরেন তলোয়ার, বিখ্যাত ব্যবসায়ী আনোহার হোসেন, ডাক্তার সমীর মুখোপাধ্যায়, বাছা বাছা বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথি এসেছেন। চাঁদের আলোয় সব বসে

আছেন টেবিলে টেবিলে। ডাক্তারবাবুর গলায় মালা পরানোয় তিনি খুব লজ্জা পেয়েছেন। রাজ্যেশ্বরীকে কমল ভৌমিক জোর করে চাঁদের আলো রঙের একটা সিল্কের শাড়ি পরিয়েছেন। তার পাড়ে বসানো রুপোর ঝালর। শাড়িটা পরে তিনিও খুব লজ্জায় আছেন; কিন্তু দেখাচ্ছে ভীষণ সুন্দর। মনে হচ্ছে বাগানে নেমে এসেছে চাঁদের টুকরো।

রুকু, সুকু, নিতু, কমল ভৌমিক, সুদর্শন সাদা জামা-প্যান্ট পরেছেন। চাঁদের আলোয় সাদা আরও সাদা দেখায়। পিটার গোমেজ বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু আজ তিনি নিজে এসেছেন। বুকের কাছ থেকে সাদা একটা অ্যাপ্রন পরে হাতে গ্লাভস চড়িয়ে নিজেই কাটলেট বাঁধতে শুরু করেছেন, সঙ্গে দু'জন অ্যাসিসট্যান্ট। বাগানের একধারে কিচেন হয়েছে। সেখানে পরপর দুটো গ্যাসের উনুন ফুরফুর করে জ্বলছে।

হঠাৎ বাগানের গেট খুলে এমন একজন ঢুকলেন যাঁকে কেউ নিমন্ত্রণ করেননি। করেননি ভুল হয়ে গেছে। খেয়াল ছিল না। তিনি হলেন ডি. এম.। জেলার মানুষ যাঁকে পাগলা সাহেব বলে। সেই ডি. এম. এসেছেন। হাতে একতোড়া সাদা গোলাপ। ইশাকের দোকান থেকে বড় এক শিশি আতর কিনে এনেছেন। সেই আতরের নাম আবার মেহবুবা। পরেছেন সাদা শেরোয়ানি, লম্বা সাদা আচকান। মাথায় মুসলমানি টুপি। পায়ে জরির নাগরা। সাংঘাতিক দেখাচ্ছে। প্রথমটায় কেউ চিনতে পারেনি। লম্বা লম্বা কাঠির মাথায় তুলো জড়িয়ে এনেছেন। সেই তুলো আতরে ডুবিয়ে সকলের হাতে হাতে দিচ্ছেন। ফুলের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, আতরের গন্ধে, কাটলেট ভাজার গন্ধে সারা বাগানে একটা ভয়ংকর রকমের মাতামাতি।

গোলাপের তোড়াটা ডাক্তারবাবুর হাতে দিতে দিতে বললেন, "শতায়ু হন।" আর একটা তোড়া রাজ্যেশ্বরীর হাতে দিতে দিতে বললেন, "চিরসুখী হন।" তারপর একটা চেয়ারে বসে বললেন, "যেই বুঝলুম মানুষ হয়ে আপনারা ভুল করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি দেবতা হয়ে ক্ষমা করে দিলুম। মুনলাইট পার্টি হচ্ছে আমি নেই তা কখনও হয়। দেখুন আমার কোনও মানসম্মান জ্ঞান নেই। সোজা চলে এসেছি। আমার গুরু ভগবানদাস বলেছেন, যে নিজেকে মানে সেই মানী। যে নিজেকে জানে সেই জ্ঞানী। যে নিজেকে জয় করতে পারে সেই বীর যোদ্ধা।"

সকলেই তাঁর কথায় খুব তারিফ করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমাকে মার্জনা করবেন, সত্যিই আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। আসলে আমি তো কিছুই করিনি, সবই এই কমলবাবু আর সুদর্শন করেছেন।"

"দারুণ আইডিয়া। কল্পনায় বাঁচতে না শিখলে বাঁচাটা যা-তা হয়ে যায়।

খেলুম, দেলুম, বকবক করলুম, ঘুমোলুম, টকাস করে মরে গেলুম। এই যেমন আমি যখন ভৈরব পাহাড়ের দিক থেকে একা একা ড্রাইভ করে আসছি তখন চাঁদের আলোয় ফাঁকা মাঠে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলুম।"

সুকু রুকু, নিতু, কমল ভৌমিক এমনকী সুদর্শনও ঘন হয়ে বসলেন। কমল ভৌমিক বললেন, "আহা, থামলেন কেন। বলুন না কী দেখলেন?"

ডি. এম. বললেন, "আপনারা সব অবিশ্বাসী শিক্ষিত লোক, আপনাদের বলতে ইচ্ছে করে না। এখনই হাসতে আরম্ভ করবেন।"

"বিশ্বাস করুন, একদম হাসব না। আপনি বলুন।"

"তা হলে শুনুন।" টেবিলের উপর চার-পাঁচ গেলাস জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ডি. এম. এক গেলাস জল তুলে চুমুক দিলেন। পকেট থেকে সাদা সিল্কের রুমাল বের করে ঠোঁট মুছলেন। আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

"তা হলে শুনুন। দেখি কী, একটা সাদা ঘোড়া মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে।"

আই. জি. বললেন, "সাদা ঘোড়া? ওই ঘোড়াটা আমিও দেখেছি। দুধের মতো ধবধবে সাদা। মনে হয় মোরান সায়েবের।"

"না মোরান সায়েবের নয়। মোরান সায়েবের ঘোড়ার রং চেস্টনাট ব্রাউন। আগে শেষ পর্যন্ত শুনুন। আমার গল্পেরও তো একটা শেষ আছে। সবে তো শুরু করলুম।"

এস. পি. বললেন, "কী আশ্চর্য, এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য ঠিক নয়। ডি. এম.ই আগে বলুন না।" আই. জি. স্প্রিং-এর পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালেন, "এটা একটা অপমান। আই লিভ। আমি চললুম। এটা কীসের গন্ধ বেরোচ্ছে। ভারী সুন্দর!"

"কাঁচা লঙ্কার রস নিয়ে কাটলেট ভাজা হচ্ছে।" বললেন কমল ভৌমিক।

"আঃ, গন্ধেই জল এসে যাচ্ছে জিভে। পিটার গোমেজের একটা স্ট্যাচু এই শহরের কোথাও বসাতে হবে। ওর রান্নার গন্ধ নাকে গেলে মরা মানুষও উঠে বসবে। যাক, আমার আর খাওয়া হল না। আপনারা সব আনন্দ করুন। উপভোগ করুন। এনজয় ইয়োরসেল্‌ফ। আচ্ছা গুডনাইট।"

কমল ভৌমিক ভালমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা কীভাবে আপনার অপমান হল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। একটু বুঝিয়ে দেবেন!"

"বুঝতে পারলেন না। আমি আই. জি.। জেলার একজন সিনিয়ার অফিসার। আমি আগে বললে মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ হত! আসলে দলাদলি। আমার বিরুদ্ধে দলবাজি হচ্ছে। এস. পি-তে ডি. এম-তে দল পাকিয়েছে।" ডি. এম. উঠে দাঁড়ালেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমারই চলে যাওয়া উচিত। আমি

অযাচিত চলে এসেছি। কেউ আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি। ভালবেসে এসেছি। সেইটাই এই মহামান্য অহংকারী মানুষটির সহ্য হল না। আপনারাই বলুন, আমি অফিসে এসেছি, না বাগান-পার্টিতে এসেছি? এখানে কে ডি. এম. কে আই. জি.! আমরা সবাই মানুষ। আচ্ছা আমি চলি। আই. জি.-সাহেব আপনি কাটলেট খান।"

ডি. এম-এর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, সত্যিই একটা সাদা ঘোড়া বাগানের নিচু পাঁচিল এক লাফে টপকে দুলকি চালে সোজা টেবিল আর চেয়ারের সারির কাছে চলে এল। সাদা তেজিয়ান ঘোড়া। তার পিঠে চেপে বসে আছেন এক রাজপুত যোদ্ধা। কোমরের কাছে কাজকরা জরির খাপে লম্বা তরোয়াল। রাজপুত যোদ্ধা লাফিয়ে মাটিতে নেমে কুর্নিশ করে বললেন, "রানা প্রতাপ সিংহ ডাক্তারবাবুকে সম্মান জানিয়ে এই উপহার পাঠিয়েছেন।"

ঘোড়ার পাশের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য মোড়ক বেরোল। আই. জি. অবাক হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন ধপাস করে। ডি. এম-এরও একই অবস্থা। এস. পি. পাইপ টানা ভুলে গেছেন। মোড়কটা বেশ ভারী। সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল অতি সুদৃশ্য ছোট্ট একটা পেতলের কামান। রাজপুত যোদ্ধা কামানটায় কী একটা কারিকুরি করতেই চারপাশে ফটাফট করে ছিটকে পড়তে লাগল লাল সাদা গোলাপ ফুল।

ডাক্তারবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

"আমি রানা প্রতাপের দূত।"

"সে তো আপনার ছদ্মবেশ! প্রকৃতই আপনি কে?" যোদ্ধা একটা চেয়ারে বসে মাথার পাগড়ি খুলে ফেললেন। খুলে ফেললেন মাথার পরচুল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাঁকে চিনে ফেললেন। জেলার ফরেস্ট অফিসার প্রভাতসূর্য।

প্রভাতসূর্য হাসতে হাসতে বললেন, "কেমন অবাক করে দিলুম। বলুন! কী, করিনি!"

সকলে একবাক্যে একটা কথাই বললেন, "ওয়ান্ডারফুল।"

এস. পি. বললেন, "এই অসাধারণ সুন্দর ঘোড়াটা আপনি কোথায় পেলেন?"

ডি. এম. বললেন, "এই সুন্দর পোশাক?"

"ঘোড়াটা মহামান্য সরকার বাহাদুর আমাকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আনিয়ে দিয়েছেন, আমার কাজের সুবিধার জন্যে, বনের গাছ আর বন্যপশুদের

পাহারা দেবার জন্যে। তা না হলে মানুষ মেরে আর কেটে শেষ করে দেবে। আর পোশাক, আমি ভাড়া করেছি সাজাহানের দোকান থেকে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন হয়েছে?"

সবাই বললেন, "অসাধারণ, কোনও তুলনা হয় না, অভাবনীয়।

আই. জি. বললেন, "আচ্ছা আমি একদিন এইরকমই একটা সাদা ঘোড়া এইরকমই এক চাঁদের আলোর রাতে নদীর ধারে জঙ্গলের পাশে দেখেছিলুম। সেই ঘোড়ার পিঠে মনে হয়েছিল এক পাঠান বসে ছিলেন। সে ঘোড়াটা কার?"

"সেটাই এই ঘোড়া। তার পিঠে আমিই বসে ছিলুম। আমি তখন শেরশাহ। রকম রকম পোশাকে আর ছদ্মবেশে আমি ঘুরে বেড়াই।"

এস. পি. বললেন, "কী কারণে, শখ?"

"শখ নয়, একটা উদ্দেশ্যও আছে। এই ঘোড়াটিকে আমি দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখি, আর রাতের বেলা মাঠে-ময়দানে ছোটাই, নানা পোশাকে নিজেকে সাজাই। কেন বলুন তো? হোয়াই?"

সকলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, আর সেই সময় গোমেজ আর তাঁর লোকজনেরা প্লেটের পর প্লেট গরম কাটলেট, গরম আলুভাজা, স্যালাড আরও সব রকম রকম জিনিস টেবিলে টেবিলে পরিবেশন করতে লাগলেন। গন্ধে মাত। সবার আগে আই. জি. এক টুকরো কাটলেট ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পুরলেন, আর সেই ভরাট মুখে কেবলই বলতে লাগলেন, "সুপার্ব! সুপার্ব! পরমায়ু বেড়ে গেল, পরমায়ু বেড়ে গেল।" সবচেয়ে মজা করলেন ডি. এম., "আমি তো কিছু খাব না, আজ আমার উপোস।"

কমল ভৌমিক কানে কানে বললেন, "বড় বড় লোকদের নিয়ে এই এক সমস্যা। এক গোলমাল মেটে তো আর এক গোলমাল শুরু হয়ে যায়!"

আই. জি. ততক্ষণে একটা কাটলেট শেষ করে আর-একটার দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

প্রভাতসূর্য বললেন, "আজ আবার কীসের উপোস! আজ রামনবমী নয়, তালনবমী নয়। আজ আবার উপোস কীসের?"

"আজ একাদশী।"

"আপনার কি বাত আছে যে একাদশী করছেন?"

সুদর্শন বললেন, "না, না, ওঁর রাগ হয়েছে। রাগ না পড়লে উনি কাটলেট স্পর্শ করবেন না।"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "একাদশী আমিও করি। আপনার ক্যালকুলেশান তো মিলছে না। একাদশী আজ নয়, আগামী কাল। কেন অমন করছেন।

যত রাগবেন তত হার্ট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। হৃদয় যদি ভাল রাখতে চান রাগ কমান।”

“আমি তো রাগে করছি না, অপমানে করছি।”

প্রভাতসূর্য বললেন, “রানা প্রতাপের ফরমান বের করব। বিপদে পড়ে যাবেন।”

সুদর্শন বললেন, “সেটা কী?”

প্রভাতসূর্য উঠে গিয়ে ঘোড়ার পাশে ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে এলেন। মুখটা বন্ধ। ঝুড়িটা বাগানের ঘাসের ওপর রেখে বললেন, “খুলব কি?”

ঝুড়িটা ডি. এম-এর ঠিক পায়ের পাশে। ডি. এম. বললেন, “কী আছে?”

একটা কেউটে সাপ আছে। হয় আপনি কাটলেটে কামড় মারুন, না হয় কেউটে আপনাকে কামড় মারুক।”

ডি. এম. তাড়াতাড়ি কাটলেটে কামড় মারলেন। প্রভাতসূর্য ঝুড়িটা কোলে নিয়ে চেয়ারে বসলেন। ডি. এম. বললেন, “যান না যেখানে ছিল, সেইখানেই রেখে আসুন না। সাপ নিয়ে খেলা করাটা ঠিক হবে না।”

প্রভাতসূর্য তবুও কোলের ওপর সেই চ্যাপটা মতো বেতের ঝাঁপিটা রেখে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ঢাকনাটা খুলব খুলব করছেন। আবার পরক্ষণেই বন্ধ করে দিচ্ছেন। একেবারে পাশে বসে থাকা ডি. এম. সেই দেখে ভয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে আই. জি. চতুর্থ কাটলেটের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

প্রভাতসূর্যর কোল থেকে ঝাঁপিটা হঠাৎ পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে মুখের চাপাটা খুলে গেল। ডি. এম. চেয়ারে পা দুটো তুলে চোখ বুজিয়ে তারস্বরে, ‘রাম, রাম’ করতে লাগলেন। প্রভাতসূর্য বললেন, “মশাই, এ ভূত নয় যে, রাম নামে যাবে, এ হল কেউটে।”

সুকু প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল, কারণ সাপের সঙ্গে তার অনেকবার মোলাকাত হয়েছে। একবার মাঠের ওপর দিয়ে তাকে দেড় মাইল দৌড় করিয়েছিল একটা কালো সাপ। সর্বক্ষণই ঝাঁপিটার দিকে তার নজর ছিল। ঢাকনাটা খুলে যেতেই একগাদা সাদা পাথরের মতো কী সব বেরিয়ে পড়ে জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুকু জোরে বলে উঠল, “সাপ নয়, সাপ নয়, জেমস।”

সঙ্গে সঙ্গে সবাই খাওয়া বন্ধ করে একযোগে বলে উঠলেন, “জেমস! সে কী, জেমস!”

প্রভাতসূর্য নিচু হয়ে পাথরগুলো ঝাঁপিতে ভরতে ভরতে বললেন, “জেমসের

চেয়েও মূল্যবান। আমার সারা জীবনের সাধনা। আমার ডাক্তারবাবুর জন্য নিয়ে এসেছি। দেখি, একটা টেবিল দেখি। সব সাজাই পাশাপাশি, আপনারা জীবনে এমন জিনিস দেখেননি। আই অ্যাম শিয়োর অব ইট।"

॥ ৪৪ ॥

সাদা কাপড় বিছানো টেবিল। তার ওপরে প্রভাতসূর্য ছোট বড় নানা মাপের নানা রঙের পাথর সাজিয়েছেন। তা প্রায় ষাট, সত্তর কি একশোও হতে পারে। লাল আছে, হলুদ আছে, নীল আছে। নানা রঙের ছিটছিট প্রজাপতির আকারের একটা পাথর আছে। অবাক করে দেবার মতো। সকলেই একবাক্যে বাহবা, বাহবা করে উঠলেন।

সুদর্শন বললেন, "ওই প্রজাপতির মতো পাথরটা কী জিনিস? ওটা কি সত্যিই পাথর?"

"আজ্ঞে না, এটা হল প্রস্তরীভূত পাহাড়ি প্রজাপতি। এটা আমার অনেক অনুসন্ধানের সঞ্চয়। এই সবই আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দিলুম। এর নাম হল সাধনা।"

ডি. এম. বললেন, "সাধনা বলছেন কেন? কার সাধনা?"

"প্রকৃতির সাধনা। উত্তাপে, ঘর্ষণে এক-একটি পাথর তৈরি হয়েছে। কত বছর লেগেছে কে জানে।"

"তা, ডাক্তারবাবুকে দিচ্ছেন কেন?"

"সাধকের হাতেই তো সাধনার ধন তুলে দিতে হয়।"

সকলেই সমর্থন করলেন। ডি. এম. জিজ্ঞেস করলেন, "সব মিলিয়ে দাম কত হবে?"

প্রভাতসূর্য বললেন, "অমূল্য।"

খাওয়াদাওয়া শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। গোমেজ যে কত কী বানিয়েছেন। ডি. এম. বললেন, "আমি সে-যুগের রাজামহারাজা হলে ভদ্রলোকের হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতুম।"

সুকু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, "আমি আমার বাবা আর আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে একটা কথা বলতে পারি?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কী কথা সুকু?"

অন্য সকলে বললেন, "বলো, বলো। নিশ্চয় বলবে। তুমি হলে আমাদের ডুমরাওগঞ্জের গর্ব।"

সুকুর চোখ দুটো চকচক করছে। বয়েসের তুলনায় সুকুর স্বাস্থ্য খুব সুন্দর। বুকটা টানটান হয়ে আছে। ফরসা মুখে উঁচু নাক। দুটো গাল জাপানি আপেলের মতো ঝকঝক করছে।

নিতু অবাক হয়ে সুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কী সাহস সুকুদার। এত বড় বড় লোকের সামনে কেমন দাঁড়িয়ে আছে শরীর টানটান করে। কদমগাছের তলায় সাদা ঘোড়াটা দু'বার পা ঠুকল।

সুকু বললে, "আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত।"

সকলে সমস্বরে বললেন, "কেন, কেন? আজ তো আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন।"

"আমাদের এই জেলার বড়দের কোনও কথার দাম নেই। তাঁরা ছোটদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেন।"

সকলে বললেন, "কেন, কেন? তুমি এমন কথা বলছ কেন?"

"কারণ আছে। তা হলে বলছি শুনুন। সেবার স্কুলের ফাংশানের সময় আমরা এই জেলার পাপচক্র যেভাবেই হোক ফাঁস করে দিয়েছিলুম। সেই অনুষ্ঠানে হেডস্যার ছিলেন। কমলকাকু ছিলেন। আরও অনেকে ছিলেন। এক রাতেই যা হয়েছিল, তা যেন ভিমরুলের চাকে খোঁচা। কী পুরস্কার। চিড়িয়াখানাটা সুকুর হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে। একটা অনুষ্ঠানে ডি. এম. সাহেব যেই আমার হাতে চাবি তুলে দিতে যাবেন বলে আমাদের নিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে চলেছেন, নানা ঘটনায় সব ভন্ডুল হয়ে গেল। আরও ওপর মহল থেকে খবর এল, চিড়িয়াখানা দেওয়া যায় না, দেওয়া হবে না। ডি. এম. সাহেব নাকি পাগল হয়ে গেছেন। তারপর থেকে ঘটনার চাকা ঘুরেই চলেছে। সেই চাকায় আমরাও ঘুরছি। আপনারা সবাই রয়েছেন এখানে, আপনারাই বলুন, বড়দের পক্ষে এটা কি খুব লজ্জার নয়? কথা দিয়ে কথা না রাখা! আমরা ছোটরা আইনকানুনের কী বুঝি। আমরা বুঝি, কথা দিলে কথা রাখতে হয়।"

সবাই একবাক্যে বললেন, "ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ব্যাপারটা আমারও খুব কুৎসিত লেগেছে। সে এক বিকট কাণ্ড। আমাদের এই নিতুকে কিডন্যাপ করেছিল। অতি কষ্টে এই সুদর্শনের সাহায্যে উদ্ধার করা হল। মন্ত্রীর হুকুমে চিড়িয়াখানা উৎসর্গ করা বন্ধ হয়ে গেল। এমনকী, উইলিয়ামসন সাহেবের ডাকবাংলোটা ভেঙে ফেলা হল, তবু আমাকে দেওয়া হল না।"

এস. পি. বললেন, "ডাকবাংলো তো কমল স্যার, দেওয়া যায় না, কিনতে হয়।"

"সে আমি না হয় কিনতুম, এখন তো আধখানা ভেঙেই দেওয়া হল।"

"ডাকবাংলো আপনি কী করবেন? মাঝে মাঝে চেঞ্জে আসবেন?"

"না, না, চেঞ্জে কেন? আমি এখানে একটা আখড়া করব। ট্রেনিং সেন্টার। ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যচর্চা করবে। আত্মরক্ষার শিক্ষা নেবে। দিনকাল হুহু করে পালটাচ্ছে। ভাত, ডাল, নাকে সরষের তেলের যুগ চলে গেছে।"

"আখড়া করবেন? ফ্যান্টাসটিক। আমি আপনাকে সাংঘাতিক ভাল একটা বাংলো তিন দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

ফরেস্ট অফিসার বললেন, "কোনটা?"

"ওই যে একেবারে নদীর ধারে, লটনসাহেবের বাংলোটা।"

"অ্যায়, আমিও ঠিক ওইটির কথাই ভাবছিলুম। বিউটিফুল। বিউটিফুল! তবে একটাই কিন্তু।"

"কিন্তু আবার কী? সবেতেই একটা করে কিন্তু!"

"ওই বাংলোতে ভূত আছে।"

"ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন আপনি? নিজে দেখেছেন কখনও?"

"এখানে ছোটরা রয়েছে। ভয় পাবে। আমি কিছু বলব না।"

সুকু বললে, "আমি আর দাদা, লটন সাহেবের বাংলোতে ভূত দেখেছি।"

"ভূত দেখেছ? কেন দেখেছ? কীভাবে দেখেছ?"

"গত বছর বড়দিনের ছুটির সময় আমি আর দাদা একদিন দুপুরবেলায় ওই বাংলোর ধারে বনভোজন করতে গিয়েছিলুম।"

"দুপুরবেলা ভূত? মাস্টার সুকু গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। ভূত, বাদুড়, প্যাঁচা, এ সবই হল নিশাচর। তুমি দুপুরে ভূত দেখলে কী করে?"

"দুপুরে দেখিনি। দেখেছি সন্ধেবেলা। বাড়ি ফিরে আসার সময়।"

"কী দেখলে? কেমন চেহারা?"

"হঠাৎ দেখি ডাকবাংলোর...।"

"উঁহুঁ, হল না। ডাকবাংলো নয়, শুধু বাংলো। বড় বেশি ভুল হচ্ছে। জোর করে গল্প বললে এইরকমই হয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাংলো, শুধু বাংলো। আমি কি বলব?"

সবাই বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো। বলো, বলো।"

ডি. এম. বললেন, "ভূতে আমার ঠিক ভয় নেই, তবে গা-টা কেমন যেন ছমছম করে। ভাল লাগে না। মনে হয় যেন পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।"

ফরেস্ট অফিসার বললেন, "পিঠটা আপনি ঘুরিয়ে রাখবেন, কেউ আর সুড়সুড়ি দিতে পারবে না। নাও, নাও, সুকু মাস্টার, তুমি বলো। বেশ জমিয়ে বলো। আঃ, কতকাল ভূতের গল্প শুনিনি।"

"হঠাৎ দেখি বাংলোর ভেতরের বারান্দায়, দপদপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এদিকে ওদিকে কাঁপাকাঁপি করে দপ করে নিভে গেল। বেশ জোর, জোরালো আগুন।"

ডি. এম. বললেন, "তোমরা তখন কী করলে? ছুটে পালিয়ে এলে?"

"না, আমরা তখন পাঁচিল টপকে বাংলোর ভেতরে গেলুম। বিরাট মাঠ পেরিয়ে চলে গেলুম নদীর দিকে। সেই দিক থেকে তাকালুম দোতলার বারান্দার দিকে। যেখানে আগুনটা জ্বলে উঠেছিল বলে মনে হয়েছিল।"

"কী দেখলে, কী দেখলে?"

"কিছুই না। ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।"

"তা হলে আর কী হল? ভূত ছাড়াই ভূতের গল্প হল। কোনও মানে হয়? কত আশা করে বসে আছি একটা ভূত দেখব বলে।"

ফরেস্ট অফিসার বললেন, "হতাশ হবার মতো এখনও কিছু ঘটেনি। ওরা এখনও বাংলোর ভেতরেই আছে। বেরিয়ে আসেনি। তারপর কী হল বাবা?"

"আমরা তখন সারা বাংলোটা বাইরে থেকে একবার ঘুরে এলুম।"

ডি. এম. বললেন, "ভয় করছিল না? বুক ঢিপঢিপ?"

"না, ওসব কিছু করছিল না। ভীষণ শীত করছিল।"

"শীত? আচ্ছা, তোমাদের শীত করছিল। এইবার ব্যাপারটা জলের মতো ক্লিয়ার হয়ে গেল। জলবৎ তরলং।"

"কীভাবে তরল হল?"

ওই একটা কথায়। যেই বললে শীত, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাকা মাথায় খেলে গেল, কেউ শীতে আগুন পোহাচ্ছিল।"

"কেউ কোথাও নেই, আগুনটা জ্বালবে কে? ভূতে?"

"কী আশ্চর্য! ভূতের গল্পই তো হচ্ছে।"

সুদর্শন বললেন, "আপনারা সমস্ত প্লটটা গুলিয়ে দিলেন। এভাবে লেখা যায়?"

"কে লিখছে? কী লিখছে?"

"আমি মনে মনে লিখছিলুম। সুকুর ওই গল্পটা মেরে আমার একটা বই হয়ে যাবে, বাংলোবাড়ির রহস্য। কতদিন হয়ে গেল একটা বই লিখিনি আমি। লেখার উপোস চলেছে আমার। একটা প্লটের জন্যে আজ পর্যন্ত আমার কত খরচ হয়েছে জানেন?"

"প্লট মানে? প্লট অব ল্যান্ড?"

"নো স্যার। প্লট অব এ স্টোরি।"

"স্টোরির প্লটের জন্যে খরচ? কী বকছেন পাগলের মতো!"

"তা হলে শুনুন।"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই হল আপনাদের চরিত্রের মহৎ দোষ। একটা শেষ হবার আগে আর-একটা ধরে ফেলেন। ভূত আগে শেষ হোক।"

"ভূত শেষ হয়ে গেছে। এই তো বললেন, ভূতে আগুন জ্বেলেছে।"

আই. জি. বললেন, "ছেলেটি বেশ ধরেছে ভাল, ওকে শেষ করতে দিন না। পাগলামি পরে করবেন।"

ডি. এম. বললেন, "আমাকে যে পাগল বলে, সে নিজে পাগল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সত্যি কথা বলব, আমার খুব খারাপ লাগছে। আজ আমরা আনন্দ করার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি, ঝগড়াঝাঁটি, কথা-কাটাকাটি একদম ভাল লাগছে না।"

সুদর্শন বললেন, "সুকু, তুমি গল্প শেষ করো! কোনও কথা শুনো না। গল্পটাকে তুমি কোন দিকে নিয়ে যাও, আমার ভীষণ কৌতূহল আছে।"

"বাংলোর চারপাশটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখে এলুম। কোথাও কিচ্ছু নেই। তখন আমরা একটা আড়াল খুঁজে লুকিয়ে রইলুম। কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

"লুকোলে কেন? ভয় পেলে তো মানুষ ছুটে পালায়!" কাঁটা আর ছুরিতে ঠোকাঠুকি করে শব্দ করতে করতে ডি. এম. প্রশ্ন করলেন।

সুদর্শন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, "সুকু, তুমি বলো, বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আমি লুকিয়েছি।"

হঠাৎ সকলের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। সকলেই অবাক। ফটফট করছে চাঁদের আলো, জল পড়ছে কোথা থেকে!

॥ ৪৫ ॥

গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ায় আলোচনার গতি ঘুরে গেল। ফটফট করছে চাঁদের আলো তবু কেন বৃষ্টি? এ কী বৃষ্টি! ডি. এম. সাহেবই সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়লেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। আকাশের দিকে ঘাড় তুলে দেখছেন। ডাক্তারবাবুর তিনতলার ছাদের জলের ট্যাঙ্কটার ওপর হঠাৎ নজর গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর্কিমিডিসের মতো বলে উঠলেন, "মিল গিয়া, মিল গিয়া, সন্ধান মিল গিয়া। জলের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে।"

এস. পি. বললেন, "আপাতত আপনার বসে পড়াই ভাল। আপনার বহুমুখী প্রতিভা, সন্দেহ নেই; তবে একটা প্রতিভা আপনার আছে বলে মনে হয় না;

সেটা হল গোয়েন্দাগিরি। জলের ট্যাঙ্ক যদি ফুটো হত, তা হলে ঝরঝর করে জল পড়ত।”

ডি. এম. হতাশ হয়ে বললেন, “তা হলে।”

“তা হলে অন্য কিছু।”

কমল ভৌমিক বললেন, “মানুষের দুঃখে আকাশ মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।”

“ফেলে বুঝি?” আই. জি. হাহা করে হেসে উঠলেন।

সুদর্শন বললেন, “আমি জানি ব্যাপারটা কী! স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ল।”

ডি. এম. বললেন, “সে আবার কী?”

“সে এক অতি দুর্লভ জিনিস। তবে অপাত্রে পড়ল, এই আর কী! স্বাতী নক্ষত্রের জল এমন ফুটফুটে চাঁদের আলোর রাতে সমুদ্রে ঝরে পড়ে কোনও সৌভাগ্যবান ঝিনুকের ওপর। ঝিনুক টুপ করে সেই জলের বিন্দুটিকে ধরে নেয়; তারপর একদিন সেই ঝিনুকের খোলের ভেতর জলের বিন্দুটি হয়ে ওঠে টুপটুপে একটি মুক্তো।”

আই. জি. বললেন, “এইসব গল্পকথা আপনি বিশ্বাস করেন?”

“আমি সব বিশ্বাস করি। পৃথিবীর কোনটা গল্প আর কোনটা সত্য, তা বোঝার জ্ঞান যখন আমার নেই, তখন আমাকে সবই বিশ্বাস করতে হবে। আজও তো সঠিক কেউ বলতে পারলেন না, মানুষ কোথা থেকে এল, কীভাবে এল। কেন সূর্যের আর গ্রহে প্রাণ নেই, মানুষ নেই, পৃথিবীতে শুধু আছে। গল্পই বা কেন কল্পনায় আসে। কে ভেবেছিল প্রথম, যে স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকের পেটে পড়ে মুক্তো হয়! কে ভাবিয়েছিল? কেন সব মৃগের মৃগনাভি হয় না! কেন সব ফুলের গন্ধ হয় না! নাঃ, আমি আর ভাবতে পারি না। আমি বড় ক্লান্ত। আমি কি একটা গরম কাটলেট খেতে পারি?”

ডাক্তারবাবু বললেন, “সে কী, আপনি এখনও একটাও কাটলেট খাননি!”

“না তো? আমাকে তো দেয়নি।”

“আপনি চাইবেন তো!”

“ওই একটা জিনিস আমার আসে না, চাওয়া। আমার মা আমাকে বলেছিলেন, কখনও কারও কাছে কিছু চাইবি না।”

ফরেস্ট অফিসার উঠে পড়লেন। গাছতলায় তাঁর সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পিঠের ওপর গাছের পাতার ছায়া পড়েছে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলছে ফোঁসফোঁস করে। ঘোড়াটার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, “আপনাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে বেশ ভালই লাগছিল; কিন্তু উপায় নেই। রাত প্রায় দশটা বাজল; এইবার আমার ভূত দেখাবার সময়।”

"দেখাবার, না দেখবার?"

"দেখাবার।"

"কাকে দেখাবেন?"

"জঙ্গলে যারা মাঝরাতে কাঠ চুরি করতে আসে, মধু চুরি করতে আসে, শজারু মারতে আসে।"

"ফরেস্ট গার্ড আছে তো! ধরে জেলে ভরে দিন।"

"ক'জনকে ধরবেন? আবার বেশি ধরাধরি করলে, খুন করে দেবে। এ-দেশে দুটো জিনিস মোক্ষম, ভূত আর ভগবান। ভগবান তো আর সাজতে পারব না, ভূত হয়েই ঘুরি।"

ফরেস্ট অফিসার ছবির মতো ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন। সে এক দৃশ্য। চাঁদের আলোয় গাছের ছায়ায় ভয় পাইয়ে দেবার মতো মূর্তি। ঝলমলে পোশাক। মাথায় পাগড়ি। সাদা ঘোড়া। টকাস টকাস করে ঘোড়া এগিয়ে গেল গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে ঘোড়া তিরবেগে ছুটে গেল মাঠ ধরে জঙ্গলের দিকে। চাঁদের আলো চোখের সামনে যেন পরদার মতো দুলছে।

সুদর্শন বললেন, "এই জেলাটাকেই যেন ভূতে ধরেছে। আজ তো কম দিন হল না এখানে এসেছি। কত কী ঘটে গেল! আরও কত কী যে ঘটবে!"

"তা আপনার কেমন লাগছে?" প্রশ্ন করলেন আই. জি.।

"মন্দ লাগছে না। বার তিনেক তো মরতে মরতে বেঁচে গেলুম। নতুন জীবন দিলেন ডাক্তারবাবু। কাল ভাবছি চলে যাব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "কোথায় যাবেন?"

"আবার নতুন কোনও শহরে। নতুন চরিত্র আর ঘটনার সন্ধানে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনাকে যে আমার প্রয়োজন হবে। আপনার কেসহিস্ট্রিটা আমি বিলেতে পাঠিয়েছি। সেখান থেকে ডাক আসবেই; তখন তো আপনাকে তাদের সামনে হাজির করতে হবে।"

ডি. এম. বললেন, "আপনি কি তা হলে নোবেল পুরস্কার পাবেন?"

"পুরস্কারের কথা আমি একদম ভাবছি না। আমি ভাবছি রোগের কথা, আরোগ্যের কথা।"

"আমার মন বলছে, আপনি একটা বড় ধরনের পুরস্কার পাবেন। দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবেন।"

আই. জি. বললেন, আমরা একটা আলোচনা থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি। চিড়িয়াখানা দেবার কথা, না দেওয়া, কমলবাবুর ডাকবাংলো, সুকুর ক্ষোভ, আজ রাতে আমরা যখন সবাই এখানে আছি, তখন এই সবের একটা সমাধান করে গেলে মন্দ কী।"

এস. পি. বললেন, "ঠিক, ঠিক। সুকু, তোমার চিড়িয়াখানাটা কী জন্যে চাই?"

"আমি ওখানে দুস্থ, অসুস্থ পশুদের জন্যে একটা ধর্মশালা করব। পাখি কুকুর, গোরু, ঘোড়া, যারা আহত, বৃদ্ধ, অক্ষম, জীবনের শেষ ক'টা দিন ওরা ওখানে কাটিয়ে যাবে।"

"বাঃ, বাঃ, ভেরি গুড আইডিয়া; কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? খেতে দিতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে।"

সুদর্শন বললেন, "আমি আমার নতুন বইয়ের সমস্ত রয়ালটি সুকুকে এই মুহূর্তে দিয়ে দিলুম। আর আমি নিজে এখানে যতদিন পারি, থেকে যাব। পশুদের বার্ধক্যভবন বড় মধুর পরিকল্পনা।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমি জায়গায় জায়গায় আমার খেলা দেখিয়ে টাকা তুলব।"

নিতু বললে, "আমি গান গেয়ে টাকা রোজগার করব।"

এস. পি. বললেন, "তুমি গান জানো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওর গান শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। জিনিয়াস। ও যদি ঠিকমতো গান শেখে তা হলে কালে বিশাল বড় শিল্পী হবে।"

ডি. এম. বললেন, "আগে বলবেন তো, তা হলে এই আসরে ওর গান একটু শোনা যেত। এই চাঁদের আলোর রাতে আমার ভীষণ গান শুনতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, এখন এমন আর কী রাত হয়েছে, দু'-একটা ভজন শুনলে কেমন হয়!"

নিতু হঠাৎ ফোঁসফোঁস করে কেঁদে উঠল। রাজ্যেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "কী হল! হঠাৎ কী হল?"

সুদর্শন নিতুর মাথায় হাত রাখলেন, "কী হল বাবা? এমন আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন?"

রাজ্যেশ্বরী এগিয়ে গিয়ে নিতুর মাথা বুকে চেপে ধরে বললেন, "তোমার কী হয়েছে বাবা?"

নিতু চাপা গলায় বললে, "চাঁদের আলোয় আমি গান গাইব না মা!"

"বেশ তো, তাতে কী হয়েছে! গেয়ো না গান।"

"এইরকম এক চাঁদনি রাতে, বাবা আমাকে বললেন, খোকা একটা গান কর। আমি গান করছি, মন কেন তুই ভাবিস মিছে। মা যার আনন্দময়ী..."

নিতু কথা শেষ করতে পারলে না। রাজ্যেশ্বরীর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলতে লাগল।

নিতুর গান শুনতে শুনতে নিতুর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কেউ তো কাছে ছিল না। কে ডাক্তার ডাকবে! কে দেবে পরামর্শ! নিতুও বুঝতে পারেনি যে বাবা চলে যাচ্ছেন। চোখ উলটে যাচ্ছে দেখে, নিতু কেবল প্রশ্ন করছিল, বাবা, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে? তুমি কি ঘরে যাবে শুতে। নিতুদের বাড়ির সামনে ছিল ফাঁকা মাঠ। দূরে বাঁধ। চাঁদের আলোয় জল চিকচিক করছে। নিতু আর নিতুর বাবা বসে ছিলেন, একটা খেজুর গাছের তলায়। নিতুর বাবা ধীরে ধীরে সেই গাছতলাতেই শুয়ে পড়লেন। কোনওরকমে নিতুকে বললেন, আমার জন্যে একটু জল নিয়ে আয় তো বাবা। নিতু যখন জল নিয়ে এল, তখন তিনি চলে গেছেন।

রাজ্যেশ্বরী নিতুকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। শেষ রাতে নিতুর খুব জ্বর এসে গেল। ভোরের দিকে সে খুব ভুল বকতে লাগল। কেবলই বলে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি জামাটা পরে এক্ষুনি আসছি।" ওই একই ঘরে আলাদা একটা বিছানায় শুয়ে ছিল সুকু। সে তাড়াতাড়ি উঠে এল। নিতু চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘরে নরম একটা আলো জ্বলছে। সুকু দেখল, নিতুর মুখটা কেমন যেন তপতপ করছে। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিতুর কপালে হাত রাখল। হাতে যেন ছ্যাঁকা লেগে গেল। নিতু থেকে থেকে বলছে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি জামাটা পরে এক্ষুনি আসছি।"

সুকু প্রথমে ডেকে নিয়ে এল মাকে। রাজ্যেশ্বরী বিছানায় নিতুর পাশে বসে চাদর দিয়ে শরীরটা চেপে ধরলেন। দেখতে দেখতে চাদরটা গরম হয়ে উঠল। যেন গরম জলে চোবানো হয়েছে। রাজ্যেশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "নিতুর গা পুড়ে যাচ্ছে। ভুল বকছে। শিগগির বাবাকে ডেকে আন।"

"বাবা তো এই সময় একটু ধ্যানে বসেন মা। কী করে ডাকব?"

"আমার টেবিলে ছোট্ট একটা ঘণ্টা পাবি। সেই ঘণ্টাটা আস্তে আস্তে থেমে থেমে তিনবার বাজাবি। একটু অপেক্ষার পর দেখবি, চোখ মেলে তাকিয়েছেন, তখন আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলবি।"

সুকু ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ছোট্ট ঘণ্টাটা তুলে নিয়ে চিনচিন করে বারকতক বাজাল। ডক্টর মুখার্জি দক্ষিণের জানালার দিকে সোজা বসে ছিলেন স্থির হয়ে। ঘণ্টার শব্দ শুনে মুখ ঘোরালেন। সুকু বলল, "বাবা, মা তোমাকে একবার ডাকছে। ওই ঘরে।"

ডাক্তারবাবু উঠে চটি গলাতে গলাতে বললেন, "কোনও বিপদ?"

"বিপদের মতোই।"

"নিতু পড়েছে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?"

"কাল রাতে ওর শরীর থেকে আমি অসুখের গন্ধ পেয়েছি। ওর মুখে আমি একটা কালো ছায়া দেখেছি।"

ডাক্তারবাবু নিতুর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নিতুর দিকে। তপতপে লাল মুখ। ফরসা কপালটা আপেলের মতো চকচক করছে। সুকুকে বললেন, "আমার ঘর থেকে টেম্পারেচার মিটারটা নিয়ে এসো।"

নিতুর কপালে মিটার লাগানো হল। ১০৫ ডিগ্রি জ্বর। রাজ্যেশ্বরীকে বললেন, "আইসব্যাগের ব্যবস্থা করো। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আমি জানতুম এইরকম একটা কিছু হবে। একের পর এক ওর ওপর দিয়ে যা সব ঘটনা যাচ্ছে।"

এদিকে সবাই যখন নিতুকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাড়ির দরজায় একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। নেমে এলেন, সাদা আলখাল্লা-পরা ছ'ফুট লম্বা এক প্রৌঢ়। মাথার সমস্ত চুল একেবারে ধপধপে সাদা। তেমনি সুঠাম চেহারা। মুখটা ঠিক যেন যিশুখ্রিস্টের মতো। গায়ের রং পাকা জলপাইয়ের মতো। মোটা সিল্কের সাদা আলখাল্লা ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। ডাক্তারবাবুর গেটের সামনে রাজার মতো দাঁড়িয়ে আছেন। টাঙ্গা থেকে লাল রঙের চামড়ার একটা সুটকেস নামাচ্ছে টাঙ্গাওয়ালা। এমন একটা চেহারা দেখে সেও যেন কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেছে। গোরু আর মোষের পাল নিয়ে একদল গোপাল চলেছে। তারাও ফিরে ফিরে সেই মূর্তির দিকে তাকাচ্ছে। ভগবানকে কেউ দেখেনি; তারা ভাবছে ইনিই বোধহয় সেই ভগবান। কোথা থেকে হলুদ রঙের একটা পাখি উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বসল। পাঁচিলের ওপর থেকে নেমে এল একটা কাঠবেড়ালি। সুড়সুড় করে পা বেয়ে উঠতে লাগল পিঠের দিকে। মানুষটি হাসতে হাসতে বললেন, "নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারি না; যেখানে যাব, সেখানেই তোরা ছেঁকে ধরবি।" মানুষটি যখন হাসলেন, দাঁতগুলো যেন ঝলসে উঠল মুক্তোর মতো। পাখিটা কাঁধে বসে ছোট্ট হলুদ ঠোঁট দিয়ে ভদ্রলোকের গালে কুটুর কুটুর করে আদর করছে। কিচিরমিচির করে কী বলছে। লেজ নাচিয়ে শিস দিচ্ছে। সুকুদের বাগানে রঙ্গন গাছে প্রায়ই মৌচাক হয়। এ-বছরেও হয়েছে। বিশাল, প্রায় দু'হাত বড়। সেই চাক থেকে ভেলভেটের মতো মসৃণ ভুসো নীল দশ-বারোটা মৌমাছি উড়ে এসে ভদ্রলোকের বড় বড় চুলে জড়িয়ে গেল। যেন আকণ্ঠ মধুপান করছে। গ্যারাজের ছাতে সুকুদের বাঘ-রঙের বেড়ালটা থুপ্পি মেরে বসে ছিল। বেড়ালটা তড়াক করে লাফিয়ে এসে ধুপ করে ভদ্রলোকের পায়ের কাছে পড়ল; তারপর লেজ তুলে পায়ে গা ঘষতে শুরু করল।

টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়া ছোটাতে গিয়েও পারল না। আবার ফিরে এল। এমন দৃশ্য আগে সে আর কখনো দেখেনি। মানুষের কাঁধে বসে বনের পাখি শিস

দিচ্ছে। গালে টুকুস টুকুস ঠোঁট ঠুকে আদর করছে। পিঠ বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠছে। মাথার চুলে মুখ থুবড়ে দশ-বারোটা ভ্রমর বুজুর বুজুর শব্দ করছে। গাড়ি থেকে নেমে এল টাঙ্গাওয়ালা। সে কেঁদে ফেলেছে, "আপ মহাত্মা হ্যায়। অ্যায়সা তো কভি নেহি দেখা হামে।"

লোকটি পায়ের কাছে বসে পড়েছে, পকেটে যা কিছু টাকাপয়সা ছিল, সব ঢেলে দিয়েছে পায়ের কাছে। কাঁধের পাখিটা উড়ে যায়নি। ঠোঁট ঝুলিয়ে অবাক হয়ে লোকটিকে দেখছে। মুখে লম্বা একটি ক্ষতের দাগ। কপালের পাশ দিয়ে লম্বালম্বি নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। কাঠবেড়ালিটা ওপাশের কাঁধে উঠে লেজ ঝুলিয়ে বসেছে। বেড়ালটা থমকে আছে পায়ের কাছে।

ভদ্রলোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হাসছেন। ঝকঝকে দাঁতের সারিতে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। পায়ের কাছের টাঙ্গাওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি মহাত্মা টহাত্মা নই রে বাবা। উঠে পড়। উঠে পড়। লোকে দেখলে কী ভাববে বল তো। ওঠ বাবা। ওঠ।"

টাঙ্গাওয়ালা মুখ তুলে বললে, "কিরপা কিজিয়ে মহাত্মা।"

ভদ্রলোক পাখিকে বললেন, "টুপুনবাবু, এবার একটা গাছে গিয়ে বোসো, পরে দেখা হবে।"

কাঠবেড়ালিকে বললেন, "বাবুল, তুমি এবার পাঁচিলে চলে যাও। তোমার সঙ্গে পরে খেলা করব। বাদাম খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

কাঠবেড়ালি পিড়িক করে একটা শব্দ ছেড়ে পাঁচিলে লাফ মারল। পাখিটা খুদে ডানা ঝাপটে তিনবার শিস মেরে উড়ে গেল গাছে। ভদ্রলোক তখন অনেকটা ঝুঁকে, কারণ তিনি বিশাল লম্বা, হাত ধরে টাঙ্গাওয়ালাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে তখন আরও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, "তোর কীসের এত দুঃখ? কেন এমন করে কাঁদছিস বল তো? আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।"

"মহাত্মা, আমার অনেক দুঃখ। দুঃখের শেষ নেই; কিন্তু এখন আমি কাঁদছি আনন্দে। পৃথিবীতে এখন এমন মানুষ আছে যে এইরকম করতে পারে।" লোকটি মুখের লম্বা ক্ষতচিহ্নটি দেখাল, "আবার এমন মানুষও আছেন, যাঁর ভেতর শুধু প্রেম। বনের পাখি কাঁধে এসে বসে। আমাকে কিরপা করুন মহাত্মা। আমার একটা মেয়ে ছিল। আমার একটা বউ ছিল। দু'বছর আগে ডাকাতে এসে মেরে দিয়ে গেছে। তরোয়ালের কোপ মেরে আমার মুখ ফালা করে দিয়েছে। মরেই যেতুম। এই ডাগদারসাব আমাকে দুঃখ পাবার জন্যেই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমার আর কেউ নেই। আমি সারাদিন টাঙ্গা চালাই আর গান গাই। আমার মেয়ের ছবি দেখবেন মহাত্মা?"

লোকটি জামার বুকপকেট থেকে একটা ছবি বের করে সামনে ধরল, "এই যে মহাত্মা, এই আমার লেড়কি।"

সেই দীর্ঘকায়, পক্ককেশ ভদ্রলোক ছবিটা হাতে নিলেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। তারপর তিনিও কাঁদতে লাগলেন টাঙ্গাওয়ালার মতো। দু'জনেই সমানে কেঁদে চললেন। হলুদ পাখিটা উড়ে এসে ভদ্রলোকের মাথায় আবার বসেছে। ঠুকুর ঠুকুর টোকা মেরে বলতে চাইছে যেন, 'অত কান্না কীসের! অত দুঃখ কীসের। সব মিলিয়েই তো পৃথিবী।' পাখিটা জোরে শিস দিয়ে উঠল। বলতে চাইল, 'সব ভুলে আমার মতো গান গাও।'

ভদ্রলোক টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন, "নে, হাত পাত।"

টাঙ্গাওয়ালা হাত পাতল। পকেট থেকে একটা রুদ্রাক্ষ বের করে ভদ্রলোক তার হাতের তালুতে রাখলেন, "এটাকে সাবধানে রাখবি। সব সময় কাছে রাখবি; আর সারাদিনে একটাও অন্তত ভাল কাজ করবি।"

"ভাল কাজ কাকে বলে মহাত্মা?"

"তোর নাম কী?"

"আমার নাম রবি।"

"বেশ, এমন কাজ করবি; যাতে রাতে একটা লোকও বলে, শুতে যাবার আগে, রবি আমার জন্যে আজ যা করেছে! আজ একজন মানে, বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি জন। তুই যদি আরও চল্লিশ বছর বাঁচিস তা হলে ক'জন হল? তিনশো পঁয়ষট্টিকে চল্লিশ দিয়ে গুণ কর। যা, তোর সংসার গেছে তো কী হয়েছে, জগৎ-সংসার তো আছে! জেনে রাখ, ওই যে মাথার ওপর আকাশ, ওই হল সব মানুষের ছাদ। আর এই যে পায়ের তলায় মাটি, এই হল সব মানুষের মেঝে। এ-দুটো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এর মাঝে আমরা পেষাই হব দুটো চাকির মাঝে গমের দানার মতো। শেষে একদিন মিহি ময়দার মতো ফুস করে উড়ে যাব। যাও, এবার চলে যাও নিজের কাজে।"

॥ ৪৬ ॥

দূর, দূর পথের বাঁকে টাঙ্গা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মহাত্মা ভদ্রলোক ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবুর বাংলোর বারান্দার দিকে। হাতে একটা সামান্য ক্যাম্বিশের ব্যাগ। তাতে যা কিছু সামান্য জিনিসপত্র। ভদ্রলোক হাঁকলেন, "কোই হ্যায়।"

রুকু দরজা খুলে বারান্দায় আসছিল। বিশাল চেহারার সৌম্যদর্শন মানুষটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল, "আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"পলাতক আসামিকে।"

"তিনি কে?"

"এইটাই তো ডাক্তার মুখার্জির বাড়ি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই বাড়িতেই কমল নামক এক শিশু লুকিয়ে আছে।"

"কমলকাকু! কমল ভৌমিকের কথা বলছেন তো?"

"হ্যাঁ গো। তিনি কারও কাকু, কারও জেঠু। কারও দাদা। কারও কাছে কমল পাঁঠা। কোথায় আমার সেই কমল পাঁঠা?"

বলতে বলতেই কমল ভৌমিক বেরিয়ে এসেছেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চোখে-মুখে আশ্চর্য বিস্ময়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, সামনে দাঁড়িয়ে গুরুজি। তাঁর গুরুজি। এখানে এলেন কী করে চিনে চিনে!

কমল ভৌমিককে দেখে ভদ্রলোক প্রথমেই বললেন, "এই যে ছাগল, আবার তুমি দড়ি ছিঁড়ে ঠিক পালিয়ে এসেছ? বটপাতা দিয়ে, এত করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কয়েক মাসের জন্যে কংখল গেলুম, বলে গেলুম কমল সাধনপীঠ ছাড়িসনি, তুই ব্যাটা সেই পালিয়ে এলি?"

কমল ভৌমিক গুরুজি বলে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "প্রণাম পরে হবে। আগে কান ধরো। ধরো কান।"

কমল ভৌমিক দু'কান ধরলেন।

"নাও, বারোবার ওঠবোস করো। এক...দুই...তিন...।"

পেছনে ডাক্তারবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তো অবাক! এ আবার কী? কে এই ভদ্রলোক? কমলবাবুরই বা এ-দশা কেন? ডাক্তারবাবুকে দেখে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। তাঁর উপস্থিতি স্বীকার করলেন কিন্তু গোনা থামালেন না, "পাঁচ, ছয়, সাত, আট...।"

কমল ভৌমিক কান ধরে স্কুলের ছেলের মতো উঠছেন আর বসছেন। বসছেন আর উঠছেন। ছোটরা সব হাঁ করে দেখছে। দরজার ওধারে রাজ্যেশ্বরী আর সুদর্শন এসে দাঁড়িয়েছেন। সুকুর বেড়াল টবু আর কুকুর টাবুও এসে গেছে। টাবু কমল ভৌমিকের শাস্তি দেখে উঁ উঁ করে কাঁদছে।

বারোবার ওঠবোস হয়ে গেল। কমল ভৌমিক অপরাধীর মতো মুখ করে তাঁর গুরুজির সামনে দাঁড়ালেন। গুরুজি বললেন, "বেশ একটু মোটা হয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। আলস্যের ফল। মনের আনন্দে, কাজকর্ম ছেড়ে বেশ তোয়াজে আছ তো, তাই শরীরে মেদ জমে গেছে। চলো, এক্ষুনি আমার সঙ্গে

চলো। হাঁটা পথে পরেশনাথ পাহাড়।”

ডাক্তারবাবু বললেন, “এই মোটাটা মোটা নয়। অসুখে ফুলে উঠেছেন। সুখে নয়, অসুখে। অ্যালার্জি। দিন-দুই আগে যা হয়েছিল, তা দেখলে তো চমকে উঠতেন। চেহারা চার ডবল হয়ে গিয়েছিল।”

“নিশ্চয় চিংড়িমাছ খেয়েছিল?”

“না, না। চিংড়িমাছ কোথায় পাবেন। সে অনেক ব্যাপার। আপনি আগে আসন গ্রহণ করুন। বিশ্রাম করুন, তারপর সব শুনবেন।”

“আপনিই তো ডক্টর মুখার্জি? আমার নাম তপেশ্বর। আমি কমলের গুরু। শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু। কমলকে আমি প্রথমে বাঁচিয়েছি, তারপর মানুষ করেছি। আমিও একজন ডাক্তার। এফ. আর. সি. এস.। একসময় কলকাতার লোক আমাকে একনামেই চিনত।”

“আপনিই কি সেই বিখ্যাত ডা. তপেশ্বর রায়? হঠাৎ যিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ, আমিই সেই তপেশ্বর।”

“আপনি আমার বাবাকে বাঁচিয়েছিলেন।”

“কী নাম?”

“বিভূতি মুখার্জি।”

“আই সি! তুমি বিভূতির ছেলে! তাই যেন তোমাকে প্রথম থেকেই চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কী আশ্চর্য!”

“তা হলে এইবার একটু বসুন।”

“তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। না দিন তো নয়, দাও। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বিভূতির ছেলে হয়ে এই আলস্য, এই কর্তব্যবিমুখতা কেন প্রশ্রয় দিলে? একটা জোয়ান ছেলে সব ছেড়ে খাচ্ছে দাচ্ছে আর ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। সময় চলে গেলে, সময় ফিরে আসে? না, না, কোনও কথা নয়, সময় কি ফিরে আসে?”

“আজ্ঞে না, সময় ফিরে আসে না; তবে কী জানেন, কমলবাবু পাকেপ্রকারে আটকে পড়েছেন। সে এক দীর্ঘ কাহিনি। পরিস্থিতি ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।”

“ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসার শিক্ষা যদি না পেয়ে থাকে, তা হলে ও আমার কেমন শিষ্য, আমিই বা কেমন গুরু।”

“যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে।”

“হয়ে গেছে মানে? হয়ে গেলেই হল! এইভাবেই তো সব হয়ে যাবে। অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে।”

কমল ভৌমিক খাটো গলায় বললেন, “গুরুজি, এবারকার মতো আমাকে

ক্ষমা করে দিন। এখানে আমি বেশ কিছু কাজ করেছি। একদল অপরাধীকে একেবারে নাকের জলে চোখের জলে করে দিয়েছি। সেসব আপনি পরে শুনবেন।”

ডক্টর মুখার্জি বললেন, “আর তো আমি দাঁড়াতে পারছি না, ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।”

গুরুজি বললেন, “হাসপাতাল? কার আবার কী হল? আমি কোনও সাহায্য করতে পারি? ডাক্তারি শাস্ত্রটা এখনও ভুলিনি।”

“নিশ্চয় পারেন। অনুগ্রহ করে একবার এই ঘরে আসুন।”

সবাই আবার নিতুর মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছেলেটা জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। ভুল বকাটা নেই; কিন্তু উঁ-আঁ করছে। মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। গুরুজি রুগিকে ভাল করে দেখলেন। তারপর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কী মনে হচ্ছে?”

“ম্যানেনজাইটিস নয় তো?”

“আচ্ছা এ কি কোনও জঙ্গলে গিয়েছিল?”

“গিয়েছিল।”

“তা হলে এ হল হে-ফিভার।”

“হে-ফিভার হলে তো হাঁচি হবে, কাশি হবে।”

“সেই ব্যবস্থা করছি। দেখি, পাতলা একটুকরো কাগজ।”

সবাই কেমন যেন অবাক হয়ে গেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে এই মানুষটি এলেন। এমন দিব্যকান্তি, সুবিশাল আকৃতি, ইচ্ছে করলে এই ঘরের প্রত্যেককে তুলে তুলে ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন। কমল ভৌমিক একটুকরো পাতলা কাগজ তাঁর হাতে দিলেন। গুরুজি কাগজটাকে সরু করে পাকিয়ে নিতুর নাকে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। নিতু সামান্য উসখুস করে হাঁচতে আরম্ভ করল। একের পর এক। হাঁচতে হাঁচতে শেষে উঠে বসল। নিতু চোখ খুলেছে।

গুরুজি বললেন, “ওকে এবার গরমজলে তোয়ালে ভিজিয়ে ভাল করে স্পঞ্জ করে দাও। আর নুন-লেবু দিয়ে এক গেলাস গরমজল খাইয়ে দাও, তারপর দেখা যাক কী হয়!”

ডক্টর মুখার্জি বললেন, “ঠিক এই ধরনের চিকিৎসা আমি আগে কখনও দেখিনি।”

“দেখবে কী করে, তোমরা হলে আধুনিক ডাক্তার। বড়লোকের ডাক্তার। তোমাদের কত সব যন্ত্রপাতি। আমরা হলুম প্রাচীন। হেটো ডাক্তার। গাছতলায় বসে চিকিৎসা করি। চোখ আর হাতই আমাদের সম্বল।”

“থার্মোমিটার দিয়ে ওর জ্বরটা তা হলে একবার দেখি।”

"থার্মোমিটারে কী প্রয়োজন? আমি হাত দিয়ে বলে দিচ্ছি।"

গুরুজি দু'আঙুলে নিতুর নাড়ি টিপে ধরলেন। মিনিটখানেক ওইভাবে থাকার পর বললেন, "আগে কত উঠেছিল জানি না। এখন একশো পয়েন্ট চার।"

নিতুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, তুমি দুপুরের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে।"

গুরুজি প্রথমে স্নান করলেন, তারপর এক গেলাস মোটা পুরু ঘোল খেয়ে শান্ত হয়ে বাগানে গাছতলায় বসলেন। কমল ভৌমিকের অনুপস্থিতিতে কলকাতার বিশাল আখড়া একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে রুগি আসে তো ডাক্তার আসেন না। নাইট স্কুলে ছেলেরা আসে, গল্প করে বাড়ি ফিরে যায়। সব একেবারে নয়ছয় অবস্থা। গুরুজি বলছেন আর কমলজি মুখ চুন করে সব শুনছেন। শেষে গুরুজি বললেন, "তোমার এখন পরিকল্পনাটা কী?"

একটু ইতস্তত করে কমলজি বললেন, "এই জায়গাটা আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে।"

"তা অনেকদিন তো রইলে, এইবার নিজের জায়গায় ফিরে যাও।"

"তা হলে আমি কাল সকালের ট্রেনেই ফিরে যাই। আমার আর কী, আমার তো কোনও বন্ধন নেই। গায়ে জামাটা গলাব, চটিটা পায়ে পরে নেব, ক্যাম্বিশের ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাব, পটাপট পটাপট বেরিয়ে যাব। আমি গেরুয়া না পরলেও সন্ন্যাসী। বউদিকে তা হলে খবরটা জানিয়ে দিই।"

গুরুজি ধ্যানস্থ হয়ে গাছতলায় বসে রইলেন। আবার সেই এক ঘটনা। সেই হলুদ পাখিটা কোথা থেকে উড়ে এসে কাঁধে বসল। এবার তার নাচানাচি আরও বেড়েছে। সরু লম্বা ঠোঁট দিয়ে কানের ভেতর টুকুর টুকুর করছে। একবার এ-কাঁধে বসছে, একবার ও-কাঁধে। কখনও মাথায়। সেই কাঠবেড়ালিটা আবার এসেছে। এবার একেবারে কোলে। গুরুজি চুপচাপ বসে বসে মজা দেখছেন। কাঠবেড়ালিটা একবার করে কোলে এসে লুকোচ্ছে, আবার ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। লেজ তুলে পিড়িক পিড়িক করছে। রঙ্গন গাছে ঝুলছে বিশাল মৌচাক। মৌমাছির একটা ঝাঁক গুরুজির মাথার ওপর ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে। নানা রঙের ডজনখানেক প্রজাপতি কাগজের টুকরোর মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতিতে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে।

সাইকেলে চেপে একজন ডাকপিয়ন এসে গেটের সামনে নামল। লোহার ডান্ডা দিয়ে গেট বাজাতে লাগল। যেন জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। লোকটির চেহারাটা ভারী সুন্দর। সরষের তেলের মতো গায়ের রং। গেটের লোহায় জলতরঙ্গ

বেজেই চলেছে। বেশ ভালই বাজাচ্ছে। বাজনা শুনে রাস্তার একটা পাহাড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। সুকু ছুটে এল। পিয়নদাদাকে সে খুব ভালবাসে। বাবার জন্যে দেশ-বিদেশের চিঠি আনে। রকমারি ডাকটিকিট।

সুকু সামনে এসে দাঁড়াবার পরও লোকটির বাজনা শেষ হল না। আরও মিনিটখানেক চালিয়ে তিনবার তেহাই মেরে শেষ করল। একমুখ হাসি। জিজ্ঞেস করল, "কেমন হল খোকাবাবু? আজ থানা মাঠের ফাংশানে যাবে তো?"

সুকু বলল, "না গো! আমাদের বাড়িতে অনেকে এসেছেন। খুব কাজ আছে।"

"আমি আজ বাজাব! ভাবছি এই গতটাই বাজাব। কেমন, ভাল হবে না?"

"জমে যাবে।"

পিয়ন একগাদা চিঠি আর কাগজপত্র দিয়ে চলে গেল সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে। বেলা বাড়ছে। দূরের পাহাড়টা আকাশের গায়ে ক্রমই কালো হয়ে উঠছে। চড়া রোদ যেন ঝিমঝিম করে সেতার বাজাচ্ছে। সুকু বাবার টেবিলে চিঠিগুলো রাখল। কমল ভৌমিক ঘরে এলেন। দু'চোখে জল চিকচিক করছে। সামান্য ধরা গলায় বললেন, "ডিয়ার সুকু, এখানে আজই আমার শেষ দিন। চলো, একবার ওই ভগবান টিলা থেকে ঘুরে আসি। তুমি আমাকে দুটো জিনিস জোগাড় করে দাও। একটা বাবুইয়ের বাসা, আর টিয়াপাখির কিছু হলুদ পালক। ওই সাঁকোর নীচে অনেক পড়ে আছে আমি দেখেছি।"

সুকু অবাক হয়ে বলল, "শেষ দিন মানে?"

"আমি তো কাল সকালেই চলে যাচ্ছি সুকু।"

"সে কী, আপনি যাবেন! চলে যাবেন? আমাদের কত কী যে করার ছিল!"

"না ভাই, আমাকে যেতেই হবে। আমার গুরুজি ভীষণ রাগ করছেন। দেখলে না, কান ধরে ওঠবোস করালেন। আমি গুরুজিকে ভীষণ ভয় করি। বাঁ হাতে আমার ঘাড়টা যদি চেপে ধরেন সাতদিন মাথা তুলতে পারব না।"

"আমরা যদি গুরুজিকে গিয়ে বলি, বাবা, মা, আমি, দাদা?"

"কিছুতেই কিছু হবে না রে ভাই। ভীষণ কড়া। একটাই উপায় আছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়ে গুরুজিকেই আটকে ফেলা।"

"কী ঘটালে গুরুজি আটকে যাবেন?"

"ধরো, কারও সাংঘাতিক অসুখ, কি ধরো, হঠাৎ এই বাড়িটা কেউ আক্রমণ করল বা ভয় দেখাল আক্রমণ করবে। সুখের সংসারে গুরুজি থাকেন না, দুঃখের সংসারে বুক দিয়ে আগলাবার জন্যে নেমে পড়েন। তুমি একটা বিপদ তৈরি করো; তখন দেখবে আমাকে বলছেন, থেকে যাও। পাশে দাঁড়াও।"

"বিপদ! কী বিপদ তৈরি করা যায় কাকু?"

"কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, যখন এল তখন পরপর বিপদ এল আর যখন বিপদের প্রয়োজন তখন সব বিপদ কেটে গেল। একটু পরেই বিকেল, বিকেলের পরই সন্ধে, তারপর রাত, তারপর ভোর, তারপর সেই বিশ্রী, বিকট কলকাতা। এইটুকু সময়ের মধ্যে আর কী বিপদ আসবে!"

কমল ভৌমিক দুঃখ দুঃখ মুখ করে বাগানের দিকে চলে গেলেন। তাঁর গুরুজি সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত বাগানেই বসে থাকবেন। ঘর সংসার তাঁর ভাল লাগে না একেবারে। চারপাশে চারটে দেওয়াল আর মাথার পরে ছাদ তার ভেতরে তিনি যেন খাঁচায় বন্দি পাখি! তিনি বলেছেন, রাতের বেলায় বারান্দায় নিজের কম্বল বিছিয়ে শোবেন। সকালবেলা কমল ভৌমিককে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। কলকাতায় নয়, নিয়ে যাবেন কংখলে। সেখানে কমল ভৌমিককে স্নান করিয়ে, উপবাসে রেখে, সাধনভজন করিয়ে সংস্কার করবেন। কমল ভৌমিকের ভেতর পাপ ঢুকেছে। অসুখ ঢুকেছে। মুখের জ্যোতি কমে গেছে। কে জানে, তাই হয়তো হবে।

সুকু নিতুর ঘরে এল। ছেলেটা সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ে ভোম্বলা হয়ে বসে আছে। জ্বর কমে এসেছে। চোখ-মুখের লাল ভাব ক্রমশই কমে আসছে। সুকু বলল, "নিতু, তোমার এইসময় জ্বর হয়ে গেল ভাই, আমাদের খুব বিপদ, গুরুজি কমলকাকুকে কালই এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কী হবে ভাই!"

নিতু মাথার মুড়ি খুলে বললে, "চলো না, আমরা গুরুজিকে গিয়ে ধরি।"

"হবে না ভাই। ভীষণ কড়া ধাতের মানুষ।"

"তাতে কী হয়েছে। আমরা তো ছোট। ছোটরা বড়দের গিয়ে ধরতেই পারে। আমরা বলব, আপনি যেমন কমলকাকুর গুরু, কমলকাকু সেইরকম আমাদের গুরু। ওঁর কাছে আমাদের কত কী শেখার আছে।"

নিতু খাট থেকে নেমে পড়ল। আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে এগিয়ে চলল বাগানের দিকে। আজ আবার খুব উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। শীত আসার আর দেরি নেই। নিতুকে দেখে সুকুর মনে হল, যেন এক দেবদূত চলেছে।

॥ ৪৭ ॥

কমলকাকুর গুরুদেব একজন বড় ডাক্তার। বিলেতফেরত ডাক্তার। একসময় তাঁর ভীষণ নামডাক ছিল। বড় বড় সব অপারেশন করতেন। দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বড় বড় শহরে তাঁর ডাক পড়ত। হঠাৎ ডাক্তারি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে

গেলেন। কিছুদিন তাঁর আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না। অত বড় একজন ডাক্তার কলকাতার বুক থেকে স্রেফ হারিয়ে গেলেন যেন। যেমন হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিলেন, সেইরকম হঠাৎই আবার ফিরে এলেন একদিন। একেবারে অন্য মানুষ। যেখানে যা কিছু ছিল নিজের, সব দান করে দিলেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী ধরনের পাগলামি?"

ডাক্তারবাবু সকলকেই এক জবাব দিলেন, "চিকিৎসার চেয়ে প্রয়োজনীয় হল স্বাস্থ্য। হাড়জিরজিরে, পেটমোটা, রুগ্ণ বাঙালিকে পিটিয়ে লোহার শরীর তৈরি করতে হবে। আত্মরক্ষার কায়দা শেখাতে হবে; আর কুচুটে, পরনিন্দুক, পরশ্রীকাতর মনকে উদার করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দই হলেন আমাদের আদর্শ, আমাদের পথ। প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিয়োর।"

সন্ন্যাসী ডাক্তার খুলে বসলেন এক জিমনাশিয়াম। তিব্বত পেরিয়ে গিয়েছিলেন চিনে। সেখান থেকে শিখে এসেছেন খাদ্য-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, আত্মরক্ষার নানা কায়দা। জাপান থেকে শিখে এসেছেন জুজুৎসু, সামুরাই। তিব্বত থেকে শিখে এসেছেন ধ্যান আর যোগ। কমল ভৌমিক তাঁর এক নম্বর ছাত্র। ডান হাত। বছরে একবার তিন মাসের জন্যে হিমালয়ে চলে যান। বরফের রাজ্যে নির্জন সাধনা করে ফিরে আসেন।

সেই সন্ন্যাসী ডাক্তার আজ সুকুদের বাগানে। বসে আছেন গাছতলায়। বসে-বসে পড়ছেন ডাক্তারি বই। ডাক্তারি ছাড়েননি। তবে চিকিৎসা করেন বিনা পয়সায়। রুগিরা টাকা দিতে এলে বলেন, "আমাকে নয়, ফি-টা নিজেকে দাও। ওই পয়সায় ভাল খাবার খাও। পেটে দাও, পেটে।"

সুকু আর নিতু বাগানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে, দু'জনে দু'পাশে বসল। ডাক্তার সন্ন্যাসী বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন। গম্ভীর মুখ। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। এমন চোখ সুকু আগে কখনও দেখেনি। সে কী বলতে এসে কী বলে ফেলল। বলতে এসেছিল কমলকাকুকে রেখে যাবার কথা, বলে বসল, "মানুষের এমন সুন্দর চোখ কী করে হয়?"

সন্ন্যাসী ডাক্তার সুকুর কাঁধে হাত রাখলেন। হাত রাখামাত্রই সুকুর শরীরটা যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কী যে তার হল, সে নিতুকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তাঁকে প্রশ্ন করল, "আপনি আমার কাঁধে হাত রাখামাত্রই আমার এমন কেন করছে শরীরটা?"

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন, "তোমার আধারটা ভাল, তাই অমন করছে। আমার এই হাত দুটো অনেকদিন কোনও অন্যায় করেনি। কারও কোনও ক্ষতি করেনি। হিংসা করেনি। হত্যা করেনি। জানো তো, হাত হল মনের দাস। আমার এই হাত দুটো আর মনের দাসত্ব করে না, তাই তোমার শরীরে

ওইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। তোমার মনের ভাবের সঙ্গে আমার হাতের ভাব মিলে গেছে। ভাবে ভাবে মিলে গেলে, মানুষের শরীরে একটা তরঙ্গ খেলে যায়।”

“আপনার মতো চোখ?”

“মাটির দিকে কম তাকিয়ে উদার আকাশের দিকে বেশি তাকালে চোখের চেহারায় একটা পরিবর্তন আসে। তুমিও তাকানোর অভ্যাস করলে তোমার চোখও আমার চোখের মতো হয়ে যাবে।”

“আপনার মতো হতে গেলে আমাদের কী কী করতে হবে?”

“মন আর শরীরের সাধনা করতে হয়।”

“আমরা তাই করব। কিন্তু কে করাবেন?”

“কেন? আমার কমল করাবে।”

“কমলকাকুকে তো আপনি নিয়ে যাচ্ছেন জেঠু।”

“নিয়ে যাচ্ছি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?”

“কলকাতায়।”

“তাও তো বটে!”

“জেঠু, আমাদের যে অনেক পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনায় কমলকাকুকে যে আমাদের প্রয়োজন।”

“তোমাদের পরিকল্পনা! তোমরা তো ছোট। তোমরা লেখাপড়া করবে, খাবেদাবে, খেলবে। বড় হবে। তোমাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?”

নিতু বললে, “সুকুদা প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয়।”

“তাই নাকি? আর তুমি?”

নিতু কোনও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

সুকু বললে, “নিতুর একটু অসুবিধে হয়ে গেছে। তবে লেখাপড়ায় নিতু খুব ভাল।”

“অসুবিধা হয়ে গেছে মানে? নিতু তোমার কে হয়?”

“নিতু আমাদের নতুন ভাই।”

“নতুন ভাই মানে?”

“অদ্ভুত একটা ডোরাকাটা জামা পরে নিতু একদিন এই শহরে এল তার মামার কাছে। সেই মামা আবার কীসব অন্যায় কাজ করার অপরাধে হাজতে। তারপর নিতুকে একদল গুন্ডা কিডন্যাপ করে নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। কমলকাকু উদ্ধার করে এনেছেন। সব মিলিয়ে এত বড় ঘটনা যে, একটা উপন্যাস লেখা হয়ে যায়। নিতু এখন আমাদের ভাই। ওকে স্কুলে ভরতি করা হবে।”

"তোমাদের এখানেও চোর-ডাকাত-গুন্ডা আছে?"

"আমরা মনে করতুম নেই, হঠাৎ কোথা থেকে গাদা গাদা সব বেরিয়ে পড়েছে। অজস্র বদমাশ।"

"ডাকো কমলকে। ডেকে আনো। ওকে আমি ভীষণ বকব।"

"কমলকাকুর তো কোনও দোষ নেই, জেঠু।"

"অবশ্যই আছে। যেখানে কমল, সেখানে গুন্ডা-বদমাশ থাকা মানে আমার শিষ্য জলে গেছে। ডাকো তাকে।"

সুকু ছুটে গেল কমলকাকুর ঘরে। জামাকাপড় সব ব্যাগে ভরে ফেলেছেন কমলকাকু। ছড়ানো বইপত্র, কাগজ সব গুছিয়ে টেবিলের একপাশে সাজিয়ে ফেলেছেন। বিছানার চাদর ঝেড়ে টানটান করে পেতেছেন। ঘরে পা রেখেই সুকুর মনে হল, সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। যাই যাই সুর বাজছে ঘরে। কমলকাকু একটা চেয়ারে বসে আছেন গালে হাত রেখে। দেখে সুকুর খুব খারাপ লাগল। সুকুকে ঢুকতে দেখে কমল ভৌমিক বললেন, "সকাল হতে আর ক'ঘণ্টা বাকি আছে বলো তো?"

"সকালের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? এখন তো সবে দুপুর!"

"সকাল হলেই, বুঝলে সুকু, এই ব্যাগটা কাঁধে তুলব, তুলে গ্যাটম্যাট, গ্যাটম্যাট চলে যাব স্টেশনে। কী আছে, বাগান পেরিয়ে গেট। গেট পেরিয়ে রাস্তা সোজা স্টেশনে। কী আছে? চলে যা। ট্রেন আসবে। ট্রেনে জানলার ধারে বসব। পাহাড় দেখতে দেখতে, বন দেখতে দেখতে সোজা কলকাতা। কলকাতার চেয়ে সুন্দর জায়গা আর আছে।"

সুকু বলল, "আপনাকে ডাক্তার জেঠু বাগানে ডাকছেন।"

তার মানে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বেন আর কী। স্টেশনে গিয়েই রাত কাট'বেন। সংসারে ঢুকতে রাজি নন। সারারাত প্ল্যাটফর্মে," কমল ভৌমিক গাছতলায় হাজির হওয়ামাত্রই সন্ন্যাসী ধমকে উঠলেন, "তুমি শুধু অপদার্থ নও, ডবল অপদার্থ। তোমাকে আমি কী বলেছিলুম কমল?"

কমল ভৌমিক কেমন যেন হয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, "আমি তো সব বাঁধাছাঁদা করে ফেলেছি আজ্ঞে।"

"আরে বাঁধাছাঁদা যদি করে ফেলেই থাকো, তো এখানে এত গুন্ডা-বদমাশ ঘুরছে কী করে। এই আমাকে ওরা সব বললে, এই ছোট্ট ছেলেটাকে কিডন্যাপ করেছিল। এ-দেশটা কি আমেরিকা?"

"বাঁধা মানে, আমি আমার জামাকাপড় সব বেঁধে ফেলেছি, কাল সকালের জন্য আর অপেক্ষা করে থাকিনি।"

"তোমার জামাকাপড়ের কথা ছাড়ো, গুন্ডা-বদমাশের কথায় এসো। পাশ

কাটাবার চেষ্টা না করলেই সুখী হব। তোমাকে আমি কী শিক্ষা দিয়েছিলুম, অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে উভয়পক্ষই সমান অপরাধী। এক বছর লাগুক, দু'বছর লাগুক, তুমি এইসব ছোটদের বড় হবার জন্যে একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করো।"

সুকু বললে, "জেঠু, আমরা তো সেই পরিকল্পনাই করেছি। এখন কমলকাকু চলে গেলে আমাদের সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তখন থেকে পরিকল্পনা পরিকল্পনা করছ, কী তোমাদের পরিকল্পনা?"

সুকু কমল ভৌমিককে বললে, "কাকু, বলুন না, আমাদের পরিকল্পনার কথা।"

কমল ভৌমিক বসলেন। বসে বললেন, "আমরা উইলিয়ামসন সাহেবের পোড়ো-বাংলোটা নেবার চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা স্বামীজির আদর্শে একটা 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সমিতি' স্থাপন করব। সেখানে শিশু, কিশোর আর যুবকদের সবকিছু শেখানো হবে। লেখাপড়া, ধ্যান, শরীর চর্চা, আত্মরক্ষার উপায়। এই জেলার এস. পি. আমার ছাত্র। সে আমাদের সাহায্য করবে। এখানকার ডি. এম. আমাদের বন্ধু।"

"ছেলেরা তোমার কাছে আসবে কেন? সে যুগ কি আর আছে। তারা এ-কালের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। ব্যাবসা করবে। চাকরিবাকরি করবে। বড়লোক হবার সাধনা করবে। এই বিশাল বিশাল সব ভুঁড়ি বাগাবে। তোমার আত্মান্নতিতে কেউ আসবে না। তা ছাড়া টাকা পাবে কোথা থেকে?"

"ভাল কাজে কি টাকার অভাব হয়?"

"আজকাল হয়। তুমি মানুষকে ত্যাগ শেখাবে, ধ্যান শেখাবে, সাধনা শেখাবে, যা শিখলে এক পয়সাও রোজগার হবে না, কে আসবে বাবা তোমাকে সাহায্য করতে। সবাই তো আর এই ছেলে দুটোর মতো মন নিয়ে জন্মায়নি।"

কমল ভৌমিক হতাশ হয়ে বললেন, "আপনি এমন কথা বলছেন! আপনার কি তা হলে সত্যিই বয়েস হয়ে গেল?"

"বয়েস তো হয়েইছে, সেই সঙ্গে হয়েছে অভিজ্ঞতা।"

"তা হলে আমি কী করব?" কমল ভৌমিক উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"তুমি যা করতে চাইছ, তাই করবে। দেখো না কী হয়।"

"তা হলে এই যে একটু আগে আপনি অন্যরকম বলছিলেন।"

"তোমার মনের জোর পরীক্ষা করছিলুম। তা দেখলুম, তোমরা ফেল করলে। পাশ করতে পারলে না।"

সুকু বললে, "আমি কিন্তু হতাশ হইনি। আপনি যখন ওইসব বলছিলেন,

আমি তখন মনে মনে ভাবছিলুম, আমার পশু হাসপাতাল আমি করবই, আর আমার বন্ধুদের নিয়ে বক্সিং শেখার একটা আখড়া আমি করবই, করবই করব।"

"ভেরি গুড, মাই ডিয়ার বয়। তোমার মধ্যে বড় হবার সব গুণ আছে। তোমার দৃষ্টি আছে, তোমার প্রশ্ন আছে। কিন্তু পশু হাসপাতালটা কী? পশু হাসপাতাল করে কী হবে? ও তো সরকারি ব্যাপার।"

"ঠিক হাসপাতাল নয়। পশুভবন। নিরাশ্রয় পশু, আর অসুস্থ আহত পাখিদের সেখানে রাখা হবে। কত বেড়াল, কত কুকুর আর গোরু না খেয়ে মরে!"

"তুমি এইরকম একটা কিছু করবে নাকি? আমি তোমার দলে আছি। ভীষণ ভাল পরিকল্পনা। মানুষের নিষ্ঠুরতা আর উদাসীনতায় জীবজগৎ শেষ হয়ে আসছে। কাম অন বয়, আই উইল বি উইথ ইউ।"

"তা হল কথা দিন, আপনি এখানেই থাকবেন, আর কোথাও যাবেন না।"

"দেখো বাবা, একটা জায়গায় চিরকালের জন্য আটকে থাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব? তবে কথা দিচ্ছি, তোমার পশুভবন আমি গড়ে দিয়ে যাব। আর টাকা? টাকার অভাব হবে না। আমার অনেক টাকা আছে। সারাজীবনের রোজগার।"

ঝাঁঝাঁ করে একটা জিপ এসে গেটের সামনে থামল। এস. পি.-র দলবল। এস. পি. আজ পুরোদস্তুর পোশাক পরে আছেন। হাতে কালো কুচকুচে একটা ডান্ডা। ডান্ডাটা বাঁ হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছেন। আসছেন আর বলছেন, "গুড নিউজ, গুড নিউজ।"

সুকু ছুটে গেল। সন্ন্যাসী ডাক্তার কমল ভৌমিককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, পুলিশ কেন?"

"ওই তো আমার ছাত্র। এখানকার এস. পি.।"

এস. পি. গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "উইলিয়ামসন সাহেবের বাংলোটা আপনাকে দেওয়া হবে।

॥ ৪৮ ॥

বেশ বড় একটা সভা বসে গেল সুকুদের বাগানে। সূর্য পশ্চিমদিকে হেলতে শুরু করেছে। বিদায় নিতে চলেছে আরও একটা দিন। এইসময় সুকুর মনটা ভীষণ মুষড়ে পড়ে। সব পাখি বাসায় ফিরে যাবে। জীবজগৎ ঘুমিয়ে পড়বে।

দিনের সব ফোটা ফুল নিস্তেজ হয়ে আসবে। যত প্রজাপতি উড়ছিল, সব অদৃশ্য হয়ে যাবে। দূর পাহাড়ের দিক থেকে কেউ চিৎকার করে উঠবে, হেই হো। গেটের সামনের পথ দিয়ে একপাল গোরু বাড়ি ফিরবে। তাদের গলায় বাঁধা ছোট ছোট ঘণ্টার টিংলিং শব্দ।

সন্ন্যাসী ডাক্তার চুপচাপ বসে আছেন পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে। সারাদিন তিনি কিছু আহার করেন না। সন্ধে উতরে গেলে তিনি সামান্য কিছু খান। কমল ভৌমিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী খাবেন আজ? তিনি বলেছেন, ছাতু খাবেন। আর খাবেন পেঁপে। সুকুর মা শুনে বলেছিলেন, 'সে কী? শুধু ছাতু খাবেন! কেন?"

অন্যের হাতের রান্না তিনি খান না। এ-নিয়ম আজকের নয়, বহুদিনের।

শুনে সুকুর মা খুব দুঃখ পেয়েছেন। কমল ভৌমিক বুঝিয়েছেন, "আপনি দুঃখ পাবেন না বউদি। উনি একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ।" রাজ্যেশ্বরী আর কোনও কথা না বলে সোজা ছাদে গিয়ে গুম মেরে বসে আছেন। সন্ন্যাসী ডাক্তার কী ভাবেন, তিনি কি অস্পৃশ্য, অশুচি! নিতু এসে চুপ করে পাশটিতে বসে আছে। এই সন্ধের মুখটা তারও ভীষণ মন খারাপ হয়। বাবার কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাদের সেই বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়িটার কথা। অল্প দূরে বয়ে চলেছে শোন নদী। নিতু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাজ্যেশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে নিতুকে টেনে নিলেন বুকের কাছে।

"কাঁদছিস কেন? কী হল তোর?"

গলায় চাপা কান্না। নিতু চট করে কোনও উত্তর দিতে পারল না।

নিতুর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কাঁদছিস কেন রে পাগলা?"

নিতু অনেক কষ্টে বললে, "তুমি কেমন মন খারাপ করে বসে আছ?"

"আমি বসে আছি বলে তুই কাঁদবি? আচ্ছা ছেলে তো।"

"কেন তুমি এমন করে একা-একা ছাদে বসে থাকবে?"

"সারাদিন সংসারের কিচিরমিচির ভাল লাগে? তুই বল? মাঝে মাঝে একা থাকতে হয় বাবা। বেশ লাগে।"

"না, তুমি নীচে চলো। সবাই যেখানে আছে তুমিও সেখানে চলো।"

"যেতে তো হবেই, আর একটু বসি। দেখ না, ধীরে ধীরে কেমন আকাশের আলো নিভে আসছে। একটা দিন কেবল নিঃশব্দে চলে গেল নিতু। এইসময় আমার মনটা ভীষণ খারাপ লাগে রে নিতু। পুরনো দিনের কত কথা মনে পড়ে। আমার বাবার কথা, মায়ের কথা।"

"আমারও মনে পড়ে মা। শোন নদীর ধারের সেই বাড়িটা। বাবা, মা, আমার ইস্কুল, মাস্টারমশাই। জানো মা, আমার একটা পোষা কুকুর ছিল, আসার সময় নদীর ধারে একটা কাঠগোলার পাশে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি। সে কি এখনও বেঁচে আছে মা?" নিতু আবার কেঁদে উঠল।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "সেই কুকুর আবার তোদের বাড়িতেই ফিরে গেছে।"

"সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই মা। বাবা অনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন মহাজনের কাছে, সেই মহাজন বাড়িটা দখল করে নিয়েছে।"

"পুরনো কথা ছাড় নিতু। সামনের কথা ভাব। দিন যায়, আবার দিন আসে। সময় যেমন থেমে থাকে না, মানুষকেও সেইরকম থেমে থাকতে নেই। এগোতে হয়। যা যায় তা আর ফিরে আসে না। নতুন করে সব তৈরি করাতে হয়। কোনও এক নদীর ধারে তোকে নতুন করে আবার একটা বাড়ি করতে হবে। তুই লেখাপড়া শিখে আরও বড় হবি। বড় চাকরি করবি। গাড়ি চেপে ঘুরবি। প্লেনে করে বিদেশ যাবি। একটা কেন, দশটা কুকুর পুষবি।"

"আমার সেই কুকুরটাকে তো আর ফিরে পাব না মা।"

"ওই যে তোকে বললুম, যা যায় তা আর আসে না। নতুন করে সব পেতে হয়। জয় করতে হয়। পৃথিবীটা কীরকম জানিস, একদিকে হারাবি, একদিকে পাবি। হারাতে হারাতে, পেতে পেতে জীবনের পথ একদিন শেষ হয়ে যায় বাবা।"

রাজ্যেশ্বরীর বুকে মাথা রেখে নিতু আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি মাত্র তারার একটি মাত্র চোখ সেখানে পিটপিট করছে। তারার প্রার্থনা কখন সূর্য শেষ আলোকচ্ছটা সংবরণ করে আঁধারের পথ খুলে দেবে! রাজ্যেশ্বরী বললেন, "চল, এবার আমরা নীচে যাই।"

নীচে বাগানের সভা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এস পি বলছেন, "কমল স্যার, কালই তা হলে বাংলোটার দখল নিয়ে নিন। যত দেরি করবেন ততই অশান্তি বাড়বে। আপনাকেই আমরা হ্যান্ডওভার করব।"

সুদর্শন বললেন, "ওখানে আমি একটা মানমন্দির তৈরি করব। জার্মানি থেকে বিশাল একটা দূরবিন আনাব। সারারাত আমরা আকাশ দেখব। গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, উল্কা, ধুমকেতু। আমরা কেউ আর রাতে ঘুমোব না। এক, আকাশ যেদিন মেঘলা হবে, কি খুব বৃষ্টি হবে, সেইদিনই আমরা ঘুমোব। সারাদিন আমরা এই অঞ্চল 'সারভে' করব। কোথায় কী আছে! জীবজন্তু, গাছপালা, মানুষজন, মন্দির-মসজিদ, পাহাড়-নদী। দিনের বেলা আমরা পৃথিবী নিয়ে ব্যস্ত থাকব, রাতের বেলায় দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকব

আকাশের দিকে। আমাদের সংগঠনের নাম হবে, 'বটগাছ।' আমাদের ছায়ায় সবাই এসে বসবে। আশ্রয় পাবে। আমাদের কর্মীদের পোশাক হবে গাঢ় সবজে রঙের প্যান্ট আর লংকোট। আমাদের নিজেদের বলে কিছু থাকবে না। সবই পরের জন্যে। আমরা মেঝেতে শোব। নিরামিষ খাব, রুটি, ডাল, আর-একটা তরকারি। মাসে একবার আমাদের একটা করে সভা হবে, সেই সভার দিনে আমরা মিষ্টি খাব, আর গান গাইব। আর কথা কম বলব, আর কাজ বেশি করব। কথা যাতে কম বলা যায়, তার জন্যে আমরা মুখে কাপড়ের ফালি বেঁধে রাখব। সামনে কাপড়ের ফালি পেছনে ইলাস্টিক ব্যান্ড। দরকারি কথা বলার সময় টেনে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমরা গাড়ি চেপে বেড়াব না। ছ'টা ছোট সাইজের টাট্টু ঘোড়া কিনব। আমাদের বাহন হবে ঘোড়া। আমরা আমাদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করব। প্রথমে আমরা হাতে চালানো তাঁতে আমাদের কাপড় নিজেরাই বুনব, পরে আমরা এখানে একটা কাপড়ের কল বসিয়ে বহুলোককে চাকরি দেব। আমার একটা বেকারি আর একটা ডেয়ারি করব। বেকারিতে তৈরি হবে রুটি, বিস্কুট, কেক। ডেয়ারি থেকে বেরোবে দুধ, ঘি মাখন। আমরা একটা নার্সারি করব। শুধু গাছ আর গাছ, ফুল আর ফুল। বড় বড় শহরে আমাদের ফুল আর গাছের চারা যাবে। কলকাতা, বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোরের বড় বড় হোটেলে আমরা ফুল দেবার অর্ডার নেব। আমি নিজে একটা কেন্দ্র খুলব। সেখানে ট্রেনিং দিয়ে তরুণ ছেলেমেয়েদের ডিটেকটিভ করে তুলব। নবীন শার্লক হোমস। তারা দেশের পুলিশবাহিনীকে, প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সাহায্য করবে। আমরা একটা বিশাল বড় দোকান করব, সেই দোকান থেকে আমাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করা হবে। যা লাভ হবে, সেই টাকায় চলবে আমাদের পশুনিবাস। মেধাবী দুস্থ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালাবার জন্যে আমরা স্কলারশিপ দেব। বাবা রে, আর পারছি না।"

সুদর্শন শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে বললেন, "সুকু জল। জল আনো, জল। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে।"

সন্ন্যাসী ডাক্তার বললেন, "খুব স্বাভাবিক। করতেই পারে। এত বিশাল পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকেও হার মানায়।" গলা খুব ভারী করে সন্ন্যাসী ডাক্তার ডাকলেন, "কমল।"

কমল ভৌমিক একপাশে বসে ছিলেন আপনমনে, চমকে সাড়া দিলেন, "আজ্ঞে।"

"প্যাক আপ। প্যাক আপ। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। এখানে থাকলে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে। এরা সব লঘু মনের লোক। কল্পনাবিলাসী। এদের দ্বারা কাজের কিছু হবে না। এরা শুধু গালগল্পই ভালবাসে।"

সন্ন্যাসী ডাক্তার সোজা উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে তুলে নিলেন নিজের ব্যাগ। হাতঘড়িটা খুলে রেখেছিলেন, সেটা হাতে পরতে পরতে সময়টা একবার দেখে নিলেন।

কমল ভৌমিক ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিষণ্ণ মুখে তাকালেন চারপাশে। সকলেই সমান অবাক। সুদর্শন উঠে পড়েছেন। তিনি সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি লেখক। কল্পনাপ্রবণ। আমি অনেক কিছু দেখতে পাই। আমি একটা সাংঘাতিক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পাচ্ছি। জাগরণের ছবি। আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের ছবি। আমি... আমি...।"

সন্ন্যাসী ডাক্তার সুদর্শনের কোনও কথাই শুনলেন না, আরও গম্ভীর গলায় বললেন, "কমল, তোমার ব্যাগ নিয়ে এসো। আর এক মুহূর্তও দেরি করতে দেব না তোমাকে।"

কিছু দূরেই রাজ্যেশ্বরী দাঁড়িয়ে ছিলেন নিতুকে নিয়ে। তিনি আগে ছিলেন না, তাই বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা কী। কমল ভৌমিক পাশ দিয়ে হনহন করে ভেতরে যাচ্ছিলেন ব্যাগ আনতে। রাজ্যেশ্বরী নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

কমল ভৌমিক যেতে যেতে বললেন, "এখানে আমার দিন ফুরোল বউদি।"

বলেই আর দাঁড়ালেন না, ভেতরে চলে গেলেন ব্যাগ আনতে। সুদর্শন তখন সন্ন্যাসী ডাক্তারকে বলছেন, "আপনি আমার কোনও কথাই শুনছেন না। কেমন যেন একটা উপেক্ষার ভাব। একে তো আমি বলতে পারি, এক ধরনের অপমান করা। বিশ্রী একটা অহংকার যেন ফেটে বেরোচ্ছে। সন্ন্যাসীর এত অহংকার কি ভাল! না, না, আপনি পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করুন। এই তো এঁরা সব রয়েছেন এখানে।"

সন্ন্যাসী ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন, সুদর্শনের মুখোমুখি। চোখ দুটো যেন আরও উজ্জ্বল। তিনি শান্ত গলায় বললেন, "আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। আপনার মুখ দেখেই মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি। বাগানের এই গাছতলায় বসে অতীতে চলে গেলুম। পেয়ে গেলুম আপনার সন্ধান।"

সুদর্শনের মুখের চেহারা ক্রমশ পালটাচ্ছে। তিনি যেন সামনে থেকে সরে যেতে চাইছেন।

সন্ন্যাসী ডাক্তার বললেন, "পালাবেন না, পালাবেন না। আপনি সুদর্শন নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও, কেউ কেউ আপনার আসল নাম জানে, আপনি

হলেন কুখ্যাত ভোলানাথ রায়। আপনার অজস্র অপকীর্তির একটা হল জাল ওষুধের কারবার। প্রথম আপনি আমার হাতেই ধরা পড়েছিলেন।”

সকলেই নীরব। পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠছে। সকলেই তাকিয়ে আছেন সুদর্শনের মুখের দিকে। কী হয়, কী হয় ভাব। সুদর্শন হাহা করে হেসে উঠলেন, “আপনার ভুল হচ্ছে মহারাজ, মহা ভুল। ভোলানাথ রায় আমার যমজ ভাই। আর সেই ভাইয়ের জন্যেই আমি আজ দেশছাড়া বাউন্ডুলে। আমার নাম শিবনাথ রায়, গ্লোবট্রটার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ানোই আমার নেশা। আর আমার নেশা হল একটু-আধটু লেখা। সুদর্শন আমার ছদ্মনাম। বিভিন্ন ভাষায় আমার লেখার অনুবাদও হয়েছে।”

সন্ন্যাসী বললেন, “কী করে বিশ্বাস করব যে, আপনি সত্য বলছেন?”

“এক সেকেন্ড।” সুদর্শন ভেতরে গেলেন। ফিরে এলেন একটা ব্যাগ নিয়ে। ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা বইয়ের মতো কী বের করে বললেন, “এই দেখুন, আমার পাসপোর্ট। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে! আর এই দেখুন, একটা পেপার ক্লিপিংস। জেলে ভোলানাথের মৃত্যুসংবাদ।”

সন্ন্যাসী কাগজের টুকরোটা পড়লেন, পাসপোর্টটা আগেই দেখেছিলেন, কাগজের টুকরোটা ফেরত দিয়ে বললেন, “আমার ভুল হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি। আমার বয়েস হয়েছে।”

সুদর্শন মহাখুশি হয়ে বললেন, “না, না, তা কেন, তা কেন। আপনি সম্মানিত, আপনি আমার প্রণম্য।”

সন্ন্যাসী ডাক্তার বললেন, “তার মানে কিন্তু এই নয়, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করছি। আপনার কথাবার্তা চালচলন আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। আপনার কোনও গভীরতা নেই। আপনি সাহিত্যিকও নন। গোয়েন্দা কাহিনিকে কি সাহিত্য বলা চলে? বিদেশি কাহিনির অনুকরণে লেখা কিছু রাবিশ। ওই মন নিয়ে বড় কিছু, ভাল কিছু করা যায় না।”

সুদর্শনের উৎফুল্ল ভাবটা আবার চুপসে গেল। তিনি বেশ চ্যালেঞ্জের গলায় বললেন, “বড় ডাক্তার হতে পারেন, বড় সন্ন্যাসী হতে পারেন, আধুনিক কালের লেখার আপনি কিছুই বোঝেন না। আমি মৌলিক কাহিনি লিখি, গবেষণা করে লিখি। আমি শুধু লেখক নই, গবেষকও। বিলিতি কায়দায়, পয়সা খরচ করে লোকলশকর লাগিয়ে আমি ঘটনা ঘটাই, তারপর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বই লিখি, যেমন এখানে এতদিন ধরে যা-যা ঘটে গেল, কোনওটাই সত্যি নয়, সবই আমার কলাকৌশল। এইবার আমি বিলিতি লেখকের মতো বসে বসে মনের আনন্দে লিখব। বইয়ের নাম হবে ‘ডুমরাওগঞ্জের রহস্য’।” সুদর্শন হাহা করে হাসতে লাগলেন।

এস. পি. তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। উঠে এসে সুদর্শনকে চেপে ধরলেন। হাসি থেমে গেল। এস. পি.র দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হল? আমার হাসি দেখে ভয় পেলেন? আমি এরকমই হাসি, প্রাণখোলা, দিলখোলা।"

এস. পি. বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। আপনাকে গ্রেফতার করা হল।"

কমল ভৌমিককে ইশারা করে সন্ন্যাসী ডাক্তার বাগানের পথ ধরে গেটের দিকে এগোলেন। কাঁধে ব্যাগ, কমল ভৌমিক পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। বারে বারে পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন। সবাই হাঁ করে দেখছে, সুকু দেখছে, নিতু দেখছে, দেখছেন রাজ্যেশ্বরী। প্রিয় মানুষটি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, নিজের অনিচ্ছায়। গেটের কাছে গিয়ে কমল ভৌমিক থমকে দাঁড়ালেন।

॥ ৪৯ ॥

কমল ভৌমিক গেটের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। পেছনদিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। দু'পা এগিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন। আবার তাকালেন, হাত নাড়লেন। যাবার যেন ইচ্ছে নেই। সুকু আর নিতুর চোখে জল এসে গেছে। রাজ্যেশ্বরীর চোখও ছলছল করছে। এস. পি. বললেন, "আশ্চর্য, টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন! এ যেন অজগরের আকর্ষণ। কী সাংঘাতিক গুরুভক্তি।"

কমল ভৌমিককে থমকে দাঁড়াতে দেখে, সন্ন্যাসী ডাক্তার দূর থেকে হাঁকলেন, "কী হল কী তোমার? এখনও পিছুটান। কুইক, কুইক! হারি আপ।"

কমল ভৌমিক শেষ আর-একবার হাত নেড়ে, গেটের সামনে থেকে সরে গেলেন। নিতু আর সুকু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "যাঃ, বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।" দূরে একটা গাছের তলায় এস. পি. আর সুদর্শন দাঁড়িয়ে আছেন। এস. পি.-র পুলিশি মাথা। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আপনি ওই সন্ন্যাসীকে ধাপ্পা দিলেন, তাই না?"

সুদর্শন একটু থতমত খেয়ে বললেন, "কেন, ধাপ্পা বলছেন কেন?"

"ওইসব যমজ ভাইটাই সিনেমায় হয়। আসলে আপনিই সেই লোক। আপনার ঠিক ঠিক পরিচয় তো কেউ জানে না।"

"জানতে চান? জানলে কিন্তু আপনাদের হাসিমুখ অন্ধকার হয়ে যাবে।"

এইবার এস. পি. একটু ঘাবড়ে গেলেন, তবু হালকা গলায় বললেন, "অন্ধকার হয়ে যাবে? অন্ধকার হবে কেন? আপনি কে?"

সুদর্শন জামার বুক পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখালেন, এস. পি. হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই কেমন যেন হয়ে গেলেন, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "আপনি সি. বি. আই-এর ডিরেক্টার? আপনি, আপনি এখানে কী করছেন?"

"আপনাদের ওপরতলায় অনেক পাপ জমেছে, এইরকম একটা অভিযোগ আমাদের কাছে ছিল। অভিযোগ একটা নয়, অজস্র অভিযোগ। তাই ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে একটা রাউন্ড মেরে দেখে গেলুম। দেখলুম, আপনারা শাসকের বদলে শোষক হয়ে উঠেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি এসেছি। তাঁর কাছেই ফিরে যাব। ফিরে গিয়ে আমার রিপোর্ট দাখিল করব। এই জেলায় চারজন সাচ্চা লোক আমি পেয়েছি, যাঁরা সত্যিই দেশসেবা করছেন।"

"কে কে?"

"এক, আমাদের ডাক্তারবাবু, দুই, আমাদের প্রধানশিক্ষক, তিন আমাদের অশ্বারোহী ফরেস্ট অফিসার, আর-একজন হলেন, কে বলুন তো?"

এস. পি. থম মেরে আছেন। আমতা আমতা করে বললেন, "কে বলুন তো?"

"আপনি?"

বলামাত্রই এস. পি. সুদর্শনকে জড়িয়ে ধরলেন। ভীষণ একটা আবেগ এসে গেছে তাঁর। আনন্দাবেগ। সুদর্শন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন। আর ঠিক সেইসময় ডাক্তার মুখার্জির গাড়ি এসে ঢুকল বাগানে। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই দেখলেন, দু'জন ভদ্রলোক পরম আবেগে কোলাকুলি করছেন, আর কিছু দূরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য সকলে, যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে নাটক দেখছে।

ডাক্তারবাবু কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? কোনও সুখবর আছে নাকি?"

এস. পি. বললেন, "আপনি এই ভদ্রলোকের প্রকৃত পরিচয় জানেন?"

"অবশ্যই জানি।"

"সে তো ওঁর নকল পরিচয়।"

না, আসল পরিচয়ও জানি। ওঁর একটা নয়, সাত দিকে সাতটা পরিচয়, তার মধ্যে আসল পরিচয় যেটা, সেটা আমি জানি। এখানে আসার আগে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।"

"আমাকে বলেননি কেন?"

"সকলকে বলে বেড়ালে ওঁর কাজের অসুবিধে হত। যাক, আমার স্যার কোথায় গেলেন?"

"তিনি কমলবাবুকে নিয়ে চলে গেলেন?"

"সে কী! চলে গেলেন?"

"যাবার সময় আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করে গেলেন। বলে গেলেন, আমরা সব অসৎ সঙ্গ। আমাদের সঙ্গে থাকলে কমলবাবু খারাপ হয়ে যাবেন। কমলবাবুর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ভদ্রলোক প্রায় কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।"

"অনেকদিন পরে ওঁকে দেখলুম। আমার মনে হয়েছে, যে-কোনও কারণেই হোক, উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।"

এস. পি. বললেন, "তা হলে উইলিয়ামসন সাহেবের বাংলোই বলুন আর চিড়িয়াখানাই বলুন, ওসব যেমন আছে সেইরকমই থাক। আপনাদের সব পরিকল্পনাই তো ভেস্তে গেল।"

"হ্যাঁ যেমন আছে, সেইরকমই থাক। বাঙালির কোন পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত সফল হয়? তা ছাড়া আমারও ডাক এসে গেছে।"

সুদর্শন বললেন, "ডাক এসেছে মানে?"

"ঠিক তিন দিন পরে আমরা আকাশে। লন্ডনের সেন্ট বারথেলমিউ হসপিটালে বছর-পাঁচেক আমাকে কাজ করতে হবে। স্লিপিং সিকনেসের ওপর আমার পেপারটা পড়তে হবে। লন্ডন থেকে আমাকে যেতে হবে তানজানিয়ায়।"

"সকলকে নিয়ে যাবেন?"

"সে তো যেতেই হবে। এক-আধ বছরের ব্যাপার তো নয়, পাঁচ-পাঁচটা বছর এরা থাকবে কোথায়?"

"রুকু-সুকুর লেখাপড়া?"

"ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার ভাবনা? আরও ভাল লেখাপড়া হবে। ঈশ্বরের কৃপায় আমার দুটো ছেলেই তো ভাল।"

এস. পি. বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। থকথকে কালো রাত নেমে এল। কেউই লক্ষ করলেন না, নিতু বাগানের শেষ মাথায় দারোয়ানদের ঘরের দিকে চলে গেল। দুটো ঘরের একটা তালা বন্ধ, আর-একটা খোলা। যে-ঘরটা খোলা, সেই ঘরে একটা চৌকি আছে। তার ওপর মাদুর পাতা। আগে সায়েবদের আমলে দরোয়ান, খানসামা, ধোবির প্রয়োজন হত। এখন আর হয় না। ঘরগুলো খালিই থাকে। যে-ঘরটা খোলা, সেই ঘরে সুকুর ওয়ার্কশপ। কাঠকুটো যন্ত্রপাতি, করাত, র‍্যাঁদা, সব ছড়ানো। সুকু এসে কাজ করে। এখন একটা বইয়ের র‍্যাক তৈরি করছে। প্রায় হয়ে এসেছে।

নিতু মাদুরের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘর। কেউ কোথাও নেই। মাঝে মাঝে যখন জোরে বাতাস বইছে, তখন মর্মর শব্দ উঠছে। নিতু

তার অতীতের কথা ভাবছে। কোথা থেকে সে এসেছিল, এখন তাকে কোথায় যেতে হবে। মামারবাড়িতে সে আর যাবে না। কিছুতেই যাবে না।

ট্রেন ছুটছে কলকাতার দিকে। জানলার ধারে বসে আছেন কমল ভৌমিক আর সন্ন্যাসী ডাক্তার। মাঝে মাঝে পাহাড় ছুটে চলে যাচ্ছে পেছন দিকে। মাঝে মাঝে জানলার পাশ দিয়ে বন চলে যাচ্ছে ঝাপুস ঝুপুস শব্দ করে। কখনও ট্রেন উঠে পড়ছে ব্রিজের ওপর। তখন অনেক তলায় বহে চলেছে পাহাড়ি নদী বালির বুকে ফিতের মতো। বড় বড় পাথরের চাংড়া পড়ে আছে গজকচ্ছপের পিঠের মতো। কমল ভৌমিক কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর এক-একটা প্রাণের জিনিস বুক ছিড়ে পেছনে ছুটে পালাচ্ছে। নদী, পাহাড়, বন, ছোট ছোট দেহাতি গ্রাম ছবির মতো পটে আঁকা। সন্ন্যাসী ডাক্তার একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে কমল ভৌমিককে বললেন, "পৃথিবীর যে-কোনও একটা জায়গায় গুছিয়ে বসতে শেখো। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করলে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মন বিক্ষিপ্ত হয়। ভুলে যেয়ো না, তুমি এখন বড় হয়েছ, আর কচি খোকাটি নও।"

কমল ভৌমিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

"আমি এখন বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমার জীবনের শেষ পরিকল্পনা এবার তোমার সাহায্যে আমি কাজে করে দেখাব। বিশ্ববাসীর তাক লেগে যাবে।"

কমল ভৌমিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

"কী হল, তোমার বাকরোধ হয়ে গেল নাকি? কোনও উত্তর দিচ্ছ না! প্রশ্ন করবে তো পরিকল্পনাটা কী? চুপ করে বসে আছ! বোবার মতো! বুঝেছি। রাগ হয়েছে। বেশ চলছিল তো, আড্ডা মেরে, হাঃহাঃ করে। তোমাকে আমি স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে টাইট দেব। নাট-বল্টু কতটা ঢিলে হয়েছে, একবার ভাবো। গুরুকে পর্যন্ত অপমান! কলকাতায় গিয়ে সবার আগে তোমার ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাকে শোধন করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। মাথা ন্যাড়া করিয়ে তিন দিন উপবাস। খালি পায়ে আদুর গায়ে সারাদিন শানের মেঝেতে রোদে বসিয়ে রাখব। ইস, চরিত্রের সমস্ত বাঁধন একেবারে ঢিলে হয়ে গেছে!"

কমল ভৌমিক তখনও কোনও কথা বললেন না। গুম মেরে বসে রইলেন। তাঁর সারা মন বিষিয়ে উঠেছে।

"তুমি যখন জিজ্ঞেস করলে না, আমিই তখন বলি। আমার বাছাই করা একশোটা ছেলে চাই। তাদের নিয়ে আমি একটা বাহিনী করব। ধোলাই-

বাহিনী। বিটিং স্কোয়াড। তাদের কাজই হবে, পিটিয়ে ঠান্ডা করা। একালে আইনকানুন, পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সব ঢিলে হয়ে গেছে। অপরাধী অপরাধ করে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের বাহিনী কাজ করবে গেরিলা কায়দায়। ঝড়ের বেগে আসবে, ঝড়ের বেগে কাজ শেষে বেরিয়ে যাবে।"

কমল ভৌমিক আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন, "আমি তো সেই কাজটাই করতে চেয়েছিলুম এইখানে। জায়গাটাও ভাল ছিল।"

"এইখানে! এইখানে করে কী হবে! করতে হবে নিজের জায়গায়। ও তোমার কাজের নামে ফাঁকি। আই ডোন্ট লাইক ফাঁকিবাজি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?"

সন্ন্যাসী ডাক্তার আবার পড়ায় মন দিলেন। কমল ভৌমিক এক টুকরো কাগজ ভাঁজ করে করে বক তৈরি করার চেষ্টা করছেন। ছেলেবেলার শিক্ষা মনে আছে কি না দেখছেন। এদিকে ট্রেন আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। সন্ধে হয়ে আসছে। পাহাড় টাহাড় সব হতভম্বের মতো দূর আকাশের গায়ে বসে আছে, যেন মায়ের বকুনি খেয়েছে।

খুবই সমস্যায় পড়ে গেছেন ডক্টর মুখার্জি। রাজ্যেশ্বরী কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছেন না। তিনি কিছু অন্যায় বলছেন না। তিনি বলছেন, "আমি গেলে নিতুর কী হবে? নিতুকে ফেলে রেখে আমি তো যেতে পারব না। নিতুও আমার ছেলে।"

"সে-কথা আমিও অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। ছেলে দুটো পাঁচ বছরে ওখানে লেখাপড়ায় অনেকটা এগিয়ে যেত, যতই হোক, বিলিতি শিক্ষার একটা আলাদা কদর আছে।"

"তুমি এখনও দুটো ছেলে বলছ। ছেলে কিন্তু আমাদের তিনটে। সেই হিসেবটা তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে।"

"ভুল হচ্ছে একটা কারণে, কাগজে-কলমে আমি তো প্রমাণ করতে পারব না। আমার পরিবার বলতে বোঝায় তোমরা তিনজন। এই হয়েছে মুশকিল।"

"তুমি, রুকু আর সুকু চলে যাও। আমি নিতুকে নিয়ে এইখানেই থাকি। ছেলেটাকে মানুষ করি। পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"তোমাকে একলা এখানে আমি কার ভরসায় রেখে যাব? কমলবাবু চলে গেলেন, সুদর্শনবাবু চলে গেলেন।"

"ওঁদের কেউই তো চিরকাল থাকার জন্যে আসেননি। তোমার কোনও ভয় নেই, আমি ঠিক থাকব। আমার একটাই অস্বস্তি, তোমাকে একা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ওখানে তোমাদের কে দেখবে?"

"ওখানকার জীবন আলাদা। কষ্টেসৃষ্টে ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

ডাক্তারবাবু আর রাজ্যেশ্বরী যখন এইসব কথা আলোচনা করছেন, তখন ওপাশের ঘরে সুকু আর নিতুও জেগে বসে আছে। রুকু ঘুমিয়ে পড়েছে। রুকু যত বড় হচ্ছে, ততই চাপা স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। বিলেত যেতে পারবে শুনে রুকুর ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তার লক্ষ, জীবনে বড় হওয়া, আরও বড় হওয়া। সুকুর পাগলামি, সুকুর ছেলেমানুষি তার ভেতর নেই। সে ক্রমশ অন্তর্মুখী, অমিশুক হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন বই-মুখে বসে থাকে। একা-একা বেড়াতে যায়। বিলেত যাবার স্বপ্নে সে বিভোর। বিরাট স্কুলে পড়বে। কলেজে ঢুকবে। ডাক্তার হবে। বাবার মতো বড় ডাক্তার। দেশে আর ফিরবে না। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে। সুকু বলে, "দাদাটা দিন দিন স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে।"

নিতু আর সুকু একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে। নিতু বলল, "দাদা তুমি আমার জন্যে এত ভাবছ কেন? আমি পথের ছেলে, আবার পথেই চলে যাব। আমার বাবা আমাকে কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন, তোকে এই ডোরাকাটা জামাটা কেন দিয়ে গেলুম বল তো? জীবনও যে ডোরাকাটা। দুঃখ আর সুখের লাইন চলে গেছে। কেউ চলে সুখের লাইনে, কেউ চলে দুঃখের লাইনে। তখন বুঝিনি, এখন বুঝছি। জানো তো দাদা, আমার কোনও ভয় নেই। তুমি ভেবো না। অনেক অনেক বছর পরে, তুমি যখন অনেক বড় হবে, তখন আমি কোথাও হয়তো থাকব। আমি আসব। আমি নিজেই এসে তোমাকে দেখে যাব। তুমি তখন চিনতে পারবে তো? কী গো দাদা, চিনতে পারবে তো?"

সুকু কোনও জবাব দিতে পারল না। তার বুকের কাছটা কেমন করছে। নিতু প্রথম দিন খুব ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু বাগানের শেষ মাথার অন্ধকার কাঠের ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে তার ভেতর অদ্ভুত একটা বল এসে গেছে। সেই রাতে স্বপ্নে সে তার বাবাকে দেখেছিল। বাবা যেন জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলছেন, "নিতু ভয় কী। এর আশ্রয় গেলেও আকাশের আশ্রয় তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। পাখির কথা ভাবো। আকাশ আর ডানা আর গাছের ডাল। দুটো ডাল যেখানে এক হয়েছে, সেই খাঁজে বাসা বাঁধবে। ঝড়ে দুলতে শেখো, তা হলে বাঁচতেও শিখবে।"

ছাঁত করে নিতুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই নিতু অন্য মানুষ। নিতু সুকুর গালে হাত রেখে বললে, "এ কী, তুমি কাঁদছ!"

নিতু সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজ্যেশ্বরীকে গিয়ে বললে, "মা, তুমি আমার জন্যে এত ভাবছ কেন? তোমাকে আমি বলিনি হাজারিবাগে আমার এক মাসি আছে। খুব ভাল। মেসোমশাইও খুব ভাল মানুষ। তোমরা যাবার পর আমি

এখান থেকে বাস ধরে হাজারিবাগ চলে যাব। সেখানে গিয়ে আমি স্কুলে ভরতি হব। পাঁচ বছর পরে তুমি তো ফিরে আসবে, তখন আমি একদিন আসব। তখন আমি অনেক বড় হয়ে যাব। তুমি আর আমাকে চিনতে পারবে না।" নিতু হাহা করে হাসতে লাগল।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "সত্যি তোর মাসি আছে? কই তুই তো আমাকে বলিসনি?"

"আমি ভুলে গিয়েছিলুম মা।"

"মাসি তোকে ভালবাসবে তো! লেখাপড়া শেখাবে তো?"

"মাসিরা খুব বড়লোক মা। টাউনে ব্যাবসা আছে।"

"মাসির কে কে আছেন?"

"মাসি, মেসো আর এক মেয়ে। দু'বছর হল দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।"

রাজ্যেশ্বরীর মস্ত বড় একটা দুর্ঘটনা কেটে গেল। তিনি ডাক্তার মুখার্জিকে গিয়ে সব বললেন। হাসি ফুটল তাঁর মুখে, "যাক একটা দুর্ভাবনা কাটল। কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। তা হলে আমরা সবাই যাচ্ছি।"

নিতু বাগানের শেষ মাথায় বুড়ো একটা আমগাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার বাবা বলেছিলেন, "নিতু, প্রয়োজনে যদি কখনও মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা হলে প্রাচীন কোনও গাছের সামনে দাঁড়িয়ে, সে কথা বলবে। বলবে, গাছ তুমি সব শুনলে, আমার দোষ ক্ষমা করো।"

নিতু হাত জোড় করে বললে, "গাছ তুমি সব শুনলে, আমার দোষ ক্ষমা করে দাও।" গাছের উত্তর শোনার জন্যে নিতু অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের শব্দে মনে হল, গাছ যেন বলছে, 'নিতু, তোমার সব দোষ ক্ষমা করে দিলুম।"

সুকু সব শুনে বললে, "নিতু মিথ্যে কথা বলছে মা। হঠাৎ কোথা থেকে ওর মাসিমা এল?"

"শুধু শুধু মিথ্যে বলবে কেন ওর মতো ভাল ছেলে। ওর খেয়াল ছিল না।"

"তুমি বিশ্বাস করতে হয় করো। আমি করছি না। বিলেতে গিয়ে কী হবে মা! তুমি আর আমি এখানেই থাকি না! বাবা ঘুরে আসুক দাদাকে নিয়ে। দাদা তো লাফাচ্ছে। পারলে আজই চলে যায়।"

"একা যে ছাড়তে মন চাইছে না।"

সুকু মন খারাপ করে চলে গেল। নিতুর কথা কিছুতেই সে বিশ্বাস করবে না। নিতু সকাল থেকে সেই যে কোথায় চলে গেছে তার আর পাত্তা নেই। নিতু গা ঢাকা দিয়েছে। সুকুর মুখোমুখি সে হতে চায় না। ডক্টর মুখার্জি সকালবেলাই

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। অনেক কিছু করার আছে। তারপর এখান থেকে দিল্লি। দিল্লি থেকে প্লেনে চাপবেন।

রাজ্যেশ্বরী যাকে যা পারছেন, সব দিতে শুরু করেছেন। ডক্টর মুখার্জির গাড়িটা শ্যামলাল কিনে নিচ্ছেন।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকল আড়াই ঘণ্টা দেরিতে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। সন্ন্যাসী ডাক্তার আগে নামলেন। পেছনে কমল ভৌমিক। দু'জনে আগে-পরে হাঁটছেন। পাশ দিয়ে গলগল করে লোক যাচ্ছে। মাল যাচ্ছে। পোর্টাররা ধাক্কা মেরে ছুটছে। কমল ভৌমিকের ভেতরটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তার কোনও স্বাধীনতা নেই নাকি? সে কি ক্রীতদাস? একশোটা ছেলে জোগাড় করে ধোলাইবাহিনী তৈরি করতে হবে। সারা দিন রাত ওই পাগলা ডাক্তারের খিদমত খাটতে হবে! কেন, কেন?

কমল ভৌমিক পিছোতে শুরু করেছেন। সামনে তিন-চার সারি লোক। সন্ন্যাসী ডাক্তারকে এখন প্রায়ই দেখাই যাচ্ছে না। কমল ভৌমিক আরও পিছোলেন। শেষে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেলেন। একেবারে হারিয়ে গেলেন। ঠিক করে ফেলেছেন, তিনি কী করবেন! তিনি ফিরে যাবেন। ডুমরাওগঞ্জ তাঁকে টানছে। নিতু টানছে। টানছে সুকু, বউদি, দাদা, বন, পাহাড়, নদী। ভগবানদাসের আশ্রম। ঘোড়ায়-চড়া ফরেস্ট অফিসার। কলকাতায় আর তিনি থাকবেন না।

কমল ভৌমিক সুট করে চলে গেলেন দোতলায় রিটায়ারিং রুমে। একেবারে কোণের দিকে বসে রইলেন ঘাপটি মেরে। কোনওরকমে রাতটা কাটাতে পারলেই আবার ভোরের ট্রেন ধরে উলটোমুখো। কমল ভৌমিক নিজের মনে হাসলেন, এ যেন রথ আর উলটো রথ।

ওদিকে স্টেশনের বাইরে এসে সন্ন্যাসী ডাক্তারের খেয়াল হল আগে, পেছনে, পাশে, কোথাও কমল নেই। লোকের পর লোক আসছে, কমল কোথায়? এদিকে তাকান, ওদিকে তাকান কমলের টিকির দেখা নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। রাত আরও গভীর হল। আরও একটা লেটের ট্রেন স্টেশনে এসে ঢুকল। সন্ন্যাসী ডাক্তার মনে মনে বললেন, জীবনের কোনও কিছুই সত্য নয়। সবই মায়া। একটাই সত্য। সেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে! তিনি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, "পদ্মপুকুর রোড।" রাতের গঙ্গার ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। দু'পাশে আলোর মালা পরে শুয়ে আছে মানুষের সংসার। সন্ন্যাসী-ডাক্তার হঠাৎ হেসে উঠলেন, হাহা করে। ড্রাইভার ভাবলে, সন্ন্যাসী ভগবান দেখেছেন।

ডাক্তারবাবুর বাগানের পেছনদিকে বিশাল একটা ভাঙা জমি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে পড়ে আছে নানারকম ধ্বংসাবশেষ। আর আছে খাড়া লম্বা একটা টাওয়ার। একবার ইতিহাসের ছাত্ররা অনুসন্ধানে এসে বলেছিল, এসব হল শেরশাহের আমলের ভাঙাচোরা জিনিস। আর টাওয়ারটা হল পর্যবেক্ষণের জন্যে। এর মাথায় উঠে সৈন্যরা দেখত শত্রুবাহিনী আসছে কি না। এটা হল এক সময়কার সেনা ব্যারাক। নিতু করেছে কী, সেই টাওয়ারে গিয়ে লুকিয়ে বসে আছে। কেউ ধারণাই করতে পারল না যে, নিতু এই কাণ্ড করেছে। এমনকী, সুকুও না। নিতু গম্বুজের ফোকর দিয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে, কী ঘটছে না ঘটছে। বাড়ির সামনে লাল একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একে-একে সব দরজা জানলা বন্ধ হচ্ছে। একে-একে মালপত্র উঠছে গাড়িতে। রুকুর উৎসাহ দেখে কে! সুকু আপন মনে বাগানে ঘুরছে। এক-একটা গাছের সামনে চুপ করে দাঁড়াচ্ছে কিছুক্ষণ, তারপর সরে যাচ্ছে আর-একটা গাছের কাছে। ডক্টর মুখার্জি চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে আবার ঢুকে গেলেন ভেতরে। চার্চের ফাদার এলেন। সুকু ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর সাদা বুকে। ফাদার তাকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজ্যেশ্বরী বেরিয়ে এলেন। কী সুন্দর একটা শাড়ি পরেছেন। পুরনো গম্বুজে বসে নিতু সব দেখছে। চারপাশ অপরিষ্কার মাকড়সার ঝুল। মাথার ওপর বাদুড় ঝুলছে। তা প্রায় দশ-বারোটা হবে। বেশ বড় সাইজের। বোটকা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

কিছুক্ষণ থেকে ফাদার চলে যাচ্ছেন। যাবার সময় সুকুর কুকুরটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। সুকু শেষবারের মতো কুকুরটাকে গলা জড়িয়ে আদর করছে। ফাদার চলে যাচ্ছেন, সুকু চোখ মুছছে। রুকু হাত নেড়ে নেড়ে সুকুকে কী বোঝাচ্ছে। চাঁদপাল এসেছে, সঙ্গে ভগবানদাস। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে বাগানে দাঁড়িয়ে। ওরা ঘুরে ঘুরে বাগান দেখছে। ভগবানদাস হাসছেন। চাঁদপাল সুকুর পাখির খাঁচাটা নিয়ে যাচ্ছে। সুকুর বেড়ালটা বসে আছে গ্যারেজের ছাদে। লছমি বলে কাজের মেয়েটি ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে। সে বাড়ির অনেক জিনিস পেয়েছে। পুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়েছে। গোল গর্তে চোখ রেখে নিতু সব দেখছে। বাগান ঘেরা, ছবির মতো বাড়িটা চোখের সামনে ভাসছে। আর একটু পরে সব খালি হয়ে যাবে। নির্জন বাগানে নামবে টিয়ার ঝাঁক। একা-একা বাতাস খেলা করবে গাছের পাতায়।

সব জিনিসপত্র গাড়ির পেছনে উঠে গেল। সুকু ইঁদারার পাড়ে উঠে শেষবারের মতো চিৎকার করল, "নিতু, নিতু!" ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আজব ছেলে। যাবার সময় একবার দেখা হল না!"

সদরে বড় বড় তিনটে তালা পড়ে গেল। সবাই নিচু হয়ে বাড়ি আর বাগানকে প্রণাম করল। লাল মোটরগাড়ি ধুলো উড়িয়ে সোজা চলে গেল ডুমরাওগঞ্জ স্টেশনের দিকে।

নিতু ধীরে ধীরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। জায়গায় জায়গায় সিঁড়ির ধাপ ভেঙে পড়েছে। সেইসব জায়গায় যথেষ্ট সাবধানে নামতে হল। কম উঁচু! কোথায় উঠেছিল নিতু! বহুকাল কেউ এই গম্বুজে ওঠেনি। নিতু নিচু ডাঙাটা পেরিয়ে পেছনের পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকল। ডানপাশে সুকুর খরগোশের ঘর খালি পড়ে আছে। খরগোশগুলো সব দিয়ে দিয়েছে। ছাই ছাই রঙের ধেড়ে খরগোশটা নিতুর খুব প্রিয় ছিল। নিতু গোলাপের ঝোপ পেরিয়ে বাংলোর খোলা বারান্দায় এসে বসল। কে বাঁচাবে এইসব গাছ। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে নিতুর চোখে জল এসে গেল। শেষবারের মতো বাড়িটা প্রদক্ষিণ করে সেও এইবার চলে যাবে ওই দূর পাহাড়টার দিকে। ওটা পেরোতে পারলেই নতুন এক দেশ। সে দেশে কি সুকুর মতো ভাই আছে! সুকুর মায়ের মতো মা! বাবার মতো বাবা! নিতু ভাবছে। পেছনে নিস্তব্ধ বাড়ি। বাগানে অজস্র পাখির কিচিরমিচির।

হঠাৎ গেটের সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। নামলেন কমল ভৌমিক। তিনি চিৎকার করছেন, "বউদি, আবার আমি ফিরে এসেছি!"

নিতু ছুটে গেল, "কমলকাকু, সেই আপনি এলেন, আর একটু আগে আসতে পারলেন না! সবাই যে চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন, যাঃ, তুমি গেলে না?"

"আমার তো যাবার কোনও জায়গা নেই।"

"ঠিক আমার মতো। তুমি কাঁদছ? তোমার চোখে জল! আরে আমি তো আছি। আমরা এইখানেই থাকব। এই বাগানে। তুমি আর আমি। তা না হলে এমন সুন্দর বাগানটা যে শুকিয়ে যাবে।"

"দরোয়ানের ঘর দুটো খোলা আছে। সেখানে একটা চৌকিও আছে।"

"ব্যস, আর ভাবনা কী! এবার আমাদের খেল শুরু হবে। নাও চোখ মোছো। মোছো চোখ। পাঁচ বছর পরে ওঁরা ফিরে এসে অবাক হয়ে যাবেন। দেখবেন, নিতুকে আমি মানুষ করে ফেলেছি। বাগানটাকে আমরা আরও সুন্দর করে ফেলেছি। নাও, একটা গান ধরো তো। নতুন দিনের গান। আমরা কাজে লেগে যাই। ডোরাকাটা জামা। আমাদের ডোরাকাটা জীবন।"